বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক। নূতন পুস্তক।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

পুণ্য।

সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী সম্পাদিত।

ইহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র, সাহিত্য, উপন্যাস গল্প, সুলভ ও সৌখীন রন্ধন প্রণালী, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নানাবিধ সঙ্গীতের স্বরলিপি ও সমালোচনা প্রতি মাসেই থাকে।

পুণ্যের অগ্রিম মূল্য (ডাঃ মাঃ সমেত) ৩৲ টাকা। পত্রদ্বারা জানাইলে ভিঃ পিঃ পোষ্টেও পাঠাইয়া থাকি।

প্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কার্য্যাধ্যক্ষ) ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, ঘোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

পঞ্চদশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
১৮২১ শক।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৬। কলিগতাব্দ ৫০০০। ৬চৈত্র সোমবার।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র ।০

বৈশাখ ৬৬৯ সংখ্যা ।

ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকাশ ১

জ্যৈষ্ঠ ৬৭০ সংখ্যা ।

বর্ষশেষ ২৫
নববর্ষ ২৮
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ৩০
সংবাদ ৩৭
পত্র ৩৯

আষাঢ় ৬৭১ সংখ্যা ।

উপদেশ ৪১
কৃষ্ণাবতার ৪৩
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং-সংঘাত ৫০
সংবাদ ৫২

শ্রাবণ ৬৭২ সংখ্যা ।

একটি কথা (যোগ) ৫৭
বসন্ত-কালে ব্রহ্মোপাসনা ৫৯
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত ৬১
কৃষ্ণাবতার ৬৮

ভাদ্র ৬৭৩ সংখ্যা ।

একটি কথা (যোগ) ৭৩
আত্মার অমরত্ব ৭৫
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ৭৮
কৃষ্ণাবতার ৮৩

আশ্বিন ৬৭৪ সংখ্যা ।

সংসার আশ্রম ৮৯
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ৯১
শুভ-দর্শনে সঞ্চয় ৯৭
কৃষ্ণাবতার ৯৯
শ্রাদ্ধ ১০২
আর্য্য পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত ১০৩
পত্র ১০৩

কার্ত্তিক ৬৭৫ সংখ্যা ।

শুভ-দর্শনে সঞ্চয় ১০৫
উৎসব ও ব্রহ্মোৎসব ১০৭
আর্য্য ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ১০৯
মোক্ষমূলারের পত্র ১১২
প্রেরিত ১১৩
কৃষ্ণাবতার ১১৫
সংবাদ ১১৮

অগ্রহায়ণ ৬৭৬ সংখ্যা ।

দুঃখ দারিদ্র্য ১২১
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত ১২৩
উদ্বোধন ১৩১
দীক্ষা ১৩২

পৌষ ৬৭৭ সংখ্যা ।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ১৩৭
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১৪১
কৃষ্ণাবতার ১৫০

মাঘ ৬৭৮ সংখ্যা ।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা ১৫৩
শান্তিনিকেতনে নূতন সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৫৪
Ourselves 1
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore. Sermons I 1
Professor Max-Muller on Brahmoism and Christianity. 4

ফাল্গুন ৬৭৯ সংখ্যা ।

সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫
মহর্ষি সন্দর্শন ১৮৯
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore. Sermons II 7
The Maharshe on Yoga or Communion with God 9

চৈত্র ৬৮০ সংখ্যা ।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন ১৯৩
কৃষ্ণাবতার ২০০
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore. Sermons III 13

৵০ অকারাদি বর্ণক্রমে পঞ্চদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭০, ৩০ ; ৬৭১, ৫০ ; ৬৭২, ৬১ ; ৬৭৩, ৭৮ ; ৬৭৪, ৯১ ; ৬৭৫, ১০৯ ; ৬৭৬, ১২৩ ;
আত্মার অমরত্ব	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৭৩, ৭৫
আর্য্য পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত		৬৭৪, ১০৩
উপদেশ	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৭১, ৪১
উৎসব ও ব্রহ্মোৎসব	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৭৫, ১০৭
উদ্বোধন	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৬, ১৩১
একটি কথা (যোগ)	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৭২, ৫৭ ; ৬৭৩, ৭৩
কৃষ্ণাবতার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৭১, ৪৩ ; ৬৭২, ৬৮ ; ৬৭৩, ৮৩ ; ৬৭৪, ৯৯ ; ৬৭৫, ১১৫ ; ৬৭৭, ১৫০ ;
দীক্ষা	শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়	৬৭৬, ১৩২
দুঃখ দারিদ্র্য	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৭৬, ২২১
নববর্ষ	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৭০, ২৮
পত্র		৬৭০, ৩৯ ; ৬৭৪, ১০৩
পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৭, ১৩৭
প্রেরিত		৬৭৫, ১১৩
বর্ষশেষ	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৭০, ২৫
বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৭২, ৫৯
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৭, ১৪১
ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকাশ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৬৯, ১
মহর্ষি সন্দর্শন	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৭৯, ১৮৯
মোক্ষমূলারের পত্র		৬৭৫, ১১২
শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব		৬৭৮, ১৫৪
শুভ-দর্শনে সঞ্চয়	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৭৪, ৯৭ ; ৬৭৫, ১০৫
শ্রাদ্ধ		৬৭৪, ১০২
সংবাদ		৬৭০, ৩৭ ; ৬৭১, ৫২ ; ৬৭৫, ১১৮ ;
সংসার আশ্রম	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী	৬৭৪, ৮৯
সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ		৬৭৯, ১৭৫
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা	শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব	৬৭৮, ১৫৩
Ourselves.		৬৭৮, 1
Professor Max-Muller on Brahmoism and Christianity.		৬৭৮, 4
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.		৬৭৮, 1 ; ৬৭৯, 7 ৬৮০, 13
The Maharshi on Yoga or Communion with God. Preo nath Shastre (Translated)		৬৭৯, 9

OURSELVES.

WE propose from this month to devote regularly several of our columns to contributions written in English. From time to time articles in English have appeared in these pages, and we shall be making no wide departure from our established rule by giving effect to our above proposal. English has now become the medium of communication between the educated members of one Indian race and those of another, and our only object in making the *Tattwabodhini Patrika*, to a certain extent, a bilingual periodical, is to make it accessible to our brethren in faith in particular, and educated Indians in general, in all parts of the country beyond the limits of the provinces where Bengalee is spoken and understood. We shall make no large promises at the outset, but would not at the sametime hesitate to say that it will be our earnest endeavour to make the English section of this journal interesting and instructive to our readers. We hope we shall deserve and receive the encouragement and support of our English-knowing co-religionists, friends, and sympathisers in our new venture.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali)

SERMON I.

11th Shrávana, 1782 Sakabda.

"तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथाः"

"Know that Eternal Being who is worthy to be known and adorable of all and take refuge in Him, so that death may not afflict you." Of all the calamities in this world, death is the most terrible. The grim figure of death is ever present before us. The world is but an image of death; whatever grows decays. The unsteady and fleeting things of this world and the everchanging vicissitudes of life remind us only of death. How can we be delivered from the fear and pain of death? By taking refuge in Him who is immortality itself. In this world only is fear of death, but beyond it is that Eternal Mansion. Here we are oppressed by such fear, but here again we become fearless by taking refuge in the Immortal. How wondrous! Living in the midst of decay and death we can know the Immortal Being! Although we are very insignificant creatures we can still obtain the shelter of that King of kings and God of gods. Living in the midst of multiform events, we are accomplishing His benevolent purpose. Diverse and many are the lower creatures—quadrupeds, birds,

insects, aquatic animals—that we see around us. They can not know their Creator and Preserver. They are living happily through His mercy, but they can not feel it. They are performing His work, but without knowing it. It is the broad and high privilege of man alone that he can consciously and willingly co-operate with His benevolent purpose. Living amidst death, man only can attain immortality. Living in this fearful world, he only can take shelter at the Lord's feet, which alone can deliver us from fear. He only can establish relationship with Him. Being the offspring of the Immortal Being, he becomes free from all fear by depending on that Being. If we depend upon God, a new life is born in us, and our joy never dies. Our body and mind may be distressed, we may fall into dangers or be afflicted by disease, but the joy of the spirit never grows less. If we take refuge in that Abode of Immortality, death, terrible as it is, can frighten us no more.

Therefore, living in this dreadful world, do not forsake God. "माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोद् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु।". "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him. Let me not live, forsaking Him." Let us not forsake Him from whom we have obtained all objects of enjoyment and all happiness, and who does not for a moment forget us. Think once what would have been our fate, if He had forsaken us. Where must we have been? We must have by this time, met with destruction. "कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्" "Who could have moved, who could have lived, if the blissful God had not existed in all space and with us?" He awards joy to all. Shall we forsake Him, by whose love we have been reared up from the moment of our birth, and under whose protection we hope to live through all eternity? He does not forget us; may we never forget him! Let him for ever remain unforsaken by us. Shall we forsake Him who is ceaselessly sending us righteousness, riches and happiness? Will it be an act worthy of man? And why need we forsake Him? Will that do us good? Have we not to suffer pain in this life, is there no danger or difficulty for us in this world, is not our body distressed, is not our mind cast down, that we can live without His protection? Is there no fear here that we shall not have to take shelter at those feet that deliver us from fear? Who will assuage us when our heads burn with affliction. Who will give us courage when we become frightened in this world, beset with so many causes of fear? It is only worldly infatuation that comes and estranges us from Him. Does good attend us on our forsaking Him? Without

Him our virtuous acts become acts selfishness and our enjoyments e ce ingratitude. Those who are here lis ing to this sermon, must have co e here in vain if they went away only after listening to it. What will it avail them, if they forget God on returning home? What is the use of their coming here, if by coming here their hearts be not elevated, if their love of God be not kindled in them, and if they do not remember Him when engaged in worldly pursuits. Have they come here only to recite holy texts in unison and hear sermons? Have they not come here to establish a closer union with God? What spiritual progress have they attained if in prosperity they do not remember His mercy; if nourished by food and drink they do not remember the giver thereof? Staying away from that fountain of holiness, where will you get holiness? Forsaking Him who is the fountain of righteousness, how will you profess yourselves to be righteous? Abandoning that Abode of all good, how will you be worthy of the name of good men? Surrender yourselves to him from to-day, and you will receive new life this very day.

Is any counsel needed as to the way how God is to be worshipped? Is instruction necessary for being grateful to Him from whom we have got life, riches, knowledge, and intelligence? Does the way how to worship Him whose mercy we enjoy from the day of our birth, and under whose protection we shall live for ever, require teaching? Distressed by sin as you are, will you not strive to purge your minds of impurity by placing yourselves under His shelter? Will you not worship that Teacher of teachers and Father of fathers? Will you not pray to Him for spiritual strength? There can be no disinclination to worship God unless one's nature be perverted? Bring your soul up to its natural condition. Begin to worship Him from this very night. There is no use in mere listening. It would not be to our country's good, if we do not take refuge in the Lord of the Universe. The country where God is not worshipped, the family in which His Holy name is not uttered, the heart in which there is no seat for Him, that country, that family, that heart is a desert—the abode only of deep sorrow and pain. From this day make Him your refuge, and worship Him. There has been no want of opportunities for you to hear of Him; you have comprehended much about Him with the aid of your intellect. Why do you not then join knowledge to work, and faith to practice? Commence to worship Him from this very day, and you shall reap the fruits of your act immediately. Through His mercy you are enjoying all the pleasures of life; bow to him with gratitude. In moments of fear and danger, make

Him your shelter, and you shall be as fearless as the child is on its mother's lap. When you are distressed by sin, repent, and with tears in your eyes, place yourselves under His protection. He loves those who take refuge in Him, and He will save you from sin. Worship Him who is the Lord of the Universe, the King of kings and the God of gods. Let those who, knowing all this, feel no inclination to worship God, purify their own nature, pray to Him with an open heart, exert themselves, and they are sure to be uplifted by His mercy, and to clearly understand the meaning of the text, "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him."

Professor Max-Muller on Brahmoism and Christianity.

The ideal, the aim and the position of the Brahmo Samaj have from time to time been grievously misunderstood. But such misunderstanding has never been a matter of greater regret than when it has found its justification in the writings of one or other of the Brahmo leaders. That the Brahmo Samaj is already on the path that leads to Christianity has been an erroneous conviction with some Christian missionaries, and now fully sharing their conviction, Professor Max-Muller has addressed a long apologetic letter, which has found its way to the press, to Babu Protap Chandra Mazoomdar, impressing upon him the advisability of his renouncing the appelation Brahmo and openly accepting Christianity. This appeal is based on the published opinions and utterances of Babu Protap Chandra and the late Keshub Chandra Sen. We have it on the authority of Professor Max-Muller himself that in intimate conversation with him, Keshub Chandra avowed that he was, to all intents and purposes, a disciple of Christ. Babu Protap Chandra also recently wrote; "Disciples of Christ we certainly are, but we would not call ourselves 'Christians,' because we decline to add another petty sect to the innumerable petty sects which Christians have split themselves into." The logic of Babu Protap Chandra's objection to call his party "Christians" is not quite intelligible. If being "Disciples of Christ," Babu Protap Chandra and his followers refuse to call themselves 'Christians,' they no doubt sail under false colours. They then form a curious religious sect bearing a name that at once suppresses a truth and suggests a falsehood. Why these scruples to add another sect to the Christian sects already existing, when such an act is not a violation of any moral principle, or one that would cause

any harm to the Christian Church? Professor Max-Muller gives Babu Protap Chandra the following advice, the soundness of which, considered even in the light of Babu Protap Chandra's own avowals, can hardly be gainsaid. The Professor says;—"If you are satisfied with being Christians, disciples of Christ, then form your own Church * *. Establish your own Christian Church and defend it against all comers, whether from East or from West. You are fond of saying that Christ himself was an Oriental, not an Occidental. Then why not have your own Oriental Christ, your own Oriental Christianity." We do not see how can Babu Protap Chandra, with any show of reason, refuse to entertain the Professor's proposal.

As there is a tendency among Europeans and all those who are not familiar with the past history and present position of the Brahmo Samaj, to confound the entire body of the Brahmos with Babu Protap Chandra's party, we deem it proper to point out that the Adi Brahmo Samaj, of which this journal is the organ, has all along kept its faith inviolate, and unpolluted by the least touch of man-worship or book-worship; that it has always warned Brahmos, with a partiality for Christ and the Bible, against Christolatry; and that once when its Chief Minister officiated, by request, at the pulpit of Keshub Chandra Sen's Samaj, he condemned in unequivocal terms the Christian proclivities of that Samaj, and characterized the steeple over the building of that Samaj as *Christa-bibhishika* or "the terror of Christ."

We are glad to observe that the *Indian Messenger*, the organ of the Sadharan Brahmo Samaj, and *Unity and Minister*, which represents the views, we believe, of a large number of followers of the late Keshub Chandra Sen, have repudiated Babu Protap Chandra's attitude towards Christ and Christianity in unmistakable terms. It will thus be seen that Babu Protap Chandra's Christolatry does not at all compromise the position of the Brahmo Samaj as a body.

Before we conclude, we wish to address just a few words to Professor Max-Muller. We yield to none in our veneration for this great *savant*, and in our grateful appreciation of the noble service he has done to our country by his stupendous literary labours. But we must confess that we were rather taken aback at his not having fully recognized that the precepts of Christ, in spirit, though not in form, are to be found scattered in the religious works of the Indo-Aryans. The tenor of his letter to Babu Protap Chandra Mazoomdar betrays the fact that his knowledge of the teachings of the Rishis has not been sufficiently deep and intimate to enable him to discern in them, though in a different garb, the same religious truths as were taught by Christ.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali)

SERMON II.

25th Sravan, 1782 Sakabda.

"आनन्दरूप मम्रतं यद्विभाति।"

"He is manifested as Bliss itself and Immortality itself."

They who have steadied their minds by faith in and devotion to the Self-manifest, All-Blissful and Immortal God, behold Him everywhere and at all times, on the earth beneath and in the heavens above, and at dawn and in the evening. As the light of the dawn brightens and the sun rises, animating all living creatures that lie inanimate through sleep during night, and casting a halo of loveliness and beauty on things around, the God-devoted souls behold that Adorable and All-Manifest Being in that resplendent orb. With the approach of dawn in the sky, the light of God dawns on the sky of our souls. He is the inner soul of the sun, He is the inner soul of man, He is the inner soul of every living creature. He manifests himself to us with the manifestation of the world, after it emerges from the cover of darkness. We behold that Light of light revealed in the infant rays of the rising Sun. That Beauty of beauty stands manifest before our vision in the beauty of dawn. As we wake from slumber and open our eyes, we behold His Divine eyes resting benignantly upon ours. We see His glory revealing itself on all sides. If our hearts pant for Him, if we pray to Him with all sincerity, if the hunger and the thirst of our souls are so keen as not to be appeased without Him, we can then behold Him within us and without us, near us and far away from us. If we keep ourselves engaged in unholy pursuits and thus deprive our souls of all animation, if we suffer our souls to be paralyzed against all spiritual influences, if we keep not the doors of our inner being open for the Lord to enter, then repair wherever we may, either to the solitary forest or the crowded city, the place of pilgrimage or the temple of a divinity, we fail to obtain his holy sight. But when we purify ourselves, open the doors of our hearts to the Divine Spirit, and seek Him with ardor, then do we behold Him everywhere—in the mountain-cave, in the wood, in the flower garden, in places frequented, and in spots sequestered. We ask of the sun, where is the Lord? The sun points Him out to us. We ask of the tree in the solitary wood, where is the Lord? Even therefrom we get ready response. We then experience that "स एवाधस्तात् या उपरिष्टात् सपश्चात् सपुरस्तात स दक्षिणतः स उत्तरतः" "He is below us, He is above us, He is before us, He is behind us, He is on the right, He is on the left." On the

earth and in the heavens is His glory. He is manifest everywhere as the Being who is Bliss itself and Immortality itself. It is simply because we keep the doors of our hearts closed against the Lord, that we can not behold that Light of all lights. His presence is equally manifest in the beauty of the rising, and in the glory of the setting sun. His benign image is to be seen as clearly in the dawn as in the evening. When the shades of the night plunge the earth into rest and peace, when the moon rises and sheds its nectareous light in many thousand rays, when the stars shine in the sky, keeping watch as sentries over the sleeping world, who is he whom we then behold manifested in that scene of solemn grandeur? "यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरोयमयति।" "We behold Him who, being immanent in the moon and the stars, ruleth them, of whom the moon and the stars are but the outward form, but whom the moon and the stars know not."

We behold God who is bliss itself and Immortality itself, revealed to us, in the dawn, in the evening, and in the night. But is it only inanimate Nature that reveals Him? Is He not revealed in man also? If we see the beauty of the Being who is Truth itself, Beauty itself and Goodness itself, in the beauty of the morn and the eve and in the beauty of the moon and the stars, do we not perceive His beauty the more clearly in the beauty of the human face? If you care not to see God in man, where else can you expect to see Him manifested so palpably? Would you perceive Him only in matter which is but the image of death and in the animal kingdom? Would you not see Him in the loveliness of the human countenance? Would you not behold the divine light of the Supreme Spirit in the face of His devotee, in the face radiant with love divine? Would you not see the Lord manifested in the bright form of His calmminded, pure-souled lover, shedding tears of love for his Most Beloved? The mountain or the ocean or the sun or the star does not reveal God in the way in which He is revealed in the aspect of the holy man. How striking is the outward expression of the pious? How austere is their spiritual training? How tender, how pure are their hearts? How holy and how soft is the saint's heart which is the dear abode of the Supreme Immortal Spirit? How vivid is His manifestation therein? Nowhere else is God so revealed, neither in the heavens above, nor on the earth below. It is in the loveliness of the faces of the God-devoted, holy saints that He is manifested as Bliss itself and Immortality itself. This prayer-hall is that sacred place where the Lord's devotees sit together and worship Him. Here does He surely manifest Himself as Bliss itself and Immortality itself

In this sacred Brahmo Samaj is our most Beloved God specially present. In the light here does shine His holy light. More brightly and serenely is He manifest in the heart of every one here present. Now that we see Him revealed here so vividly and feel so deeply in our hearts His grace, let us offer the flower of our love at His holy feet, and thereby render this our human existence, which can not be easily got, blessed beyond description

---

The Maharshi on Yoga or Communion with God.

"वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते॥

"The soul that, unattached to the things of the senses, can find felicity in itself, is the soul, that rapt in communion with God, enjoyeth endless bliss."

Recently one morning when I presented myself before my revered spiritual preceptor, the Maharshi, in accordance with my daily practice, and touching his feet reverently, seated myself close to him, he greeted me not, nor made any kind inquiries. He sat calm and motionless with his head erect. His eyes were almost closed, and sometimes they only half opened themselves. I sat quiet, and gazed at him. I fancied that the Maharshi was not in good health, and for that reason it was perhaps a painful effort to him to speak. A full hour passed away in this manner. Then when the Maharshi broke the silence, I lost no time in enquiring if he felt indisposed. "No," said my *Guru-Dev*,* "I am quite well—exceedingly well and have, therefore, been enjoying the felicity of *Yoga*. I have been resting in retirement in the Supreme Spirit, and have had foreglimpses that I shall rest in such communion with Him for eternity. While I was in *Yoga* I could see nothing but, and none else than, God—He alone was with me. Even space did not intervene between Him and me. It is the interposition of space that brings with it the consciousness of you and he, this and that. But during Yoga, I was beholding only the Supreme Spirit, devoid of all senses, and nothing but and none else than Him, and was loving Him only, and He also was beholding only me and offering me the spiritual ambrosia. Every individual soul can feel the presence of the Supreme Soul in it, when it establishes such Yoga or communion with Him. Then the individual soul sees nothing else, knows nothing else.

*Literally preceptor-god.

To every Yogee* of this character God makes Himself his sole possession."

I was moved by what fell from the lips of the Maharshi, and remembering the *sloka* beginning with "अत्त पिता अपिता भवति," that is "in this state the father becomes non-father," referred to it with enthusiasm. In a moment, he recollected the whole purport of the *sloka* and broke forth into the following brilliant exposition; "Yes, what I have just said coincides with the sense of the *sloka* you allude to. I shall repeat it,— "अत्र पिता अपिता भवति माता अमाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः। अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाऽभ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपौल्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसो ननागतं पुण्येनानागतं पापेन तीर्णोहि तदा सर्व्वाञ्शोकान् हृदयस्य भवति।" As asserted in this *sloka*, in this state the out-cast becomes non-out cast, the thief non-thief. But how and when is this state attained? I have dealt at length with this subject in my discourse on "The Next World and Salvation," in the course of which I have made the following observations;—"The sphere of the sinner in the next world is fixed for him who has in this life given evidence of a heart hard as stone, and spent his days in sin—in committing theft, robbery, man-slaughter, and licentious acts which produce serious social disorder. The sinful man, as he wanders in the Sphere of the Sinner, puts on the form to which clings sin, and in course of time his sins are washed away by the tears of repentance. And thus as he becomes free from sin, his soul is illumined by the effulgence of self-approbation, and putting on the form which is the heritage of the righteous, it passes on to the Sphere of the Righteous, where it reaps the fruit of any acts of virtue that it had performed in its earthly career. Then, after it has enjoyed the reward of its virtues, and is spiritualized by the attainment of knowledge, holiness, and love, it is translated into the high Sphere of the Angels. Thus when the man is transformed into the Angel and ascends to a higher heaven, he, with the aid of his vision that has been sharpened and his knowledge that has been deepened, beholds and comprehends the marvellous art which keeps the universe agoing, and then the glory of God is fully revealed unto him. In that divine art and glory he finds bright evidence of God's love, wisdom and goodness, and great is the joy that fills his spirit. It is a joy that makes him join the elder Angels in singing songs of praise to God and flooding Heaven with the swelling tides of their music. By means of instruction received from the elder Angels, he grows more and more in knowledge. When his knowledge has been brightened and his love broadened, so far as

*A person engaged in *Yoga* or Divine Communion.

is possible in that particular heavenly sphere, and when he may be said to have completed his education of that sphere, the gates of a higher heaven are opened to him and he enters it. From this heaven also he ascends to a still higher heaven and goes through the higher education attainable in it. Thus in his onward, progressive march from one sphere to another, as he grows in knowledge, he comes to discern fresh evidences of the workings of the infinite wisdom of the Lord. There is no end of heavenly spheres, there is no limit to the operations of the Divine Intelligence, and there is no termination of knowledge capable of being acquired by a finite intelligent being. When this human spirit transformed into an angel, has his vision opened more and more to the proofs of the Divine wisdom that seems to him ever to grow higher and higher, but yet when he fails to attain that Infinite Spirit of Wisdom and knowledge, roam however he may from heavens lower to higher ones, then is there gradually kindled in his heart a longing to attain nothing else than and none but Him. He then gradually loses his desire to continue his progress through the heavenly spheres, and becomes restless with a divine yearning to attain the Spirit of Infinite Wisdom; then nothing but that song of sadness of which the burden is "what shall I do with the knowledge by which I can not attain Thee" rises ceaselessly from his heart, which has then been freed from all attachment; and he begins to lament the frustration of all his efforts to obtain God. Thus when even the joys of Heaven fail to captivate him, he becomes entitled to salvation. His whole-souled devotion to God, his thirst for Him and the anguish he feels in his mind for the failure of his endeavours to attain Him, at last move the Lord God who loveth his devotee, and He relieves him from the bonds of the body or form, and grants him a place in his interior, deathless, ambrosial bosom which is above heaven and earth, that are circumscribed by space and time. While the Angel-spirit resteth in the bosom of the Lord, for it ceases all the functions of the senses, since it is then without a body; for it there is an end to the capacity for acquirement of knowledge, since there is then nothing external to it; and no more does it then become subject to mental ideas and perceptions. Then the imperfect self knowledge of the Angel-spirit is made perfect by the Lord Verily does the Lord bestow all He possesseth to the devotee at his feet, and keepeth nothing for Himself! Then does the Angel spirit resting in the Spirit of Infinite love, knowledge and joy, become like unto Him in love, knowledge and joy, and is united to Him eternally even as light is united to shadow. Thus does man

by love and worship finally blend himself with God. The human soul saved, is the reflection of the Supreme Soul. The human soul lives and thrives under the protection of the Supreme Soul, and is finally saved by His grace, and through His grace also does it attain Him and think Him to be a possession higher than all other possessions, and in Him does it enjoy the fruition of all its desires. It is with reference to this state of the human soul that one of the Rishis who composed the *Upanishads* has said;—अत्र पिता अपिता भवति माता अमाता लेका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः। अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्रूणहाऽभ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः।" "In this state the father becomes non-father, the mother becomes non-mother, the worlds become non-worlds, the gods become non-gods, and the Vedas become non-Vedas. There too the thief becomes non-thief, the causer of abortion becomes non-causer of abortion and the out-cast becomes non-out-cast." This is spiritual *Yoga*; this is superior *Yoga*, or the highest stage of communion with God.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali)

SERMON III.

Realization Of God In The Soul.

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां।"

"Eternal peace attends none but the wise who behold God in the soul."

Could it ever be desirable that God who is our most Beloved and our inmost self should stay away from us and we from Him? He is the life of all living creatures. He is the bestower of all knowledge; He is our best Friend; and we perpetually enjoy His mercies. Could the wish therefore, ever enter a human heart that God and man might be distant from each other? Could a prayer like this rise from the heart of a man who really deserved the name? Even when a man was polluted by sin and his mind steeped in corruption, could his soul be so paralyzed that he should wish that God should be away from him and he from God? Could a man ever be so degenerate, that the longing for God might be absolutely extinguished in him? He who for his disobedience to God sees Him only in His stern aspect, striking fear into his heart like a thunder about to burst, and therefore shrinks away from Him, may at times wish himself to be away from God and God to be away from him; but does not there rise from the inmost recesses of his soul the solemn warning, "Where wilt thou flee? Who except the Lord could save you? Divorced from the shelter of God, whose protection wilt thou seek?" If your sins have darkened your soul with fear, surrender yourself to God and gird up your loins to free yourself from sin; go and shed tears of repentance at the holy feet of the Lord. What shall it profit you, if you try to live severed from Him? Even the sinful soul can not remain away from Him. Wherever the sinner may go, to the forest or the mountain cave or the region of the ocean, he can not overstep the boundaries of the dominions of the Lord; he can not shake off the fear which clings to him with his sin, unless he surrenders himself to Him. Therefore, sinning, make not the futile effort to flee from God, but with a mind stung by remorse, and a heart eager for consolation, beseech Him to deliver you from sin; and pray to Him thus, 'O Lord, I have made myself foul and unclean; mercifully accept me, O God. Darkness has shrouded my soul; Thou, art the Light of all lights; lead me, O Father, from darkness unto light. Punish me in ways unnumbered, and I shall bear all thy punishment, but save me

from the domination of insidious sin, and reveal to me that aspect of Thine which would calm my troubled soul with its reassuring benignity." If you pray to Him thus for His mercy, with a remorseful and distracted heart, the waters of the Lord's grace will be showered on you, and cool your soul that has been burnt, as it were, by passing through the hell-fire of sin and the furnace of repentance. They who sin and seek not the all-embracing protection of God, and wish that there were no God and no next world, and even persuade themselves to believe in such negations, dwindle themselves into spiritual suicides; and it is these misguided and unfortunate souls who alone wish that they should be away from God and God from them. Stupefied by fear and worldly infatuation, to what perverse doubts they afford room in their minds! How miserable is their condition? How pitiable are they? Their souls would never say, "There is no God;" yet they would remain blind to His existence. They can perceive that God, the All-seeing observer of all acts righteous and sinful, exists and is wide-awake, yet they would not actually see Him. Fear for the consequences of their sins rises in their hearts, and they do fear the Divine Punisher of sins, but they are not actuated by such fear. The Great Father calls them, but they are deaf to His call. Do you shrink at the thought of the punishment he deals out to sinners? No, you must have no fear for the Lord's punishment. His punishment is medicine to the soul. Seek his protection from this very moment, and you will be delivered from all remorse and all fear. Once again will your souls shine with the light of holiness; your hearts will be attracted to the Divine voice, and you will be worthy of cultivating the society of that Supreme Spirit who is Holiness itself. Think of the day of death. On that solemn day when you will have to stand before God, what will be the thought that will fill your mind? Some one of you will perhaps be able to say to yourself;—"There was a period in my life when I strayed into paths devious, and had no hopes for rescue, but God did take pity on me, and through His grace I sought and found Him. Oh, what would have been my fate, if it were not so with my life!" Others among you will perchance be distracted by such thoughts of despair as these, "What will now become of me! I can no longer endure the weight of this grief and mental agony. Whither am I drifting? What is to be my doom? I minded not to make a good use of my life; how often did I set at nought the opportunities that were offered me to tread on the path of righteous-

ness! How frequently did God warn me, but I heeded not his warnings. Oh, what will now become of me?" Think not that the moment of death which might fling any one of you into such a terrible plight as this, is far off; for in this life we can not be sure of any thing. Do not hug the desire to your soul to spend your youth and manhood in the gratification of the senses, hoping to be pious and God-devoted in your old age. Do not defer till to-morrow, what you can accomplish to-day. The demons of sin gather strength with time. If you can resist a temptation or overcome an evil desire to-day, do it by all means, and never say to yourself, "Let me gratify this temptation or that desire to-day for the last time, and never again shall I yield to it." If you show any such inclination, you betray most surely that you are not yet above worldly infatuation and that your mind is not yet free from perverse thoughts and feelings. Can he in whom a loathing for impurity has been generated, rest without divorcing himself from it? Can he welter in impurity and remain at ease even for a moment? Let him then who seeks to be delivered from sin and to behold in himself the victory of righteousness which had lain vanquished in him by sin, come forward and stand before the Lord, suppliant and abased. With a contrite soul, let him shed tears of repentance at His feet, and anon sin will lose all its charm for him, grief will lose all its poignancy for him, and the agonizing pain that weighs down his heart will disappear. Then the unholy thought would never invade his mind that the Lord should be away from Him. On the contrary, he would then deeply repent that he had ever stayed away from God, and had not striven to ceaselessly maintain the inmost relationship that naturally exists between him and the Supreme Spirit. He would then lament the emptiness and the unholiness of the Godless days of his life. He would then rejoice that through the grace of the Lord he could now realize His presence, and that in His infinite mercy the Lord did at last manifest Himself to him. He would then apprehend through actual personal experience that unbroken peace could attend only those men of divine knowledge who behold the Lord in [illegible] as they behold [illegible] objects, and that none else could enjoy such peace. He would then realize that when he was away from God, he suffered from perpetual unrest, but now that he had come to Him, his life was all nectar, and joyous like a world illumined by the moon. What an immense contrast would he find between these two states of his life! In the one

state, in which he lived away from God, no happiness could make him happy, and in the other, in which he has realised God in his soul, he feels happy under all dangers and perils. Enemies unnumbered may now assail him, but none can rob him of the peace that he enjoys in his soul, for he has now attained the Lord who is the soul's abode of peace. Remorse can no longer touch him; grief has no longer any bitterness for him; death can no more strike fear into him. As the Upanishads say; "The God-devoted man delivered from sin and grief, and freed from the bondage of attachment, becomes immortal." "Eternal bliss attends none but those men that behold palpably in their souls the Being who ruleth all, who is the interior soul of all living creatures, and who by his creative power diversifies forms of things." "Eternal peace attends none but those men of divine knowledge who behold in their souls that Being who is the only Reality in the [illegible] real things, who is the [illegible] of all creatures animate, and who provide all creatures with every thing that they desire to have. The Upanishads here speak of beholding God palpably and directly in the soul. The right presence of God in the light of the lamp before us is not a presence of sufficient nearness to us. We behold Him nearest to us when we behold Him in the soul. He fills this Prayer Hall with His presence, and we are fully conscious of it; but He is really more near to us than such presence would imply—He is present in the interior of our souls. He is the god of the temple of our body. To behold Him without us, is in a manner to behold Him as one distant from us. It is only when we behold Him in us that we behold him as one near to us. He is the deity of the temple of human body. He is every man's own treasure. He is not only a general possession enjoyed conjointly by all, like the sun, or the fire, or the wind, or the rain, but He is also the personal possession of each one of us. There is a very close relationship between Him and every individual soul. He is the master of every house and the household god of every one of us. As one speaks of one's father as "my father," one's mother as "my mother," one's brother as "my brother," and one's sister as "my sister," so should one speak of God as "my God." Every one of us can say, "God is *my* God, the Lord is the Lord of *my* heart." **"यउदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति।"** "He who seeth God as existing even at a little distance from him, is oppressed by fear." It is only when we feel his presence in the soul, that we become fearless with Him. What a marvel that we behold God everywhere, within us and without us! When we open our eyes, we behold Him all around us, and when we close them we behold present in our souls His self-manifest image.

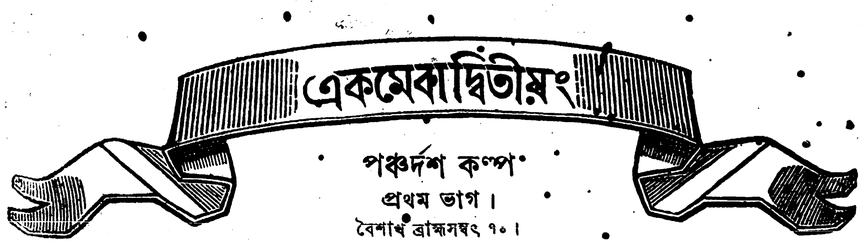

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকাশ।

যখন ব্রহ্মপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"যন্নু ম ইয়ং ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যান্নু হং তেনামৃতাহো।"

হে ভগবন্! যদি এই সমুদায় পৃথিবী বিত্তেতে পূর্ণ হয় তবে ইহার দ্বারা আমার কি অমৃত লাভ হইবে?

"নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—

তাহা কখন হইতে পারে না

"যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।"

উপকরণবিশিষ্ট সংসারী ব্যক্তির জীবিত যেরূপ তোমারও সেইরূপ হইবে কিন্তু বিত্তেতে অমৃতত্বের আশা নাই।

ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"।

যাহা দ্বারা আমি অমৃত না হই তাহা লইয়া কি করিব?

এ কালে আমরাও সেই অমৃতের ভিখারী হইয়া এই মৃত্যুময় সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিষয়-সুখ আছে—অশেষ প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে যাহাতে আমাদের শরীর পুষ্ট হইতেছে—ইন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ হইতেছে কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। সংসার সকল সময়ে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না—আত্মার গভীর ব্যাকুলতা মোচন করিতে সমর্থ হয় না। আত্মার ক্ষুধার অন্ন ঈশ্বর—তিনিই তাহার পিপাসার জল—আরামের স্থল। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর হৃদয়ে এই যে অমরত্বের গভীর উচ্ছ্বাসের কথা—এ উপনিষদের সময়কার কথা। সে কালেরও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিরা এই একই পরমার্থতত্ত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ জয় পরাজয়ের কঠোর রঙ্গভূমিতে জীবন যাপন করিতেন কিন্তু এই উদ্যমশীল জীবন-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও তাঁহারা

ধর্ম্মালোচনা হইতে নিরস্ত ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে যেমন একজন ঋষি বলিয়া গিয়াছেন

যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যাঃ।

ঋগ্বেদ ১—৮২।

যিনি এক হইয়া সকল দেবতার নামধা হইয়াছেন, অন্য তাবৎ ভুবন তাঁহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে সেই বহু প্রাচীন কালেও সেই সকল ধর্ম্ম-প্রহেলিকার আন্দোলন চলিয়াছিল যাহার তরঙ্গে এখনো পর্য্যন্ত মানব হৃদয় আলোড়িত হইতেছে। আমি কি? কোথা হইতে আসিলাম? কাহা হইতে এই সৃষ্টির উৎপত্তি?

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আ জাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ"।

ঋগ্বেদ ১০—১২৯।

প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে? কে বলিতে পারে? এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আমরা কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা অর্চ্চনা করিব?

আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা যে দেবতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া বলিয়াছিলেন

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"।

এবং তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন

"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিসং যস্য দেবা যস্য ছায়া হমৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

আত্মদা বলদা যিনি; সর্ব্ব বিশ্ব সকল দেবতা বহিছে শাসন যাঁর—মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া—

আমরাও এখনকার কালে সেই দেবতারই অনুসন্ধানে ফিরিতেছি এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি

"মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"।

মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। আত্মার এই স্বাভাবিক ঈশ্বর-স্পৃহা হইতেই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি। পুরাকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে এই এক ধর্ম্মের কাহিনী শ্রবণ করা যাইতেছে এবং অনেকানেক ধর্ম্মোপদেষ্টা সময়ে সময়ে উদয় হইয়া ধর্ম্মের নানা পথ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশের এই ধর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধারণ করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়টী গুরুতর, সময় সংক্ষেপ, আমার মতি ও 'অল্পবিষয়া'—কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব বলিতে পারি না। আমার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি হইবে না কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্য, ক্ষমা ও উদার দৃষ্টির উপর আমার অভীষ্ট সিদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

আমাদের দেশের ধর্ম্মকাহিনী বলিতে হইলে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিতে হয়। মনে করিয়া দেখুন কত শত বৎসর পূর্ব্বে সেই আদিম আর্য্যেরা উত্তর প্রদেশ হইতে হিমালয় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন; পঞ্জাবের পঞ্চ নদী পার হইয়া ক্রমে দাক্ষিণাত্যে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিলেন। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় তাহারও উত্তরে তাঁহাদের আদিম নিবাস। সেই হিমপ্রধান দেশে উত্তাপ যে কি প্রয়োজনীয় কি প্রার্থনীয় বস্তু মনে করিয়া দেখুন—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন বেদমন্ত্রে অগ্নির এত মাহাত্ম্য কিসে? শুদ্ধ ভারতবর্ষীয় আর্য্যের কথা কেন তাঁহাদের ইরানী ভ্রাতৃগণের সহিত এ বিষয়ে তাঁহাদের ঐক্য দেখা যায়। অগ্নি উভয় জাতিরই বন্ধু, আদরের সামগ্রী,

উভয়েই অগ্নিউপাসক ছিলেন। অগ্নি এখন আমাদের সামান্য ব্যবহারের জিনিস, তাহার মর্য্যাদা আমরা তেমন অনুভব করি না। কিন্তু মনে করিয়া দেখুন সেই জনসমাজের শৈশবাবস্থায় অগ্নি কি দুর্লভ সামগ্রী! কাষ্ঠ কাষ্ঠের—অরণী অরণীর সঙ্ঘর্ষণে যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইত তখন তাঁহারা কি আশ্চর্য্য ভাবে সে চমৎকার ব্যাপার দর্শন করিতেন; অগ্নির দাহিকা শক্তি, তাহার সহস্র গুণ নিরীক্ষণ করিয়া সেই অনলের স্তুতিবাদ করিতেন—সেই স্তুতিমালায় বেদমন্ত্র সংগ্রথিত। অগ্নি পুরোহিত অগ্নি যজ্ঞের অধীশ্বর হইয়া দেবতাদের নিকটে কবি-প্রদত্ত আহুতি বহন করিয়া লইয়া যান তাই তাঁহারা বলিলেন

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমং।"

মধ্য আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্র বৈদিক ঋষিদিগের পরমারাধ্য দেবতা ছিলেন, বেদমন্ত্র ইন্দ্রের স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ। বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসন। আর্য্যেরা উত্তর হইতে দক্ষিণে স্বকীয় আধিপত্য যতই বিস্তার করিতে লাগিলেন ততই বৃষ্টির আবশ্যকতা—উপকারিতা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। শীতাগমে যেমন উত্তাপ উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে তেমনি বৃষ্টি। বৃষ্টির অভাবে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উপস্থিত হয়। কে সেই বৃষ্টিকে আনয়ন করেন? ইন্দ্রদেবই বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরকে হনন করিয়া পর্জ্জন্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। আর্য্যেরা তখন নব নব রাজ্য জয় করিতেছেন, নূতন নূতন অধিবাসীদের উপরে জয় লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হইতেছে—কাহার প্রসাদে সেই জয় লাভ? ইন্দ্রের প্রসাদে। ইন্দ্র তাঁহাদের জয়দাতা সিদ্ধিদাতা। হোম যাগ যজ্ঞে তাঁহারা ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করিতেন—ইন্দ্রও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন; দস্যু দমন করিয়া তাঁহাদের রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করিতেন—বৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের ভাণ্ডার ধনধান্যে পূর্ণ করিতেন।

বৈদিক দেবগণের মধ্যে সূর্য্যও উচ্চ আসন গ্রহণ করেন। মর্ত্ত্যলোকে যেমন অগ্নি আকাশে তেমনি সূর্য্য। সূর্য্যের মহিমা কাহার না প্রত্যক্ষ হয়? কোন্ মানব তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে? আমাদের আলোক উত্তাপের আকরভূমি কোথায়? কাহার প্রসাদে বসুন্ধরা ফলফুল ধনধান্য শস্যে পূর্ণ হইয়াছে? জীবন প্রাণের প্রস্রবণ কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে? ওই অগ্নিকুণ্ড সূর্য্য হইতে, প্রতি প্রাতে যাঁহার জন্ম, প্রতিদিন উদয় হইয়া যিনি জনগণের হৃদয় নয়ন প্রমুদিত করিতেছেন; সুপ্তোত্থিত জীবন সকলকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন।

সূর্য্যোদয়ের আগে ঊষার প্রকাশ। অন্ধকার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী শুভ্রবসনা ঊষা নববধূর ন্যায় সজ্জিত হইয়া আমাদের সম্মুখে স্বীয় রূপমাধুরী বিস্তার করিতেছেন—আর্য্য কবিরা সেই মোহন মূর্ত্তি কি মোহিত ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহারা মধুর ছন্দে বলিয়া উঠিলেন—

"উষো! জাগো! আমাদের জীবন, আমাদের নিঃশ্বাস ফিরিয়া আসিল। অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, আলোক সঞ্চার হইতেছে। ঊষাদেবী সূর্য্যের ভ্রমণ পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। আমরা এইক্ষণে নবজীবন লাভ করিলাম। হে সুভগে!

তুমি এই স্থানে অন্ধকার দূর করিয়া প্রকাশিত হও।

উষাদেবী কৃষ্ণরূপী নৈশ তিমির বিদূরিত, দিগ্বিদিক্ আলোকিত, ও সুপ্ত প্রাণীদিগকে জাগরিত করিয়া অরুণাশ্ব রথে আগমন করিতেছেন। কবি সেই জ্বলন্ত উষার স্তুতিগান করিতে জাগ্রত হইয়াছেন—হে উষস্, তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হও। উঠো! আমার প্রার্থনায় কৃপালু হইয়া কর্ণপাত কর—মর্ত্ত্যের সমক্ষে অমরভাবে প্রকাশিত হও!

তোমাকে দেখিতে দেখিতে কত নর নারী চলিয়া গিয়াছেন—আমরা এইক্ষণে আবার তোমাকে দর্শন করিতেছি।

"শশ্বৎ পুরোষা ব্যুবাস দেবী
অথা অদ্যেদং ব্যাবো মঘোনী।
(ধনবতী।)
অথো ব্যুচ্ছাৎ উত্তরাং অনু দ্যূন্
অজরামৃতা চরতি স্বধাভিঃ"।
(তেজোভিঃ সহ।)

ধনবতী উষা দেবী পূর্ব্বকালে নিত্য উদয় হইতেন এখনো এই জগৎকে তিমিরমুক্ত করিতেছেন—ভবিষ্যতেও সেইরূপ তিনি দিনে দিনে উদয় হইবেন কেন না তিনি অজরা অমরা হইয়া স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন।

"মাতা দেবানাং অদিতেরনীকং
যজ্ঞস্য কেতু র্বৃহতী বি ভাহি
প্রশস্তিকৃৎ ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা
নো জনে জনয় বিশ্ববারে"।

হে উষস্ তুমি দেবগণের মাতা, অদিতির আনন, যজ্ঞের কেতু; বিশ্ববরণীয় যে তুমি, তুমি আমাদিগকে জনপদে আনয়ন কর—তোমার স্তোতার সমক্ষে প্রকাশিত হও।

ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ১১৩।

উষা সূর্য্যের সারথী রূপে আবির্ভূত হইলেন—অচিরাৎ নবভানু সহস্র কিরণে নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দেখা দিলেন।

"অনন্তর বিশ্বলোচন তিমিরমোচন তরুণ বিভাকর যবাকুসুম-সদৃশী আশ্চর্য্যময়ী মহীয়সী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিগস্থিত সুরাগুরঞ্জিত প্রবালমণ্ডিত সুরম্য প্রাসাদ হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে এবং স্বকীয় সুবর্ণময় রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া নব-পল্লব-পরিবেষ্টিত সমুন্নত তরুশিখা সকল অতি মনোহর হিরণ্যময় মুকুটে ভূষিত করিতেছে"।

এই আশ্চর্য্য দর্শন দর্শন করিয়া আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা কি অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—

"যেন সূর্য্য জ্যোতিষা বাধসে তমঃ
জগচ্চ বিশ্বং উদিষির্ষি ভানুনা
তেনাস্মৎ বিশ্বাং অনিরাং অনাহুতিং
অপ অমীবাং অপ দুঃস্বপ্ন্যং সুব"।

ঋগ্বেদ ১০-৩৭-৪।

হে সূর্য্য! যে জ্যোতিঃ দ্বারা তুমি তমোনাশ করিতেছ এবং বিশ্ব জগৎকে প্রভামণ্ডলে পূর্ণ করিতেছ, সেই জ্যোতি দ্বারা আমাদের সমস্ত অমঙ্গল অনাহুতি, ব্যাধি দুঃস্বপ্ন অপনোদন কর।

এইরূপে তাঁহারা দেবতাদের সহবাসে মহা আনন্দে, মহোল্লাসে এই পুণ্য ভারতভূমিতে ক্রমে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে দুঃখ ক্লেশ জরা মৃত্যুর দিকে মানব চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল—জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মভোগ—ঘোর অদৃষ্টবাদের স্রোতে সকলে বিচলিত হইয়াছিলেন বৈদিক কালে সে ভাব নাই। তখন আনন্দ ও উৎসাহ-ধ্বনিতে দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ছিল। যমকেও তাঁহারা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন না। বৈদিক

যম এ কালের করালমূর্ত্তি ভীষণ দৈত্য নহে; তিনি পরলোকে প্রেতাত্মাদের পথপ্রদর্শক। পিতৃপুরুষেরা যে পথ দিয়া গিয়াছেন তিনি সেইপথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারা যে লোকে বাস করিতেছেন সেই লোকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলাইয়া দেন।

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিঃ অপভর্ত্তবৈ উ যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ এনা যজ্ঞানাঃ পথ্যাঃ অনু স্বাঃ।

ঋগ্বেদ ১০-১৪-২।

আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইব তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন, সেই পথ আর অপহৃত হইবার নহে। যে পথে পূর্ব্বে আমাদের পিতৃ পুরুষেরা গিয়াছেন সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্মগুণে সেই পথ অনুসরণ করে।

যম প্রেতাত্মাদের রাজা, মৃত্যু তাঁহার বিচক্ষণ দূত। আর্য্য ঋষিদের চক্ষে মৃত্যু বিভীষিকা নয় কিন্তু অমৃতের সোপান। যেমন দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর আবার দিন, তেমনি মৃত্যুর পর তাঁহারা প্রিয়জনমিলন-সঙ্ঘটনকারী নবজীবন প্রতীক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদে সোমস্তুতির কয়েকটী সুন্দর মন্ত্র আছে তাহাতে অমরত্ব প্রার্থনার গম্ভীর উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইবেন। তাহা এই (৯-১১৩)

"যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতং
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান অমৃতে লোকে অক্ষিতে"

হে পবমান সোম! যে লোকে অজস্র জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত সেই অমৃত অক্ষয় লোকে আমায় স্থাপন কর।

"যত্র রাজা বৈবস্বতো, যত্রাবরোধনং দিবঃ
যত্রামূর্হতী রাপুঃ তত্র মাং অমৃতং কৃধি"।

যে লোকে বৈবস্বত (যম) রাজা রাজত্ব করেন, যেখানে দ্যুলোকের অন্তরতম স্থান এবং বিস্তৃত সলিল-পুঞ্জ অবস্থিত আছে, সেই স্থানে আমাকে অমর কর।

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে, ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা, যত্র-জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মাং অমৃতং কৃধি॥'

সেই যে ত্রিনাক দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ স্থান, জ্যোতিষ্মন্ত লোক সকল যেখানে বিরাজিত, সেই স্থানে আমাকে অমর কর।'

"যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র বৃধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধি॥"

যেখানে সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যেখানে আদিত্যের অধিষ্ঠান, যথায় স্বধাও আছে তৃপ্তিও আছে, তথায় আমাকে অমর কর।

"যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি॥

যেখানে আনন্দ, যেখানে আমোদ প্রমোদ সুখ সম্ভোগ, যেখানে কাম্য বস্তু সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাকে সেই স্থানে অমর কর।

সেই বৈদিক কালের ছায়া এখন আমরা বেদের মধ্য হইতে কিয়ৎপরিমাণে স্পর্শ করিতেছি। বেদমন্ত্রগুলি প্রাকৃতিক দেবতাদের স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য্য এখানো তেমনিই আছে, সেই শুভ্রবসনা উষা, সেই তরুণ বিভাকর, সেই রতন-মণি-খচিত নীলাম্বর তেমনিই রহিয়াছে কিন্তু সে সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের ততটা কোথায়? আমরা অভ্যাস বশতঃ, জড়তাবশতঃ এই শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্পাতও করি না। প্রকৃতির মোহিনী শক্তি সকল আমাদের চতুর্দ্দিকে সমানভাবে কার্য্য করিতেছে, বসন্তের মলয়ানিল বর্ষাকালের প্রবল ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ—প্রকৃতির মধুর হাসি, প্রকৃতির উগ্র মূর্ত্তি তেমনিই প্রকাশ

পাইতেছে, আমরা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু আর্য্য ঋষিদের ভাব স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে—এই প্রভাবশালী শক্তি সমূহে পরিবৃত হইয়া সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি আশ্চর্য্যোৎফুল্ল নয়ন উন্মীলন করিতেন এবং নানা ছন্দোবন্ধে তাঁহাদের স্তুতিগান করিয়া আনন্দে উৎসাহে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। "সূর্য্যে, চন্দ্রে, মেঘে, বিদ্যুতে, অনলে অনিলে সলিলে সর্ব্বত্রই তাঁহারা দৈবশক্তি, দৈব মহিমা, দৈব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেন। দেবতাগণকে তাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া জানিতেন; আর উৎসবের সময়ে, ক্রিয়া কর্ম্মের সময়ে, জয় পরাজয়ের সময়ে, সুখে দুঃখে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অতিথি সৎকার করিতেন; তাঁহাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে আপন আপন মনের ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন; আনন্দের সময় আনন্দ জানাইতেন, দুঃখের সময় দুঃখ জানাইতেন। তাঁহারা পরমপিতার নবপ্রসূত সন্তান ছিলেন—তাই তাঁহাদের অন্তঃকরণ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ, নির্ম্মল এবং কৃত্রিমতাশূন্য ছিল। অভিনব শিশু যেমন মাতৃভাষা সহজে আয়ত্ত করে, তেমনি তাঁহারা প্রকৃতির নিজের মুখের ভাষা, ওষধি বনস্পতির ভাষা, বজ্র বিদ্যুতের ভাষা, তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত নদ নদীর ভাষা নবানুরাগে আয়ত্ত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেন।" দেবতা অর্থাৎ দ্যুতিমান্—প্রকাশমান্। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাতবেদা, সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সবিতা, মধ্য আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ পর্জ্জন্য; অন্তরীক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবরণকারী বরুণ; অনন্ত আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবজননী অদিতি—এইরূপে যখন যে দেবতা তাঁহাদের জ্ঞাননেত্রে প্রকাশিত হইতেন তখন তাঁহার প্রতিই তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ প্রীতি ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইত। তাঁহাদের চক্ষে জল স্থল নভোমণ্ডল অন্তরীক্ষ বিশ্বভুবন দেবতাত্মক। কখনো সেই দেবতারা যজ্ঞক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্তোতৃবর্গের সহিত একত্রে মধুর হব্য ভক্ষণ করিতেন, কখনো বা তাঁহারা প্রীতি-নিবেদিত দধিমিশ্রিত সোমরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধনরত্ন দানে পরিতুষ্ট করিতেন।

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেই অবরুদ্ধ হইয়া মনুষ্যের স্বাধীন আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না—প্রকৃতির অতীত সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষের প্রতি আপনাপনি ধাবিত হয় ও তাঁহাকে পাইয়া শান্তিলাভ করে: বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির মধ্য হইতে প্রকৃতির অতীত পুরুষকে যে দেদীপ্যমান দেখিতেন—নিয়মের মধ্যে নিয়ন্তা, যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রী—প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি অনুভব করিতেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন বেদসূক্তের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদের মধ্যে এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে কথিত আছে—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

যিনি এক সৎস্বরূপ বিপ্রগণ তাঁহাকে বহুধা বর্ণন করেন—তাঁহাকেই অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলা হইয়া থাকে।

এই এক চিত্র! কিয়ৎকাল পরে আর এক চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়! আদিম বৈদিক ঋষিগণ ঋজুস্বভাব সরলচেতা প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ—প্রকৃতির আদিকবি ছিলেন। যে সময়ে তাঁহাদের উপাসনা কার্য্য অকৃত্রিম স্তুতি বা সৎসহকারে প্রীতির সহিত

দ্রব্য বিশেষ নিবেদন মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হওয়া সম্ভব। প্রাচীনতর দেবগণের মধ্যে উষা অগ্নি সূর্য্য, ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতাগণই অগ্রগণ্য ও তাঁহাদের স্তুতিমালায় ঋগ্বেদের অধিকাংশ পরিপূর্ণ। ক্রমে পুরাতন বৈদিক দেবতাদের মহিমা অস্তোন্মুখ হইল এবং বৈদিক ক্রিয়াগুলি জটিল কুটিল বহুব্যাপারশালী হইয়া উঠিল। বেদে দেবপ্রীত্যর্থ যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিধি আছে সেই সকল যজ্ঞ কামপ্রধান হইয়া উঠিল—পুত্রকাম, ধনকাম, যশস্কাম প্রভৃতি নানাবিধ ফল কামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক ক্রিয়ায় পৃথক্ ফল; তাহার অনুষ্ঠান-বিধানে কতপ্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইল! অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র ত্রুটি হইলে আশানুরূপ ফল লাভের ব্যত্যয় হয়, তাহার প্রতিবিধান উদ্দেশে কত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত হইল। এই সকল বহু আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের পরিচালক পুরোহিতের সাহায্য অনিবার্য্য, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ভিন্ন সে সমস্ত সুসম্পন্ন হয় না সুতরাং ব্রাহ্মণের আধিপত্য হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ বিস্তার হইতে লাগিল। বৈদিক সূক্তরচনার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণভাগের রচনা-কালে ব্রাহ্মণ-বর্ণের মহিমা ও গরিমা অতিমাত্র প্রবল দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণামে ব্রহ্মতেজই গগন স্পর্শ করে—সেই সময়েই বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে ধিক্কার করিয়া বলিয়া ছিলেন "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং।" যাজন ধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদির পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষত রাখিবার জন্য প্রভূত যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন—তদনুসারে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি প্রজারক্তশোষণকারী ভারি ভারি যজ্ঞ রাজ্যের স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এইরূপে যখন বেদের রূপান্তর ঘটিল, সরল সহজ বৈদিক উপাসনা কতকগুলি সারহীন, অর্থহীন, বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইল, তখন উপনিষদের ঋষিরা তাহার বিরুদ্ধে গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

বেদ বেদাঙ্গ সকলি অপরা বিদ্যা, পরা বিদ্যা সেই যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য স্বরূপকে জানা যায়।

উপনিষদে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর প্রতি যে কয়েকটী উপদেশ আছে তাহার মধ্যে স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রান্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যাহারা সহস্র সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে তাহাদের সেই ফল অস্থায়ী। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতার তৃপ্তি সাধন করা নিতান্ত বিফল প্রযত্ন।

উপনিষদকে সামান্যত বেদান্ত বলা যায়, বেদান্ত কি না বেদের অন্তিম অথবা বেদের সার ভাগ। আদিম উপনিষদগুলি আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষদের ঋষিরা এই সমস্ত বাহ্য কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া অরণ্যবাসী হইয়া আত্মজ্ঞানানুশীলনে ও ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত ছিলেন, পরে যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে আত্মজ্ঞান উদয় হইল তখন আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমাত্মাকে উপ-

লব্ধি করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন।

আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ স্থাপন—সেই যে অধ্যাত্মযোগ, তাহাই উপনিষদের মূলতত্ত্ব এবং নানা উপদেশ ও আখ্যায়িকা সূত্রে তদ্বিষয়ক শিক্ষা-দান উহার চরম উদ্দেশ্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে আত্মজ্ঞান বিষয়ক একটী আখ্যায়িকা বলিতেছি শ্রবণ করুন—

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বিরোচন আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত হইবার পর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন তোমরা এখানে আসিয়া বাস করিতেছ।' তাঁহারা বলিলেন—

"য, আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"।

যে আত্মা পাপশূন্য, অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎপিপাসাবর্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক, এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

আমরা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এই যে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি সেই আত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

প্রজাপতি একেবারে সমস্তটা খুলিয়া বলিবেন না, দ্ব্যর্থভাবাপন্ন দু একটা কথা বলিয়া উপদেশ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বলিলেন "এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষের আকৃতি দেখিতেছ ওই সেই আত্মা, সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম"।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন 'জলে যাহার প্রতিবিম্ব পড়ে—দর্পণে যে মূর্ত্তি দর্শন করা যায় সে কে?

প্রজাপতি উত্তর করিলেন "সেই আত্মা বটে। জলপূর্ণ পাত্রে একবার তোমার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন কর—দেখিয়া যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে বলিও।"

তাঁহারা জলের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিতেছ?"

তাঁহারা বলিলেন "আমাদের উভয়ের সমস্ত দেহের অবিকল প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি—নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব দেখা যাইতেছে।"

প্রজাপতি বলিলেন "তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার দেখ কি দেখা যায়?"

তাঁহারা সেইরূপ করিয়া বলিলেন "আমরা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই যেমন তেমনি দেখিতে পাইয়াছি।"

প্রজাপতি বলিলেন "ওই যা দেখিতেছ ওই সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।"

বিরোচন ঐ কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অসুরদের নিকট ফিরিয়া গেলেন ও সেই অনুসারে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন—তাহাতেই তাহাদের অধোগতি হইল। তাহারা দেহকে আত্মা মনে করিয়া বিষয়সুখেই মত্ত থাকে। যাহারা এখানে দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্ম করে না, ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই তাহারা এই আসুরিক ব্যবহারের দরুণ অসুর নামে খ্যাত। অসুরেরা ক্ষণবিধ্বংসী শরীরকে আত্মা ভাবিয়া মৃতদেহকে গন্ধমাল্য বেশ ভূষায় ভূষিত করিয়া আপনাদিগকে ভুবনবিজয়ী জ্ঞান করিয়া থাকে। এই হেতুতেই তাহাদের অধঃপাত হয়।

কিন্তু ইন্দ্র এ উপদেশে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ভাবিলেন 'জলের মধ্যে দেহের যে পরিষ্কার সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে সে যদি আত্মা হয় তবে অন্ধ হইলেও আত্মা অন্ধ দেখিতে হইবে, পঙ্গু হইলে আত্মাও ঐরূপ হইবে এবং দেহনাশের সঙ্গে আত্মাও বিনষ্ট হইবে। অতএব এ উপদেশ কোন কার্য্যেরই নয়। তিনি সমিৎ হস্তে পুনর্ব্বার প্রজাপতির দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপনার সংশয় জানাইলেন।

প্রজাপতি বলিলেন "যা বলিতেছ ঠিক কথা—আর ৩২ বৎসর আমার নিকট বাস কর তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এইরূপে আরো ৩২ বৎসর গত হইলে প্রজাপতি বলিলেন—

"স্বপ্নে যিনি সুখে বিচরণ করেন তিনিই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।"

কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্রের সন্দেহভঞ্জন হইল না। তিনি ভাবিলেন "সত্য বটে, এ অবস্থায় আত্মা দেহের ব্যথায় ব্যথিত হয় না তবুও ত স্বপ্নে মনে হয় কে যেন আমাকে তাড়না করিতেছে—কে যেন আমারে পীড়ন করিতেছে—সে সময়ে ত কষ্টে অভিভূত হইয়া কখন বা অশ্রুপাত করিতে হয়।"

এই সংশয় পুনর্ব্বার জ্ঞাপিত হইলে প্রজাপতি ইন্দ্রকে আবার বত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সেই কাল অতীত হইলে ইন্দ্রকে বলিলেন—

"সুষুপ্তি অবস্থায় মনুষ্য কখন কোন স্বপ্ন দেখে না—সম্পূর্ণ শান্তির অবস্থায় থাকে—সে সেই আত্মা—সেই অমৃত অভয় ব্রহ্ম।"

তবুও ইন্দ্রের সংশয় মিটিল না। তিনি ভাবিলেন "এ অবস্থায় আত্মা আপনাকে আপনি জানে না আর বাহিরের কোন বস্তুকেও জানিতে পারে না। এ বিনাশের অবস্থা। অতএব এ উপদেশ কোন কার্য্যেরই নহে।"

সমিৎহস্তে পুনর্ব্বার তিনি প্রজাপতির নিকটে যাইলেন। গিয়া গুরুর আদেশমত আরো ৫ বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সেই কাল গত হইলে সর্ব্বশুদ্ধ শতাধিক এক বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইয়া রীতিমত উপদেশ প্রদান করিলেন।

এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরি, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত এই আত্মাও সেই রূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন "আলোক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। যিনি আঘ্রাণ করেন তিনি আত্মা, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়; যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়; যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়; যিনি মন দ্বারা মনন করেন তিনি আত্মা মন দিব্য চক্ষুঃস্বরূপ; আত্মাই এই মনোরূপ দিব্য চক্ষে কাম্য বিষয় সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্মা যত দিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখে বিচলিত হন কিন্তু যখন তিনি দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং নবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"

যেমন অশরীরি বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরমজ্যোতি পরমাত্মাকে

পাইয়া নিজ রূপে প্রকাশিত হয়েন—তখনই তিনি উত্তম পুরুষ—তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া—বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তখন তিনি পরম শান্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন।"

প্রজাপতির এই উপদেশ, সমস্ত উপনিষদেরও এই সার মর্ম্ম। বৈদিক ঋষিরা এককে বহুরূপে প্রকৃতিক্ষেত্রে প্রকাশিত দেখিয়া পূজা করিতেন—

যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—

এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ—তাঁহার আবির্ভাব তাঁহারা দ্যুলোকে ভূলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে—সূর্য্য চন্দ্র বায়ু মেঘ বিদ্যুতে প্রত্যক্ষ করিতেন।

উপনিষদের আচার্য্যেরা বহু হইতে একে পৌঁছিয়া সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন,

যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।

যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন,

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তি-লাভের অন্য উপায় নাই। যখন সাধক জানিতে পারেন যে "যিনি অসীম আকাশের অধিদেবতা সর্ব্বজগতের মূলাধার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনিই আমার আত্মার অধিদেবতা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা"—জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমাধান করেন—তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা।"

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন।

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"

তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

বৈদিক কাল ও তৎপরবর্ত্তী কালের মধ্যে আর এক বিষয়ে বিশেষ ভাব-বৈলক্ষণ্য উপলক্ষিত হয়। বৈদিক ঋষিরা জীবনের কর্ম্মোদ্যম ও সুখের দিক্‌টাই দেখিতেন—জীবনে যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা আছে—রোগ শোক জরা মৃত্যু তাহার প্রতি তাঁহাদের মনোনিবেশ করিবার অবসর ছিল না। তাঁহাদের যা কিছু অল্প সম্পত্তি ছিল তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত ছিলেন এবং যখন তাহা দেবতাদের সঙ্গে বাঁটিয়া ভোগ করিতেন তখন তাঁহাদের সে সুখ দ্বিগুণিত হইত; এইরূপে শিশুর ন্যায় তাঁহারা নবোৎসাহে নবোদ্যমের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। জীবনের আলোকের দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি এবং মৃত্যুর পরে পিতৃলোকে আপনার প্রিয়জনের সহিত মিলন, এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া তাঁহারা মৃত্যুকে প্রতীক্ষা করিতেন। উত্তর কালে জীবনের অন্ধকারের দিক্‌টাই ফুটিয়া উঠিল—তখনকার গগন ঘোর বিষাদ-তিমিরে আচ্ছন্ন দেখা যায়। সংসার সুখের স্থান নহে, দুঃখের আগার। জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। কেন আমরা এত কষ্ট পাই? কেন এই দুঃখ ভোগ করি? ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে কেন এত ক্লেশ, কেন এই দুঃখ যন্ত্রণা? এই বিষম সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া ঘোর অদৃষ্টবাদ আসিয়া পড়িল। আমাদের সুখ দুঃখ এখানে যা কিছু ঘটিতেছে সকলি অদৃষ্টের ভোগ, আমাদের পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফল হইতে যত এই অশুভের উৎপত্তি। ভবিষ্যতেও এই কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন করিবার উপায় নাই, জীবাত্মার নিজ নিজ কর্ম্মগুণে পুনঃ পুনঃ যোনিভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্মস্রোতের আদি নাই, অন্ত নাই। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে উচ্চে নীচে কোথাও এই কর্ম্মফল জন্মবন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। এই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে সংসারের যে সুখভোগ তাহা ক্ষণস্থায়ী, শূন্য ও অকিঞ্চিৎকর। যেমন এক বিন্দু বিষের সম্মিশ্রণে অমৃতও গরল হয় ঐহিকের সুখও সেইরূপ দুঃখ ক্লেশের সংশ্রবে অসুখে পরিণত হয়। ভবিষ্যতেও নিস্তার নাই কেন না নূতন জন্মে নূতন কষ্টভোগ। স্বর্গে গিয়াও শান্তি নাই কেননা যে পুণ্যবলে স্বর্গ লাভ হয় সেই পুণ্যবল ক্ষয় হইয়া গেলে পুনরায় অধঃপতন। জন্মজন্মান্তরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ যোনিভ্রমণ, অশান্তি ও কষ্টভোগ, ইহা হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায়? এই পরিবর্ত্তনশীল মৃত্যুময় সংসারমধ্যে অমৃত কোথায় পাওয়া যায়? ইহার উত্তরে উপনিষদের আচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন—বিজ্ঞানই অমৃতসোপান। "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং।" সে বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। সে জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানই সেই মোক্ষপথ প্রদর্শন করে যাহা হইতে আর বিচ্যুতি নাই।

"যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে।"

"তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

সেই বেদ্য পুরুষকে জান যাহাতে তোমাদের মৃত্যুপীড়া না হইতে পারে।

"যে এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"

যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

ব্রহ্মজ্ঞানেই নিত্য সুখ—ব্রহ্মজ্ঞানেই শাশ্বতী শান্তি—তাঁহাকে জানিলেই হৃদয়গ্রন্থি ভগ্ন হয়—জন্মবন্ধন টুটিয়া যায়—কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া যায়—মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিয়া অমৃত লাভ করা যায়।

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি।"

উপনিষদে মুক্তির এই এক সোজা পথ দেখান হইয়াছে—বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে আর এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে সে বিষয়ে দু একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

যখন বুদ্ধ শাক্যসিংহ আমাদের দেশে প্রাদুর্ভূত হইলেন তাঁহার সম্মুখেও এই দুঃখ ক্লেশের প্রহেলিকা। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র, তাঁহার মাতা মায়াদেবী, ভার্য্যা যশোধরা ও পুত্র রাহুল। দুঃখ কষ্ট কি তা যাহাতে না জানিতে পারেন তাই তিনি রাজভবনে আমোদ প্রমোদ বিলাসিতার মধ্যে অতি যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের আর্ত্তনাদ কোথায় না শোনা যায়? এইরূপ প্রবাদ যে একদিন তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। লোকটা পলিতকেশ, দন্তহীন, অস্ফুটবাণী, অস্থিচর্ম্মসার, কম্পিত কলেবরে যষ্টিভরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যুবরাজ সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও লোকটা কে? উহার ত বড়ই শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি। এই অবস্থা কি উহার ব্যক্তিগত, নিজ পরিবারগত, অথবা সকল মনুষ্যেরই এই দশা ঘটে?

সারথী উত্তর করিল—না যুবরাজ! কেবল ইহারই নয়—মনুষ্য মাত্রেরই

এই দুর্দ্দশা। জরা আসিয়া যৌবনকে গ্রাস করে। আপনার পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন বন্ধু সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন—প্রাণী মাত্রেরই এই গতি।

এইরূপে আর একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে একটা শব লইয়া যাইতেছে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্বজনবর্গের বিলাপধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। সারথীকে জিজ্ঞাসা করাতে সারথী বলিলেন—"যুবরাজ, সকলেই মৃত্যুর অধীন; যৌবনের পর জরা, জরার পর মৃত্যু কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; প্রাণী মাত্রেরই এই গতি।" তখন হইতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদয় হইল। লোকে কিসে এই দুঃখ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পায় এই চিন্তা এই ধ্যানে তিনি অহর্নিশি নিমগ্ন হইলেন। এই মহান্ সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া এক রাত্রে যখন তাঁহার প্রিয়তমা যশোধরা শিশুটিকে কোলে লইয়া নিদ্রা যাইতেছে এমন সময় তিনি তাঁহার উপর ক্ষণতরে সকাতরে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদিগকে কিছুই না বলিয়া কহিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে মগধরাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, পরে বুদ্ধ গয়ায়, তদনন্তর বারানসীতে গিয়া ধ্যান ধারণা সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কালে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন—তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি তখন হইতে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন দমন করা এবং চরিত্র শোধন করিয়া দয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃপথের একমাত্র দ্বার। তিনি যে সত্য প্রচার করিলেন তাহার নাম "চতুর্মহাসত্য"—

প্রথম। সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়—জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরা মরণ দুঃখময়। যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ—ভালবাসার বিয়োগ দুঃখময়।

দ্বিতীয়। বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ।

তৃতীয়। এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখনিবৃত্তি।

চতুর্থ। দুঃখনিবৃত্তির অষ্টাঙ্গীন পুণ্য পথ আছে, সেই পথে চলিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়। সে পথ কি না।

১। সম্মা দৃষ্টি—সম্যক দৃষ্টি।

২। সম্মা সঙ্কল্প—সংকল্প ঠিক্ রাখা।

৩। সম্মা বাক্য—সত্য সরল প্রিয়বাক্য বলা।

৪। সম্মা কর্ম্মান্ত—সদাচরণ।

৫। সম্মা আজীব—সর্ব্বভূতে অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন।

৬। সম্মা ব্যায়াম—আত্মসংযম দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন।

৭। সম্মা সতি—(স্মৃতি) ধারণা ঠিক রাখা।

৮। সম্মা সমাধি—জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সকল ধ্যান মনন নিদিধ্যাসন।

এই অষ্টাঙ্গীন সাধু মার্গ অবলম্বন করিয়া চলিতে চলিতে পথে যে কয়েকটী সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে—কাম, দ্বেষ, হিংসা, বিচিকিৎসা—অবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বন্ধন তা ছেদন করিতে হইবে'। এই বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট সম্মা পথে চল, দেখিতে পাইবে যে ক্লেশের মূলোচ্ছেদ এবং ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি রূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ তাহার অব্যর্থ ফল। এই চতুর্মহাসত্য এবং অষ্ট মহামার্গ বৌদ্ধনীতি শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি।

বুদ্ধদেব যে একজন অসাধারণ ধর্ম্মবীর ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে—ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে—ব্রাহ্মণদিগের যাগযজ্ঞ ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে উদ্যতবজ্র হইয়া তাঁহার ব্যবহার ধর্ম্ম—অহিংসা, দয়া, সত্য, আত্মসংযম, সদাচার, শুদ্ধাচার—প্রচলিত সরল পালী ভাষায় আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচার করিলেন। তাঁহার সার উপদেশ হচ্ছে সাধনেই সিদ্ধি লাভ। যাগযজ্ঞে কোন ফল নাই—প্রার্থনা অনাবশ্যক। আপনার মুক্তিসাধন আপনারই হস্তে রহিয়াছে। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাই আনন্দ! আমার জীবনের অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছে—দিন ফুরাইয়া আসিল। আমি এক্ষণে চলিলাম। আমার আপনাতেই আপনার নির্ভর দেখ, আমি আত্মনির্ভরে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতেছি। তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তোমরাও আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শিখ। তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ, আপনারাই আপন নির্ভর-যষ্টি। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা ভিন্ন পরের উপর নির্ভর করিও না। এইরূপ আত্মবলে ঠিক পথে চলিলে তোমরা অক্ষয় শান্তি ও নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিবে।"

বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন "নিজ কর্ম্মফল কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না—যেমন রোপণ করিবে—তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। জীবের জন্মই ক্লেশের আকর, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা ক্লেশেরই নামান্তর। বিষয়তৃষ্ণাই সকল ক্লেশের মূল—সেই মূল উৎপাটন কর ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবে। সে নির্ব্বাণ মুক্তি যে কি সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে এ অবস্থায় "রাগ দ্বেষ স্নেহ মমতা সকলই নষ্ট হয়; মনের সকল ভাবই তিরোহিত হইয়া যায়; মনে কোন রূপ ভাবজ্ঞানও থাকে না, সমস্ত ভাবের অভাব-জ্ঞানও থাকে না।" বৌদ্ধ মতের সার মর্ম্ম তবে এই দাঁড়াইতেছে—জন্ম কেবলই দুঃখময় অতএব না জন্মানই ভাল। আর জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে পরিত্রাণ যে মোক্ষ লাভ তাহার নাম নির্ব্বাণ—আত্মার এক প্রকার অস্তিত্বলোপ।

বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনের ধর্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোন বিধিব্যবস্থা নাই। আত্মসংযম, আত্মশিক্ষা, আত্মপ্রভাবে বিষয়তৃষ্ণা পরিহার করিয়া ইহলোকেই হৌক্ পরলোকেই হৌক্, পরমার্থ সাধনের যদি কোন সদুপায় থাকে তবে বুদ্ধদেব তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিতে হইবে। কিন্তু দেখুন আমাদের এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র আত্মার আত্ম-প্রভাবের কতটুকু বল—কতটুকু শক্তি! তাহা কার্য্যকর হইবার জন্য দৈবপ্রসাদ প্রয়োজনীয়, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রসাদবারির অভাবে আত্মপ্রভাবের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা শুধু ভৌতিক জগতেই চলাফেরা করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারি না। আধ্যাত্মিক জগতেও আমাদের গতিবিধি; সেখানে আমাদের দিব্য জ্ঞান, শুদ্ধ প্রীতি, উচ্চতর ক্ষেমঙ্কর আশা ভরসা, এই সমস্ত উপকরণ ভিন্ন আমাদের আত্মার জীবন রক্ষা পায় না। এই স্বর্গীয় অন্নাভাবে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম রূপান্তরিত, অবনত ও কালক্রমে স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রবন্ধ বিশেষে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণাম এমন উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না ঃ—

"সাধন দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করিলাম কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃত-রস পান করিলাম না তবে সে সাধনের ফল কি? চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্য? পথ পরিষ্কার করিবার বিধেয়তা এবং পথ পরিষ্কার করিবার প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শন করিয়াই বুদ্ধদেব ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন কিন্তু পথিক ব্যক্তিরা পথ পরিষ্কার করিয়া শুধু কেবল সেই পথে হাঁটাহাঁটি করিয়াই জীবন অবসান করিতে পারে না। তাহারা গম্যস্থানে না হোক্, অন্ততঃ মাঝখানের কোন একটা পান্থশালায় পান ভোজন করিয়া মৃগতৃষ্ণার প্রশমন করিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধেরা তাই আর কিছু হাতের কাছে না পাইয়া বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াই তাঁহাকেই আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে আমাদের দেশে দেখাদেখি মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইল। দাবানল যেমন অরণ্যকে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণের প্রতি, বেদের প্রতি, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি, বৈদিক দেবতাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাহার পরে সেই দাবানলের ভস্মরাশি হইতে নানাদিক্ দিয়া নানা উপপুরাণকর্ত্তারা রক্তবীজের ন্যায় বাহির হইতে লাগিলেন। ইহারাই বেদোপনিষদ হইতে ব্রহ্মশব্দ লইয়া তাহাতে আকার যোগ করিয়া ব্রহ্মকে সাকার করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বৈদিক বিষ্ণুকে লইয়া শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ গড়িয়া তুলিলেন। বৈদিক রুদ্রকে ত্রিশূলপাণী মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর রূপে সাজাইয়া লইলেন। মনুষ্যের যে আত্ম-প্রত্যয়-মূলক ঈশ্বর-দত্ত সহজ জ্ঞান তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইল আর সেই সঙ্গে মনুষ্যের হস্তবিরচিত এবং মনঃকল্পিত দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির বেগাতিশয্য হইল।" এই কথাগুলির সারাংশ এই, যে এই সকল পুরাণ উপপুরাণকর্ত্তারা বিকৃতিভাবাপন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিযোগিতায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা প্রচার করিলেন এবং একটী লোকরঞ্জন ধর্ম্মপ্রণালী প্রচার উদ্দেশে বেদপূজিত প্রাচীন দেবগণকে তদীয় উচ্চপদ হইতে অবনত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অবেদ-পরিচিত আপনাদের অভিমত অভিনব দেব দেবী সকল সংস্থাপন করিয়া মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন।

এই ত বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম। আর একদিকে দেখুন উপনিষদের যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা বেদান্তভাষ্যকারদের হাতে পড়িয়া কতদূর পরিবর্ত্তিত ও কিরূপ বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইল! উপনিষদের নাম বেদান্ত কিন্তু তাই বলিয়া উপনিষদ বেদান্তদর্শন নহে। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে যেমন এক একটী নির্দ্দিষ্ট মত অবলম্বিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে উপনিষদে সেরূপ হয় নাই। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে উপনিষদ কোন একজন ঋষির প্রণীত নহে—যখন যাঁহার মনে সত্যের ছায়া যেরূপে পতিত হইয়াছে কবির ভাষায় কবির ন্যায় সরস সরল ভাবে তিনি তাহা

ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই কবিত্বের উচ্ছ্বাস আমাদের উপনিষদে দেখিতে পাই। কোন একটী বিশেষ মত যুক্তি-শৃঙ্খল দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা উপনিষদকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। জগৎ বিষয়ে, সৃষ্টি বিষয়ে, জীবাত্মা বিষয়ে, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপনিষদে নানা মত, অনেক রকম কথা আছে। কোন স্থলে বা জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব, আবার কোন স্থলে বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে জীবব্রহ্মে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অভেদ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তেমনি আবার অন্যান্য শ্রুতিতে তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইবে। যখন উপনিষদের ঋষিরা বলিতেছেন

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং"

তখন এই সকল কথা সেই দেবদেব পতির পতি পরমেশ্বরেতেই প্রযুক্ত হইতেছে—জীবাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না—এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? তাঁহারা আরো বলিতেছেন

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি।"

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একজন সুখেতে ফল ভক্ষণ করেন—অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। ইহাতে যদি দ্বৈতভাব না থাকে তবে দ্বৈত ভাব কাহাকে বলে জানি না। সখা অর্থেই দুই বিভিন্ন পুরুষ বুঝায়, এক জন ফলভোক্তা অন্য জন ফলদাতা সাক্ষী পুরুষ। উত্তর কালে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা উপনিষদের বিভিন্ন বাক্যের একত্বপ্রতিপাদক অদ্বৈতবাদ ও তাহার নিকৃষ্ট আকার মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত স্বর্গীয় জ্যোতি প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অদ্বৈতবাদ কি না জীবব্রহ্মে অভেদ ভাব;—জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়।—আমরা কেবল অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীবাত্মার পৃথক্ সত্তা অনুভব করি। তবে জগৎ কি? জগতের সৃষ্টিই বা কিরূপে হইল? পূর্ণ হইতে অপূর্ণ, অনন্ত হইতে অন্তবৎ, অপরিবর্ত্তনীয় হইতে এই পরিবর্ত্তনশীল প্রপঞ্চ কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাহার উত্তরে মায়াবাদ বলেন, ঈশ্বরই সত্য তদ্ভিন্ন আর সকলই অলীক, সকলই অবাস্তবিক। জগতে আমরা যা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি, বিষয়সংশ্রবে যে সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছি সকলই স্বপ্ন, সকলই মায়া; তবে যে জগৎকে আমাদের বাস্তবিক সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় সে আমাদের অন্ধতা। অজ্ঞতা অবিদ্যার ফল। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে মুক্তার ভ্রম হয় ইহা সেইরূপ। বেদান্ত দর্শনের সার মর্ম্ম দুই ছত্রে বুঝাইতে গিয়া একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত নিম্নলিখিত প্রকারে বলিয়াছেন

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরং,"

কোটি গ্রন্থে যাহা কথিত হইযাছে আমি শ্লোকার্দ্ধে তাহাই বলিতেছি।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই বেদান্ত-তত্ত্ব যদিও এদেশে সর্ব্বত্র সমাদৃত তথাপি বিজ্ঞান-কষ্টিতে পরখ

করিয়া দেখিলে ইহার অসারতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। আমাদের সহজ জ্ঞানে যে সকল সত্য প্রতিভাত হয়—ইন্দ্রিয়-গোচর বল, পরীক্ষামূলক বল অথবা আমাদের বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত সত্যই বল—সকল সত্যের মূলেই তিনটী সত্তা বিদ্যমান দেখা যায়। তাহা না মানিয়া আমরা থাকিতে পারি না—কোন যুক্তি বা তর্কবলে সে সত্তাত্রয়ের অস্তিত্ব খণ্ডন করা সাধ্য নহে। প্রথম হচ্ছে আত্মা অর্থাৎ "আমি"—দ্বিতীয় অনাত্ম জগৎ—তৃতীয়, আমি এবং জগতের অতীত অথচ সর্ব্ব মূলাধার, সকল কারণের আদিকারণ পরমেশ্বর। আমি আছি কেননা আমি ভাবিতেছি চিন্তা করিতেছি। যেমন ভুবনবিখ্যাত ফরাসী তত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত দেকার্ত্ত বলিয়া গিয়াছেন

Cogito ergo sum I think therefore I exist.

দ্বিতীয়তঃ বহির্জ্জগৎ আছে তাহাও আমাদের অস্বীকার করিবার যো নাই কেননা বাহিরের বিষয়ের প্রতিঘাতে আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতেছি। আমি যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করিতেছি, আলোক বায়ু অন্ন প্রভৃতি বাহ্য বস্তু সকল তাহাদের উদ্দীপক। এই সঞ্জাত হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান। বাধা পাইয়া জিনিসের গুরুত্ব অনুভব করিতেছি। কাম্য বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছি। যুক্তি দ্বারা এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ কর কিন্তু সহস্র যুক্তিতেও আমাদের আত্মপ্রত্যয় পরাভূত হয় না। তাহার প্রমাণ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে। দু একটী সহজ দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবেন। যেখানে কামানের গোলাবর্ষণ হইতেছে তাহার সামনে দাঁড়াইতে ভয় হয় কেন? রোগ হইয়াছে, রোগ শান্তির জন্য ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন কি, মনে করিলেই হইল ত রোগ মিথ্যা। প্রিয় জনের কষ্ট দেখিয়া কেন আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না? কেন না জগৎকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এটি এমন সহজ কথা যে বৈদান্তিকেরাও তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন না কেন না যেমনই বৈদান্তিক হউন না কেন তাঁহারা কেহই হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত পূজার্চ্চনা ক্রিয়াকর্ম্ম—অথবা লোকাচার অসত্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। এই হেতু তাঁহাদের অভিধানে 'ব্যবহারিক সত্য' বলিয়া একটি বাক্য আছে, জগতের অস্তিত্বব্যঞ্জক এই বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াই তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, জগৎ বাস্তবিক সত্য নহে—কিন্তু ব্যবহারিক সত্য। এতটুকু সত্য যে তাহাতে আমাদের লৌকিক আচার রক্ষা পায়—এতটা মিথ্যা নয় যে তাহাতে আমাদের কোন কার্য্যহানি হয়। কিন্তু আমরা খাঁটি সত্য চাই, আসল জিনিসের অভাবে ছায়া অবলম্বন করিয়া চলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই ত গেল আত্মা আর অনাত্ম জগৎ; তাহার পর তৃতীয় সত্তা। যেমন জানিতেছি যে আমি আছি—তেমনি জানিতেছি যে আমি এক সময়ে ছিলাম না—আমি অপূর্ণ সীমাবিশিষ্ট জীব—আমার জ্ঞান, প্রেম, উদ্যমের সীমা আছে—এই অপূর্ণতার মধ্য দিয়া আমরা সেই পূর্ণ ব্রহ্মে গিয়া উত্তীর্ণ হই—সসীম হইতে অসীম—অপূর্ণ হইতে পূর্ণ—কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল হইতে আদি কারণে না গিয়া আমাদের বিজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। অতএব এই ঈশ্বরের সত্তা ও বিজ্ঞানের প্রকৃতিমূলক সত্য। যদি আমরা এই তিন সত্তার একটীকে অবমাননা

করি অথবা একটীকে আর একটীর সহিত মিশাইয়া ফেলি তাহা হইলেই আমরা মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। তাহার সাক্ষ্য এই তিনটী সত্তাকে একমাত্র জড় জগতে পরিণত করিয়া জড়বাদী নিরীশ্বরবাদী চার্ব্বাক শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহার মতে ভৌতিক জগৎই সর্ব্বস্ব স্বয়ম্ভু অনাদি; স্বয়ঞ্জাত পরমাণু সমষ্টি হইতেই জড় ও চৈতন্যের উৎপত্তি। শরীর আত্মাতে কোন প্রভেদ নাই—দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বিনাশ। ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন আর জ্ঞান নাই। ধর্ম্মের কেহ সহায় নাই, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের শাস্তাও নাই—কর্ত্তব্য নামমাত্র, পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ঘটনাপ্রসূত। মনুষ্যজীবনের কোন অর্থ নাই—তাৎপর্য্য নাই; কেবল যাওয়া আসা চিত্রের খেলা। এই ধর্ম্মোচ্ছেদকর নিরীশ্বর চার্ব্বাকশাস্ত্রের নাম জড়বাদ দেওয়া যাইতে পারে—ইংরাজীতে materialism। ইহার বিপরীত শাস্ত্রে সকল বস্তু "আমি" অর্থাৎ আমার মনের ভাবেই পর্য্যবসিত হয়! জগৎ বাস্তবিক সত্য নহে আমি যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি—সমস্ত বহির্বিষয় তোমার আমার মনের ভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র, এই হইতেছে মায়াবাদের প্রকারান্তর, ইংরাজিতে যাহার নাম Idealism। আবার যে মত জড় ও জীবের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিয়া ঈশ্বরের সহিত বিলীন করিয়া ফেলে তাহাকে ইংরাজিতে বলে Pantheism তাহা অদ্বৈতবাদের নামান্তর। এ মতটীও যে ভ্রমাত্মক তাহা দেখাইবার জন্য বহু বাক্যব্যয়ের আবশ্যক করে না। আমরা সকলেই জানিতেছি আমি অপূর্ণ জীব—জ্ঞান শক্তিতে অপূর্ণ, রোগ শোকে মুহ্যমান, পাপ তাপে তাপিত—জরা মৃত্যুর অধীন। জীবাত্মা আপনার অপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করেন কিন্তু সোঽহং বলিয়া এই অপূর্ণ আত্মাকে সর্ব্বমঙ্গলালয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়া বলা—এ কি অসঙ্গত কথা! ইহাতে আমাদের জ্ঞান কিছুতেই সায় দেয় না। প্রেমও পরিতৃপ্ত হয় না, কেন না জীবাত্মার পৃথক সত্তা বিলুপ্ত হওয়াতে ভক্তি ভালবাসার কোন বিষয় থাকে না। কর্ম্মোদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, কেন না যদি এই জীবন অবাস্তবিক মায়াময় হয় তবে আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কি রহিল? আত্মোন্নতি সাধনে অথবা পরহিতানুষ্ঠানে যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব কোথায়, দায়িত্বই বা কাহার নিকটে? এই প্রীতিবিহীন নীতিবিহীন জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আত্মা কি কখন শান্তি ও আশ্রয়স্থান লাভ করিতে পারে? কখনই না।

এই অদ্বৈতবাদের প্রতিকূলে মহা মহা বৈষ্ণবাচার্য্য উত্থিত হইয়া স্ব স্ব দ্বৈতমত সমর্থনে ও ভক্তিমার্গ প্রদর্শনে যত্নশীল হইলেন। বেদান্তদর্শন বোধ হয় যেন কেবল প্রখরবুদ্ধি পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি খেলাইবার জিনিস—জনসাধারণের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাহাতে এমন কিছুই নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম ও ভক্তি মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ের জিনিস, তাই সহজেই ঐ ধর্ম্ম আপামর সাধারণ লোক মধ্যে প্রচারিত হইল। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, ইদানীন্তন কালে তাহার কোন সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে যে সমস্ত বৈষ্ণব

সম্প্রদায় প্রবল তন্মধ্যে রামানুজ সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রধান। রামানুজাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ খণ্ডে তাঁহার মত সমধিক প্রচলিত। ঐ খণ্ডে বৈষ্ণবাদি অন্যান্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত রীতমত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে শৈব ধর্ম্মের বিশেষ রূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। রামানুজাচার্য্য শৈব ধর্ম্ম নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তদবধি অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। উত্তর খণ্ডে রামানুজ অপেক্ষা রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের নাম অধিক প্রসিদ্ধ। রামানন্দের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কবীর সর্ব্বাগ্রগণ্য বৈষ্ণব-গুরু। তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে উদারচেতা পরম ভক্ত সাধু পুরুষ ছিলেন। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা ও ক্রিয়াকর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার জ্বলন্ত বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতেন। জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি "ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন—উভয় জাতিই তাঁহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিত। তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের দেবতা যিনি, তিনিই মুসলমানদের দেবতা—তাঁহাকে আলিই বল আর রামই বল, নামভেদে কি যায় আইসে? সেই একই ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন—তাঁহাকে হৃদয়ে অন্বেষণ কর সহজে দেখিতে পাইবে। "যদি বিশ্বকর্ত্তা কেবল মন্দিরের মধ্যে অবস্থিতি করেন তবে বিশ্বসংসার কাহার নিকেতন? পূর্ব্বদিকে হরির পুরী—পশ্চিমে আলীর পুরী কিন্তু আপনার হৃদয়-পুরী অনুসন্ধান করিয়া দেখ, রাম ও রহীম উভয়েই তথায় বিদ্যমান আছেন।"

কবীররচিত সঙ্গীতগুলি সুরস ও হৃদয়গ্রাহী—ধর্ম্মনীতি ও ভক্তিরসে পূর্ণ। সেই সূত্রে তিনি বারম্বার এই উপদেশ দিতেন—কণ্ঠেতে তুলসী ও হাতে জপমালা ধারণ, গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা—এ সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরের কোন ফল নাই—চিত্তশুদ্ধিই আসল কথা।

মন্‌কা ফেরৎ জনম গয়ো
গয়ো ন মন্‌কা ফের
করকা মন্‌কা ছোড়
মন্‌কা মন্‌কা ফের
গঙ্গা ফিরা হরদ্বার কা গদ্ধড়ি
লিয়া তো ক্যা হুয়া
কাবা গয়া হাজি হুয়া
মনকা কপট মিটা নহি
মন্‌কা কপট টুটা নহি
কাবা গয়া তো ক্যা হুয়া
হাজি হুয়া তো ক্যা হুয়া
জিন্ ইক্‌মে শির না দিয়া।

ভগবৎপ্রেমে যিনি শির না দিয়াছেন তাঁহার এ সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠানে কি ফল?

তিনি আবার এই উপদেশ দিতেন,

ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন তবে তোমরা তাঁহাকে এখানে ওখানে খুঁজিয়া বেড়াও কেন? বিশ্বাসেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

পানীমে মীন পিয়াসীরে
মোক সুনত সুনত লাগে হাসিরে।

জলের মধ্যে থাকিয়া মাছ তৃষ্ণায় মরে একি হাস্যকর ব্যাপার।

পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে খোঁজত ফেরত উদাসীরে।

পূর্ণ ব্রহ্ম সকল স্থানেই আছেন তাঁকে উদাসীর মত কেন খুঁজিয়া বেড়াও?

ঈশ্বর প্রতিজনের আত্মাতে বলিতেছেন

'খোকা তুঁ ঢুঁঢে বন্দে মৈ তো তেরে পাসমে
না মৈঃকোই ক্রিয়া কর্ম্ম মে না জোগ সন্ন্যাস মে
না রহতা মৈ শ্রী দ্বারকা না রহতা জগন্নাথমে
না রহতা মৈ জঙ্গল সহরে মৈ রহতা বিশ্বাস মে
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
সব শ্বাসো কে শ্বাস মে
জো খোঁজে তে তুরত মিলূঁ মৈ
ছন ভরকে তলাস মে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কবীর হিন্দু মুসলমান উভয়কেই আপনার দলে টানিবার চেষ্টা করিতেন—উভয় জাতির লোকেই তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিত। জনশ্রুতি আছে যে মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ সৎকার বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে উৎকট বিবাদ বাধিয়াছিল। হিন্দুদিগের ইচ্ছা তাঁহার শবদাহ করে; মুসলমানদের ইচ্ছা তাঁহার শব সমাধিস্থ করে। এইরূপ ঘোরতর বিবাদ হইতেছিল এমন সময়ে কবীর স্বয়ং বিবাদক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া "আমার মৃতদেহের আবরণ-বস্ত্র খুলিয়া দেখ" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন বস্ত্রতলে শব নাই কেবল পুষ্পরাশি পতিত রহিয়াছে; কাশীর রাজা বীরসিংহ তদর্দ্ধ নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিয়া দাহ করিলেন এবং এইক্ষণে যে স্থানকে কবীর চৌর বলে তথায় ঐ দগ্ধ পুষ্পের ভস্মগুলি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমান সর্দ্দার বিজিলিখাঁ পাঠান অপরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া গোরখপুরের নিকটে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি এক সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। উল্লিখিত কবীর চৌর ও শেষোক্ত সমাধিক্ষেত্র উভয়ই কবীর-পন্থীদিগের তীর্থস্থান।

কিয়ৎকাল পরে আর এক বৈষ্ণবনেতা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার কীর্ত্তি এদেশে সর্ব্বত্রই প্রসারিত। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব আপনারা সকলেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন। প্রেম ও ভক্তি এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ব সম্পত্তি। প্রেম দান কর, ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি করিও না। প্রীতি ও ভক্তি সহকারে যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর তাহা হইলেই ভগবানের দর্শন লাভ করিবে। বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ যে শ্রীমৎ ভাগবৎ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন

যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

কর্ম্ম তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্য, যোগ দান ও অন্যান্য শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগে অনায়াসেই সে সমুদয় অনুষ্ঠানের ফল লাভ করেন।

ভগবদ্গীতায় যেরূপ ভক্তিযোগের বর্ণনা আছে সেইরূপ অচলা ভক্তি চৈতন্যধর্ম্মে প্রতিফলিত দেখা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ।"

তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ কর—আমার সেবক হও, আমার পূজা ও নমস্কার কর, এইরূপে তুমি মৎপরায়ণ হইয়া এবং আমার সহিত যোগযুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং।"

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করত অনন্যভক্তিযোগে আমার উপাসনা করেন আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ভক্তকে আমি অচিরাৎ এই মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।'

প্রেম-সাধন ভগবৎপ্রসাদ লাভের প্রকৃষ্ট সাধন, তাহাই দেখাইবার জন্য চৈতন্য দেবের আগমন। তিনি নিজে যে প্রেমামৃত-সাগরে ডুবিয়া ছিলেন আর সকলকে সেই অমৃতময় প্রেমাস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়া ছিল—

তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দ্বারে-দ্বারে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সকল জাতীয় লোকেই এই প্রেম ও ভক্তি সাধনে সমর্থ অতএব কি ইতর, কি ভদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতি সকলকেই তিনি সমানভাবে তাঁহার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতে উৎসুক ছিলেন। তাঁহার কাছে জাতিবিচার ছিল না—ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্য্য ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ মনুষ্য জাতির ঈশ্বরপ্রেমে সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া চৈতন্যদেব এই দেশে তাঁহার ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। তিনি তাঁহার উদার প্রেমিক ধর্ম্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা আপনাদের কাহারও অবিদিত নাই।

কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মও অবসাদ প্রাপ্ত হইল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমেরই সাধনে রত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রেমের অতীব উচ্চ মর্য্যাদা তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই কিন্তু প্রেমকে নিয়মে রাখিতে পারে এরূপ একজন পাকা অভিভাবক তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, সে অভিভাবক হইতেছে জ্ঞান। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে জ্ঞানের অভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম উন্মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আক্রান্ত হইয়াছে। মূর্ত্তিপূজা, গুরুপূজা, নারীপূজা, অবতারবাদ, মৌখিক মন্ত্রজপ, নামকীর্ত্তন, তান্ত্রিক অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্য সংস্কার এ ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে।

বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বেদ বেদান্ত দর্শনশাস্ত্র বৌদ্ধধর্ম্ম পুরাণ তন্ত্রের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কি দেখা যায়?

এই যে ক্রিয়াকর্ম্ম যদি প্রীতি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিয়োজিত হইয়া কতকগুলি ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সে অর্থহীন বাহ্যাড়ম্বর মাত্র হইয়া পড়ে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না।

আর এই যে ঈশ্বরপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইলে আত্মপ্রভাবের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। কেবলমাত্র আত্মবলে আমরা নীতিমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিলে আমাদের পদে পদে পদস্খলন হয়, আমরা গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারি না। দিব্য জ্ঞান, ঈশ্বরপ্রীতি, অমৃতত্বের আশা ভরসা এই সমস্ত উপকরণ ভিন্ন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা পায় না। সূর্য্য বিলুপ্ত হইলে মশাল ধরিয়া পৃথিবীকে আলোকিতা ফলবতী ও শস্যশালিনী করিবার চেষ্টা করা যাহা, ঈশ্বরের সহায়তা ভিন্ন আত্মবলে ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়ী হইবার চেষ্টাও তাহা।

আরও দেখা যায় যে অদ্বৈতবাদের উপর কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে, কেননা উপাস্য-উপাসক-ভাব সকল ধর্ম্মেরই প্রাণ, ভগবান আর ভগবদ্ভক্ত, ভৌতিক ও ধর্ম্মরাজ্যের রাজা ও নিয়ন্তা এক, আর এক সেই নিয়মের অধীন প্রজা; একজন ফলদাতা অন্য জন ফলভোক্তা; এক দিকে সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ, অন্যদিকে শরণাগত ভক্ত—আজ্ঞাধীন ভৃত্য—প্রীতির প্রতিদানক্ষম, জীবাত্মা।—ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে এইরূপ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই সকল ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক। জীবাত্মা পরমাত্মার পৃথক সত্তা না থাকিলে এ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় না—এবং এই পার্থক্য দূর হইয়া জীব যতই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে, সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি, তাহার সদ্গতি। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে মায়াবাদ মতটীও ভ্রান্তিসঙ্কুল তাহা দেখা গিয়াছে, কেননা জীবনের পরীক্ষাতে তাহা টিঁকিতে পারে না। সংসার অবাস্তবিক মায়াময় নহে—সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রীতিকর জানিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

পুনশ্চ কেবল মাত্র বিজ্ঞানবলে আমাদের লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে পারা যায় না। জ্ঞানের সহিত প্রেম, ভক্তি ও শুদ্ধাচার সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। প্রীতিবিহীন নীতিবিহীন যে জ্ঞান তাহা একদেশ-দর্শী অকর্ম্মণ্য ও আমাদের তাহাতে আত্মার পোষণ ও সদ্গতি হয় না। তাই উপনিষদে কথিত হইয়াছে—

নাবিরতোদুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসোবাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"

শান্ত সমাহিত সচ্চরিত্র না হইলে কেবল বিজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না।

সেইরূপ আমার জ্ঞানহীন যে ভক্তি সে অন্ধ ভক্তি, জ্ঞানহীন প্রেম উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, তাহাও আমাদের আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ। বিজ্ঞান-সারথী সঙ্গে না থাকিলে প্রেম অনেক সময় আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়। ভক্তি অনেক সময় অপাত্রে নিয়োজিত হইয়া মনুষ্যকে অপদার্থ করিয়া ফেলে।

জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মোদ্যম মনুষ্যের আত্মা এই তিনটী অবয়বে সুসম্পন্ন হওয়া চাই। তাহার একটীরও অভাব বা বিপর্য্যয় ঘটিলে আত্মার ভরপুর তৃপ্তি, পুষ্টি ও উন্নতি সাধন সম্ভব নহে।

মনুষ্যের আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম এবং কর্ম্ম এই তিনের সামঞ্জস্য সাধন উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন। উপনিষদের জ্ঞান ও একাগ্রতা—চৈতন্য ধর্ম্মের প্রেম ও ভক্তি—বৌদ্ধ ধর্ম্মের শম দম আত্মসংযম সদাচার—এই ত্রিবেণী সঙ্গমই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে আমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মের নামোল্লেখ করিতেছি তাহা মনে করিবেন না—আমি সেই ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছি যাহা সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি, যাহার উপদেশ-সূত্রে পৃথিবীর আর আর সকল ধর্ম্মের ঐক্য বন্ধনের সম্ভব বিবেচনা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই—কোন্ ধর্ম্মে এই বিশ্বাসে যোগ দিতে না পারে?—যে ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন এবং তাঁহার নিয়মিত ধর্ম্ম পালন এই উভয়ের যোগে আত্মার মুক্তিলাভ।

জড়রাজ্য মনোরাজ্য-সমন্বিত অখিল বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানালোকেই আমরা তাহা পাঠ করি। কিন্তু প্রকৃতির মুখচ্ছবিতে ঈশ্বরের আভাস যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় মনুষ্যের আত্মাতে তাঁর প্রকাশ আমরা আরও জাজ্বল্যতর উপলব্ধি করি। ঈশ্বরপ্রেমী পুণ্যাত্মার হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব যেমন স্পষ্ট, "তেমন আর কোথাও নাই, আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই, সমুদ্রে নাই।" সেই সকল ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ সময়ে সময়ে উদিত হইয়া যখন ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করেন, ঈশ্বরের প্রেমামৃত-রস স্বীয় হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে লোক সকলকে বিতরণ করেন তখন তাঁহাদের সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সেই প্রেমপূর্ণ জ্বলন্ত বাক্য যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে সঞ্চিত হয় সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পরমার্থতত্ত্বের মহামূল্য রত্নখনি। যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আমরা সত্যরূপ স্বর্গীয় অন্ন আহরণ করিতে পারি তাহাই আমাদের আদরণীয়।

আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজ জ্ঞান যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে নিহিত আছে। হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই ঈশ্বর সে জ্ঞান প্রেরণ করেন। ভগবদ্ভক্ত সদ্‌গুরুর সাহায্যই সেই জ্ঞান লাভের মুখ্য উপায়, তাই আমরা সেই সাহায্য

গ্রহণে সতত তৎপর। কিন্তু তাহা বলিয়া গুরুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া আমরা গুরুপূজার পক্ষপাতী নহি। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সার উপদেশ। এ দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। ঈশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য আমাদের কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই। যে সকল ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ মধ্যে মধ্যে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মোহান্ধ মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের পুণ্যপথ দেখাইয়া দেন, তাঁহারা পথপ্রদর্শক মাত্র। আমরা তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া সম্মান করি, শ্রদ্ধা ভক্তি করি—কিন্তু ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত নহি। গুরু আমাদিগকে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন কিন্তু সেই পথে চলিবার জন্য আমাদের নিজের যত্ন, চেষ্টা ও একনিষ্ঠতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরপ্রসাদের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

আমাদের যোগ পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ। জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হওয়াই সেই অধ্যাত্মযোগ। প্রীতি ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বহমান হইবে। ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছার অধীন হইবে। আমরা সহস্র দুঃখ কষ্ট পাই, শোকে আকুল রোগে কাতর হই তবুও হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে বলিব "প্রভু তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ।"

আমাদের যাগযজ্ঞ ঈশ্বরে প্রীতি ও লোকহিত উদ্দেশে জীবনের কর্ত্তব্য পালন। যে কোন অবস্থায় থাকি, যে কোন ঘটনা স্রোতে পড়ি, আপন আপন কর্ত্তব্য নির্ভীক চিত্তে সাধন করিয়া "দানধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত সুখ সম্পত্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে ভোগ করা; আর সেই সঙ্গে জনসমাজের দুঃখক্লেশ এবং পাপতাপ প্রশমন করিবার জন্য সকলে মিলিয়া তাহার সুনির্ব্বাহ পক্ষে সহায়তা করা।" এক কথায় বলিতে গেলে ঈশ্বরপ্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এই হইতেছে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতারণা করিতে গিয়া এস্থলে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নামোল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। যে মহাপুরুষ তাঁহার সময়কার সর্ব্ব প্রকারে অগ্রবর্ত্তী ছিলেন—যিনি প্রচলিত সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক অশেষ প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত তেজস্বী ধর্ম্মবীর রূপে অভ্যুদিত হইয়া সমাজ-সংস্কারে ও সত্যধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্বলন্ত জীবনী হৃদয়ে জাগ্রত দেখা কি প্রত্যেক বঙ্গ সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে?

যে সময়ে এদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, যখন লোকের মন ঘোরতর অজ্ঞান-অন্ধকার ও কুসংস্কার-কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল—পৌত্তলিকতা প্রবল, ব্রহ্মবিদ্যা মৃতপ্রায়; সেই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া সৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই তিনি প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের অসারতা অনুভব করিয়া সত্যের জন্য গৃহত্যাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিলেন, লোকসমাজ হইতে অশেষ প্রকার তিরস্কার অত্যাচার সহ্য করিলেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ—সংস্কৃত পালী আরব্য হিব্রু প্রভৃতি যে যে ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে তাহা আয়ত্ত করিয়া সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন এবং অবশেষে অশেষ শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে রত্ন আহরণ করিলেন তাঁহার উত্তরাধিকারী যে আমরা এইক্ষণে সেই অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন সত্য কোন জাতিবিশেষে অথবা গ্রন্থবিশেষে বদ্ধ নহে। সত্য মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি! বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ অবস্তা ঈশ্বরের সত্য সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং যেখানে থাকুক না কেন তিনি তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে স্থান দিতেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল অথচ আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যাতেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ নিবদ্ধ ছিল। এই প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় বিদ্যার সারভূত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা তাঁহার অমূল্য দানস্বরূপ তাঁহার হস্ত হইতে আমরা পাইয়াছি—সে ধন যেন আমরা হেলায় হারাইয়া না ফেলি। তিনি যে বীজ স্বহস্তে বপন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অঙ্কুরিত ও শাখাপল্লবিত হইয়া সারবান্ ফলবান্ বৃক্ষরূপে সমুত্থিত হইয়াছে, আমরা ইচ্ছা করিলে সেই বৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করিয়া শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতে পারি। যাহাতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান একেশ্বরবাদী মাত্রেই সেই একেরই পূজায় সম্মিলিত হয় সেই উদ্দেশে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, অপৌত্তলিক বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ও সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

হে ভ্রাতৃগণ! তোমরাও রামমোহন রায়ের সাধুদৃষ্টান্তে ধর্ম্মযুদ্ধে বদ্ধপরিকর হও। আমাদের দেশে নানাবিধ সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার আছে তাহার উচ্ছেদ সাধন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতিভ্রমে আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত ও কলুষিত তাহার উপর সত্যের আলোক বিকীর্ণ করা আবশ্যক। পুরাকালে ভারতবর্ষে যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ঋষিবাক্যানলে প্রদীপ্ত হইয়াছিল কালক্রমে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের আধ্যাত্মিক অধোগতি যত দূর হইবার তাহা হইয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম মালাজপা, মন্ত্রপাঠ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানেই পরিণত হইয়াছে, আর আসল যাহা ধর্ম্ম আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, কুপ্রবৃত্তিদমন, সত্যপালন, লোকোপকার ব্রতধারণ—ওদিকে আমাদের মন নাই। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঈশ্বর যে সকল আদেশ প্রেরণ করিতেছেন তাহার প্রতি আমরা বধির; আর কতকগুলি মৃতকল্প শাস্ত্রবচন আমরা শিরোধার্য্য করিয়া মানি। এস্থলে কোন শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা আমার অভিপ্রেত নহে—আমি কেবল বলিতে চাই, শাস্ত্র অপেক্ষা সত্য গরীয়ান্—শাস্ত্রের বচন অপেক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধির মন্ত্রণা বলবত্তর। শাস্ত্র যেখানে সত্যের অনুকূল সেখানে তাহা গ্রাহ্য—শাস্ত্রীয় বচন যখন ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী তখন তাহা ত্যজ্য। ফলে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধির মন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরবাক্যের উপর অনেক সময় নির্ভর করিয়া চলি। সত্যের প্রতি আত্মাকে উন্নত না করিয়া সত্যকে আপনার মনের মতন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি। এই নিয়ম অনুসারে আমরা নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা হইতে নিরস্ত হইয়া, অসীমকে সীমাবদ্ধ করিয়া, মূর্ত্তিপূজায় প্রণত হইয়াছি, সত্যস্বরূপকে অসত্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছি—স্বর্গকে পৃথিবীর ধূলির মধ্যে নামাইয়া আনিয়া দূষিত ও কলঙ্কিত করিয়াছি। আমাদের সমাজকে এই সকল দুর্গতির পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। এই হেতু আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" ওঠ! জাগো! সদ্‌গুরুর নিকটে গিয়া শিক্ষা লাভ কর। তোমরা বিদ্যা উপার্জন করিতেছ, তোমাদের নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভ হইয়াছে—বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছে—উত্তম কথা। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে জ্ঞানশিক্ষা অপেক্ষা পবিত্র চরিত্রের উপর তোমাদের ভাবী কল্যাণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। শুধু তোমাদের নিজের নয় কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের সাধু ব্যবহার শুদ্ধাচার সাধারণ জনসমাজের মঙ্গলপ্রসূ—এই ভাবিয়া তোমরা আত্মোৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হও। সত্যপরায়ণ হও; সত্যের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। মুখে এক কাজে আর, বিশ্বাস একরূপ অনুষ্ঠান অন্যরূপ, ছদ্মবেশীর ন্যায় এইরূপ কপট ব্যবহার পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মের আদেশে আপাতরম্য বিষয়সুখ বিসর্জন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। তোমাদের মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা,

উপধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক্—জাতিবিদ্বেষ, বর্ণাভিমান, কলহ বিবাদ বিচ্ছেদ উচ্ছিন্ন হইয়া তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ়তর হউক্—সদ্ভব সরলতা দয়া দাক্ষিণ্যগুণে তোমাদের জীবন শোভমান হউক্—তোমরা সত্যকে আশ্রয় করিয়া এবং মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম ও মঙ্গলের পথে বীরসদৃশ অটলভাবে বিচরণ করিতে থাক—পরিশেষে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এই আমার প্রার্থনা। *

* ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলবার্ট হলে এই বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৯, ফাল্গুন মাস।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১২৯৭৶৬
পূর্ব্বকারস্থিত	...	১৬৫০৲৩
সমষ্টি	...	২৯৪৭৶৯
ব্যয়	..	১৯৮৯।৯
স্থিত	...	৯৫৭৸৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট	২৮৪।৶০
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৶৩
	৯২২॥৩
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩৫।৶৯
	৯৫৭৸৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১২০৯৶০
মাসিক দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০০৲
আনুষ্ঠানিক দান		
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০০৲
শুভকর্ম্মের দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী		২০৲
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয়ের মূল্য		৯৮৪।৶০
দানাধারে প্রাপ্ত		৪॥৶০
		১২০৯৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯।০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র,	ঐ	৩৲
,, ,, রাখালদাস বসু,	ঐ	৬৲
,, ,, দ্বারকানাথ নন্দী,	শিবগঞ্জ	৬৲
একখণ্ড তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়		।০
		৯।০
পুস্তকালয়	...	৫॥৶০
যন্ত্রালয়	...	৬৯।৬
গচ্ছিত	...	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩॥০
সমষ্টি		১২৯৭৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১১৪২॥৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৯৷৩
পুস্তকালয়	...	৲৯
যন্ত্রালয়	...	৬৮৶০
সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক	...	১২০৲
হাওলাত শোধ	...	৭০০৲
সমষ্টি		১৯৮৯।৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১ বৈশাখ ১৮২১ শক। অদ্য হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ট্রষ্টীগণ।

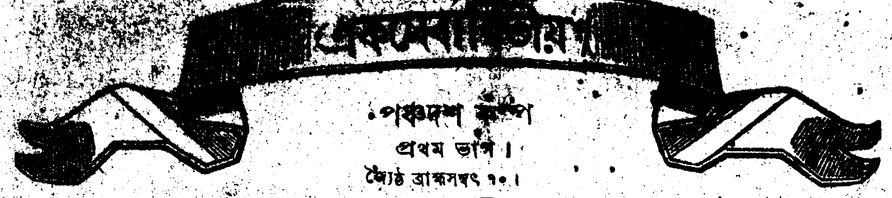

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৯৭০ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়			পৃষ্ঠা
বর্ষশেষ (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	...	২৫
নববর্ষ (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	...	...	২৮
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)			৩০
সংবাদ	...	...	৩৭
পত্র	...	...	৩৯

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৭০। কলিগতাব্দ ৫০০০। ১০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

পুণ্য।

সচিত্র মাসিক পত্র। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী সম্পাদিত।

ইহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র, সাহিত্য, উপন্যাস গল্প, সুলভ ও সৌখীন রন্ধন প্রণালী, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নানাবিধ সঙ্গীতের স্বরলিপি ও সমালোচনা প্রতি মাসেই থাকে।

পুণ্যের অগ্রিম মূল্য (ডাঃ মাঃ সমেত) ৩৲ টাকা। পত্রদ্বারা জানাইলে ভিঃ পিঃ পোষ্টেও পাঠাইয়া থাকি।

প্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কার্য্যাধ্যক্ষ) ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭০ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ।

৩০শে চৈত্র—বুধবার।

'নহি স্বদারে নিমিষশ্চ নেশে।'

'অনাদিনিধনঃ কাল'কে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বিশেষণসংযোগে আমরা আয়ত্তাধিগম্য ও অনুভবের যোগ্য করিয়াছি। তেরশত পাঁচ বঙ্গাব্দ আজিও আমাদের নিকটে অনুভবের বিষয়রূপে বর্ত্তমান; কিন্তু আগামী কল্য তাহা অতীতের স্মরণীয় বিষয়রাশির অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। তজ্জন্যই এই বিদায়ের দিনে বৎসরের ফলাফল ক্ষতি লাভ ধর্ম্মাধর্ম্ম আমাদের আলোচনার বিষয়। সংসারের সংগ্রামের ন্যায় আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সম্বৎসরব্যাপী সংগ্রামের জয় পরাজয়ও অদ্যকার বিশেষ চিন্তার যোগ্য। এই বৎসরে আমরা কতটুকু ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইতে পারিয়াছি, ইন্দ্রিয়ের অধীনতার পরিবর্ত্তে আত্মাধীনতা কতটুকু স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, দুর্জ্জয় রিপুকুলের প্রচণ্ড প্রভাব হইতে আমরা তাঁহার করুণায় কি প্রকারে একাধিকবার রক্ষা পাইয়াছি, নীচ স্বার্থপরতার কুপরামর্শে মুগ্ধ না হইয়া কি পরিমাণে পরার্থা প্রীতি ও ঐশী ভক্তির সাধনা করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া অদ্য হিসাব করিবার দিন; এবং যে পরিমাণ দুর্ব্বলতা নীচতা ধর্ম্মহীনতা কাপুরুষত্ব এ বৎসরেও আমাদের মধ্যে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদের পরমসাধনে—চরম লক্ষ্যের অর্জ্জনে অন্তরায় ঘটাইয়াছে; আগামী বর্ষের রজনী প্রভাত হইতে না হইতে তাহাদের দুর্ম্মন্ত্রণাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিও চিন্তা করিয়া প্রস্তুত থাকিবার এই প্রকৃষ্ট সময়।

যিনি অনাদিনিধন কালের নিয়ন্তা, যাঁহার শাসনে—

"নিমেষামুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি"

নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে,

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ"

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সকলি জানিতেছেন—

"যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ"

এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন,—যিনি 'কালকালঃ' কালের কর্ত্তা, যিনি ধর্ম্মের প্রস্রবণ, পাপের প্রলয়াগ্নি, যিনি বিশ্বকৃৎ বিশ্বপাতা বিধাতা, যিনি আমাদের জীবনের—এই সম্বৎসরব্যাপী সংগ্রামের জয় পরাজয়ের কর্ত্তা, তাঁহার করুণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—নিষ্কপট চিত্তে তাঁহার নিকটে শক্তি ভিক্ষা করিয়া আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইলে—আমাদের সে কার্য্যের সফলতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার স্বল্পমাত্র কারণও থাকিতে পারে না।

এই বর্ষশেষদিবসে সম্বৎসরব্যাপী জীবনসংগ্রামের জয়পরাজয় চিন্তার সঙ্গে কেহ আনন্দে—কেহ অনুতাপে—কেহ অহেতুকী ভক্তিতে—কেহ ভীষণ ভয়ে—কেহ পরমকরুণাময় বিশ্বমঙ্গলবিধাতা-জ্ঞানে—কেহ পাপের প্রচণ্ডশাস্তা উদ্যতবজ্র ভাবিয়া তাঁহার নিকটে অবনত হইতেছে। যাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মপ্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবনের প্রতিবৎসরের প্রত্যেক ঘটনা অবিচলিত ভাবে সংঘটিত হইতেছে, তাঁহার মঙ্গলময় ধ্যান—শান্তিময়ী উপাসনা তজ্জন্যই অদ্যকার সান্ধ্য-সমাজের সভ্যগণকে প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে।

অতীত চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ ভারতের ভাগ্যাকাশে যেরূপ দুর্ব্বিপত্তির প্রলয়ঙ্করী ঘনঘটা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে; মঙ্গলময়ের অবিচ্ছেদ্য করুণা-বরণে বঞ্চিত হইলে কবে তাহা ভারতকে মগ্ন ও ভগ্ন করিয়া ভাসাইয়া দিত।

তের শত পাঁচ বঙ্গাব্দের আরম্ভের সঙ্গে বঙ্গরাজধানী মহামারী সমাক্রান্ত হইয়াছিল; জনকোলাহলপূর্ণ এই মহানগর সেই মহামারীর বিভীষিকায় বিশেষত রাজকীয় চিকিৎসাব্যবস্থার অভিভব-ভয়ে জনশূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শরৎকালের শুভ-প্রভাতে সেই দুরন্ত বিভীষিকার চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া এ পবিত্র মন্দিরে বসিয়াও তাহার ফলাফলের আলোচনা করিয়া একদিন আমরা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের সে আশা সফল হইতে পারিল না; আবার বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সেই প্লেগবিভীষিকা বঙ্গভূমিকে নিতান্ত আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। যে বসন্তে বিশ্বপতির সুবিচিত্র বিশ্বরচনার নন্দনীয় সৌন্দর্য্যচ্ছটা সমুদ্ভাসিত হইয়া বিশ্বজনকে নন্দিত করে, যাহার প্রকাশে তরুলতা নবীন-পল্লবে সুরভি-পুষ্পে মঞ্জুল-মঞ্জরীতে সমুজ্জ্বল নয়ন-মনোরম হইয়া ভক্ত জনের চিত্তে সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যালয়ের মধুর-স্মৃতি জাগ্রত করিয়া তুলে,—সেই বরণীয় বসন্তের সঙ্গে গর্ব্বস্ফীত মানবের—অহঙ্কৃত আমাদের দুষ্কর্ম্মের দণ্ডরূপে প্রচণ্ড মহামারী-বিভীষিকা জড়িত হইয়া আমাদিগের কর্ণের কাছে তার স্বরে মুহুর্মুহু বলিতেছে

'মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।'

যিনি জানেন তিনি চির মধুর বসন্তের সঙ্গে এ দুরন্ত বসন্তের প্রভেদ এবং সামঞ্জস্য বুঝিতেছেন, এবং বিশেষরূপে ইহারও ভিতরে বিধাতার করুণা-লীলা অনুভব করিয়া ধন্য হইতেছেন; কিন্তু আমরাও কি এই মহাকালের শাসন-দণ্ড পরিদর্শন করিয়া গর্ব্বহীন বিনয়বান্ এবং সংযমশীল হইতে শিক্ষা করিব না? যে চঞ্চল জীবনের অবশ্য বিনাশ বিস্মৃত হইয়া মনুষ্য ন্যায় ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ, পরের অনিষ্ট, পরাবমাননা, অন্যায় ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মরাশির অনুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যে তুচ্ছ জীবনের অতিতুচ্ছ লাভালাভের নগণ্য বিষয় লইয়া আমরা পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার বিনিময়ে কৃপণতা প্রদর্শন করিয়া থাকি, সেই নিন্দনীয় অকিঞ্চিৎকর স্বার্থপরতা হইতে অব্যাহতি পাইবার বিষয়ে সম্মুখবর্ত্তিনী বিভীষিকাও কি আমাদের সহায়তা করিতেছে না? এই মহাকালের বিভীষিকা কি আমাদের কর্ণের কাছে ভেরীনিনাদে ভূয়োভূয় বলিতেছে না

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং
পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।"

ইহাই কি আমাদের প্রতি চঞ্চল জীবনের ধর্ম্মসঞ্চয় ও অমৃতলাভের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নহে? বিপদ গর্ব্বস্ফীত অশিষ্ট মুগ্ধ মানবের গর্ব্ব খর্ব্ব ও মোহনিদ্রা ভঙ্গের মহৌষধি। বিপদে পড়িয়া যদি সেই বিপদভঞ্জনের অভয়চরণের শরণ গ্রহণ করিতে পারি, যদি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া সেই অমৃতরূপের সমনদমন সুমধুর অহ্বান শুনিবার ব্যাকুল প্রার্থনা হৃদয়ে অভ্যুদিত হয়, তবে সেই বিপদের নিকট মনুষ্য সম্পদ্ অপেক্ষাও শতগুণে ঋণী! এবং সে ঋণ মনুষ্যের হীনতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে মহামহিমময় গৌরব ঘোষণাই করিয়া থাকে! সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষ বিপৎসঙ্কুল হইলেও আমাদের নিকট হইতে বিদায়ের অশ্রুপূর্ণ অভিনন্দন লাভের অনধিকারী নহে।

তাহা ছাড়া বর্ত্তমানবর্ষ সম্পদসুখেও আমাদিগকে বঞ্চিত করে নাই। দুর্ভিক্ষপ্রকোপে পূর্ব্ব কয় বৎসর ভারতবর্ষ নিতান্তই ক্ষীণ-দীন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান

কর্ষ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতবাসীর অনাহার-কষ্ট সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। এবার সুজলা বঙ্গভূমি সত্য সত্যই 'সুফলা শস্যশ্যামলা' হইয়া

'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'

এই সুসিদ্ধ আর্ষ মন্ত্রের সরল সত্য 'সমাচার জয় জয় রবে ঘোষণা করিতেছে!

সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, জয় পরাজয়, জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ লইয়াই সংসার এবং এই দ্বন্দ্ব লইয়াই বৎসর মাস দিন মুহূর্ত্ত অবিরাম গতিতে চলিতেছে। এই দ্বন্দ্ব বাদ দিয়া সংসার হয় না এবং এই দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া সময়কেও অন্য কোন রূপে বুঝিবার উপায় নাই। আমাদের সংসারে আমাদের জীবনের একটি পূর্ণ বৎসর এই সুখ দুঃখ, হাস্য ক্রন্দন, জয় পরাজয়, বিপৎ সম্পদ্, মান অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বরাশির স্থান কাল পাত্রভেদে যথাযোগ্য অভিনয় পরিসমাপ্ত করিয়া অতীতের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে যাইতেছে। এসো ভ্রাতৃগণ, এ শুভমুহূর্ত্তে আমরা বর্ষাধিপতি ত্রিভুবননাথের নিকট কায়মনোবাক্যে করুণা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার চরণে নিষ্কপট কৃতজ্ঞতা—প্রাণপূর্ণ ভক্তি এবং প্রেমপুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া চরিতার্থ হই।

দয়াময়! চির সম্বৎসরব্যাপী জীবন-সংগ্রামের জয়বিধাতা! আমরা যখন কামক্রোধাদি রিপুকুলের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তখন তুমি অলক্ষ্যে অমিত বল—নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে জয়শীল করিয়াছ। যখন আমরা বিশাল বিপদসাগরের কূলকিনারা হারাইয়া দুঃখতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছিলাম, তখ-

তুমি অজ্ঞাতসারে সে সাগরের তীরে তুলিয়া করুণার বাতাস দিয়া সচেতন করিয়াছ! যখন আমরা ব্যর্থ অপমানের তপ্ত কটাহে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম, তখন তুমি তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তিসলিল-বিধৌত করিয়া শান্ত করিয়াছ! যখন সংসার-বিপনীর আদান প্রদানে সময়ে সময়ে মহাক্ষতি এবং বিচারহীনতার চিন্তা করিয়া আত্মগ্লানির মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইতেছিলাম, তখন তুমিই সেই সংসারিক হারজিতের নগণ্যতা বুঝাইয়া আমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা ধৈর্য্য ও আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করিয়াছ।

তোমারই করুণা-প্রবাহ রোগে শোকে ভয়ে বিপদে সকল বিঘ্নে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। তোমারই দয়া সুখসম্পৎ স্বাস্থ্য সৌভাগ্য প্রেমানন্দের নিত্যবিধাত্রী। তুমি চিরজীবনের সুহৃৎ, সর্ব্বসম্পর্কের আশ্রয়—

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব,
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব!'

তুমি সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা রাজরাজেশ্বর! প্রভো! আজ আমাদের বর্ষশেষের প্রেম ভক্তি কৃতজ্ঞতার প্রাণপূর্ণ উপহার করুণা পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাদের জন্ম কর্ম্ম চরিতার্থ কর।

'নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে!'

তোমাকে ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেরও প্রভু নহি। বর্ত্তমানবর্ষে যেমন আমাদিগকে তুমি ভয় বিপদে সুখসম্পদে রক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ প্রতিবর্ষে—প্রতিমুহূর্ত্তে তুমিই রক্ষা করিও।

তুমি 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।' তুমি 'বর্ষস্যেশিতা' আজ আমাদের এই বর্ত্তমান বৎসরের সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া আমরা ধন্য—কৃতকৃত্য হইতেছি।

তুমি কালত্রয়ের আশ্রয়, ত্রিভুবনের পতি, গতিহীন আমরা আজি বর্ষশেষের সন্ধ্যায় তোমার চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। করুণাময় প্রভো! যেদিন এই বৎসরের মত আমাদের জীবনের সন্ধ্যা উপস্থিত হইবে—যেদিন 'ভীষণবিকটকালঃ কেশধারী লোলুপঃ' আমাদিগকে বিভীষিকা-প্রদর্শন করিবে, সেই জীবনের সন্ধিক্ষণে—হে অমৃতরূপ! তুমি আমাদের সম্মুখে ভুবনমোহন সচ্চিদানন্দময়রূপে প্রকাশিত হইয়া অভয় বীণাতন্ত্রীর মোহন ঝঙ্কারে অভয়দান করিয়া তোমার সেই প্রেমানন্দের চিরজ্যোৎস্না সমুদ্ভাসিত নিত্যশান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়া আমাদের মনুষ্য জীবনকে সার্থক করিও! তোমার নিকটে ইহাই আমাদের বর্ষশেষের শেষ প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নববর্ষ।

১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

যে শক্তির প্রভাবে জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়, সেই কালের নিষ্ক্রিয় নিস্তব্ধ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া—সৃষ্টিতত্ত্বের পূর্ব্ব পৃষ্ঠা অবলোকন করিয়া প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন যে, "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে"। পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু সকল কারণের মূল কারণ বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছাগুণে সেই কাল যখন সক্রিয় হইল, নব প্রাণে এই বিশাল সৃষ্টি সঞ্চারিত হইল, অনন্ত আকাশে স্থির সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ সকল ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপ্রান্তে নেত্রোন্মেষণ করিল তখন যে প্রেম, যে আনন্দ, যে বিস্ময় সংসারহৃদয়ে উন্মেষিত হইয়াছিল তাহা গভীর

অতীত-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে মানুষের প্রাণ কি আর এই মৃত্যু জরা ব্যাধিগ্রস্ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চায়? সে সেই প্রাণপতি পরমেশ্বরের চিরানন্দময় অমৃতপদে অমৃতপানেচ্ছু হইয়া উধাও হইয়া উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রথম উচ্ছ্বাস যেমন সৃষ্টির প্রথম দিনের বিকাশ, সম্বৎসরের পর সম্বৎসরের প্রথম দিন সেই উচ্ছ্বাসেরই এক একটি পরবর্ত্তী আবর্ত্ত। এই বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন মঙ্গলময়ের এক-মঙ্গল-জ্যোতি শতধা হইয়া অবলোকিত হয়, সেইরূপ একটি বৎসর অতীত হইলে নূতন বৎসরের প্রথম প্রভাতে জরা ব্যাধি শোক সন্তাপ অতিক্রম করিয়া মানবাত্মা সেই প্রেমময়ের প্রেম-সমীরণে স্নিগ্ধ হয়, সেই অমৃতময়ের অমৃতরসে সঞ্জীবিত হয়—তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় সত্য সুন্দর মঙ্গলভাবের দিকে আপনার ক্রমোন্নতি উপলব্ধি করিয়া সে অনন্ত সুখ শান্তির লাভে আশান্বিত হয়।

অদ্য নূতন বৎসরের প্রথম প্রভাত। এই মঙ্গল মুহূর্ত্তে সেই প্রেমময়ের মঙ্গল রশ্মিতে জ্যোতিষ্মান তরুণ সূর্য্য মেঘমালায় আবৃত হইয়া ঐ পূর্ব্ব দিকে উদিত হইতেছে। মেঘ বারিপাতে বসুন্ধরাকে স্নিগ্ধ ও শস্যশালিনী করিতেছে। প্রাভাতিক সুস্নিগ্ধ বায়ু জীবের নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, বনে প্রান্তরে চারিদিকে নানা জাতীয় পক্ষী সকল শ্রুতিসুখকর কোলাহলে তাঁহারই স্তুতিগান করিতেছে—সমস্ত প্রকৃতি নবশোভায় সুশোভিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া সেই বিশ্বপতির পরম পদে অবনত হইতেছে। এই পবিত্র সময়ে হে শরীরী আত্মা! যিনি তোমার সুখের জন্য এই বিশ্ব সংসার রচনা করিয়াছেন, যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ ও অক্ষয় আনন্দের নিকেতন; যাঁহার কৃপায় শুষ্ক তরু মঞ্জরিত ও পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাঁহার কৃপার উপরে নির্ভর করিয়া, শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপের নিকট গমন কর। ভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত পিপাসু হও। নিশ্চয় দেখিতে পাইবে তিনি দর্শন-রূপ অমৃতবারি দ্বারা আমাদের পিপাসা দূর করিবেন। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে অন্য লাভ আর লাভ বলিয়া মনে হইবে না। সেই অপ্রতিম সৌন্দর্য্য-রাশিতে মন নিমগ্ন হইলে পার্থিব কোন বস্তুই আর আত্মাকে বিমোহিত করিতে পারিবে না। সে অমৃত বারি একবার পান করিলে আর বিষয়-তৃষ্ণা তোমার চিত্তকে আকুল করিবে না। তাঁহাকে একবার হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে আর ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের আলোক, হৃদয়ের শান্তি। তিনি পিতা, মাতা, গুরু ও সুহৃৎ হইতেও অধিক। তাঁহাকে হৃদয় দান কর, তাঁহার নিকটে হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত কর, মনের সকল কথা, সকল তাপ, সকল দুঃখ তাঁহাকে বল। তাঁহার ন্যায় আপনার আর কেহই নাই এমনি করিয়া তাঁহাকে জানো। দেখিবে তাঁহার সহিত কথা কহিলে, তাঁহার সহিত সখ্যতা করিলে চিত্ত যেমন প্রফুল্ল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। যখনি ভক্তি সহকারে তাঁহাকে পূজা করিবে তখনি তাঁহার প্রসাদ ও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে। একবার পবিত্র হইয়া অনুরাগ-ভরে ব্রহ্ম নাম কর, শতবার ঐ

নাম করিতে ইচ্ছা হইবে। শুধুবার ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ কর সহস্রবার তাহা উচ্চারণ করিতে মন উন্মুখ হইবে। ব্রহ্মপূজার জন্যই আমাদের জন্ম। যদি জীবনের সর্ব্বক্ষণ এবং এইরূপ বিশেষ বিশেষ কালের সন্ধিক্ষণে ব্রহ্মপূজা না করিলাম তবে আমাদের জন্মই বিফল। ভক্তিযোগে তাঁহার পূজা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, আত্মা উত্তম্ভিত হইবে ও প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া তাহার মলিনতা ধৌত করিবে এবং ঈশ্বরের প্রসাদরূপ চন্দ্রিকা তাহাতে উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইবে। অতএব এস, ভক্তিযোগে সেই জন্মমরণ-রহিত সনাতনকে পূজা করিয়া জন্ম সফল করি!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মের মূল আদর্শ অতীব সুন্দর। যেমন সুন্দর, তেমনি মহান্। নিষ্পাপ ঋষিদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ নানা প্রকার ছন্দোবন্ধে দেবতাদিগের প্রতি উত্থিত হইত! তাঁহারা কোনো প্রকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেন না। কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সূর্য্যে চন্দ্রে মেঘে বিদ্যুতে অনিলে সলিলে সর্ব্বত্রই তাঁহারা দৈব শক্তি, দৈব মহিমা, দৈব সৌন্দর্য্য, অবলোকন করিতেন। দেবতাগণকে তাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া জানিতেন; আর উৎসবের সময়ে, ক্রিয়াকর্ম্মের সময়ে, জয়-পরাজয়ের সময়ে, সুখে দুঃখে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অতিথি সৎকার করিতেন; তাঁহাদের নিকটে মুক্তকণ্ঠে আপন আপন মনের ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন; আনন্দের সময় আনন্দ জানাইতেন, দুঃখের সময় দুঃখ জানাইতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠিল; তাঁহারা সত্য জানিতে পারিলেন।

তেজঃপুঞ্জ আর্য্যধর্ম্মের নিভৃত সূতিকাগারে—পঞ্চধাপ্রবাহিনী পঞ্চ নদীর সমীপবর্ত্তী সুমঙ্গল ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে—যে সময়ে মনুষ্য-জাতির জ্ঞান-ধর্ম্মের নবোন্মেষ কিছুকাল ধরিয়া বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে ইন্দ্র মরুৎ বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিভাস সকল ধাত্রীর উপন্যাসের ন্যায় তাঁহাদিগের মনে ব্রহ্মের ভাব অল্পে অল্পে উদ্বোধিত করিতেছিল; তাহার কিয়ৎ শতাব্দী পরে সে সকল উপন্যাসে অমৃতপিপাসু ঋষিদিগের মন তৃপ্তি মানিল না;—তাঁহারা হোমযাগযজ্ঞাদিকে বাল্যক্রীড়া মনে করিয়া অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পরে যথোপযুক্ত সময়ে সর্ব্বজগতের আদিকারণ এবং মূলাধার মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সেই আদিম পিতৃপুরুষদিগের সমক্ষে সাক্ষাৎ পিতা মাতা এবং বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন "সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনি আমাদের বন্ধু জনয়িতা এবং বিধাতা। তাঁহাদের শ্রদ্ধাবান্ সরল অন্তঃকরণে যেমন যেমন সত্য জিজ্ঞাসার নব নব উন্মেষ আরম্ভ হইতে লাগিল, তেমনি টাট্‌কাটাট্‌কি পরমেশ্বরের প্রসাদবারি মাতার স্তন্য দুগ্ধের ন্যায় তাঁহাদের জ্ঞান-পিপাসার শান্তি-সুধা রূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। মাতৃদুগ্ধের ন্যায় জীবন-প্রদ ধন আর পৃথিবীতে নাই—সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত সুবিমল জ্ঞানের ন্যায় আত্মার প্রাণপ্রদ এবং বলপ্রদ জ্ঞান আর জগতে নাই।

আদিম ঋষিদিগের অন্তঃকরণে—উদয়োন্মুখ সেই যে জ্ঞানধর্ম্মের অভিনব স্ফূর্ত্তি, তাহাতে দেব-প্রসাদেরই মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। দেব-প্রসাদের অমৃত সিঞ্চনে তাঁহাদের আত্মপ্রভাবের কলিকা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতে লাগিল; সত্যের অনুসন্ধান, সংশয়ের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া, জ্ঞানালোকের অভিমুখে উত্থান করিতে লাগিল। তাঁহারা সব ছাড়িয়া জনশূন্য নিভৃত স্থানে, একান্ত চিত্তে, সকল সত্যের পরম সত্য পরব্রহ্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; আর, তাহার গুণে যখন তাঁহারা আশাতীত ফল-লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তখন জ্বলন্ত অনুরাগ এবং অটল অধ্যবসায়ের সহিত পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা এবং প্রিয়কার্য্য সাধনে কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

এটা একটা বিস্ময়জনক ব্যাপার—সন্দেহ নাই যে, আদিম ঋষিদিগের সময়ে দর্শন-শাস্ত্র ছিল না; বিজ্ঞান-শাস্ত্র ছিল না; পুঁথি পত্র বা জ্ঞানানুশীলনের অন্য কোনো প্রকার যোগাড় যন্ত্র, কিছুই ছিল না; অথচ তাঁহারা পরম সত্য এবং অমৃত আনন্দ হৃদয় ভরিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যখন সুনিশ্চিত যে ঐ বিশেষ বৃত্তান্তটির একটি বিশেষ কারণ আছে, তখন, মনকে বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইতে না দিয়া সেই বিশেষ কারণটির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির কার্য্য।

আমরা যখন কোথাও কোন প্রকার বিস্ময়জনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের আপাত-দৃষ্টিতে তাহা আকস্মিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবারই কথা, কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে তাহার প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা হয়তো আমাদের জানা-শুনা দৈনন্দিন ঘটনাচক্রের মধ্যেই তাহার জুড়ি খুঁজিয়া পাইতে পারি; আর, তাহা যখন খুঁজিয়া পাই, তখন দুইকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দুয়েরই বিশেষ কারণ এক সঙ্গে অবগত হই। একটা বৃন্তচ্যুত ফলের পতনক্রিয়ার সহিত সৌর জগতের গতিবিধি মিলাইয়া দেখিয়া নিউটন ঐরূপ অত ছোটো এবং অত বড় দুইটি বৃত্তান্তের মধ্যে একই মহাবলশালী বিশ্বব্যাপী নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া তাহার নাম দিলেন—গুরুত্বের আকর্ষণ বা ভারাকর্ষণ। অতএব আদিম ঋষিগণের অযত্ন-সম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানের বৃত্তান্তটি মনুষ্য-সমাজের কোনো প্রকার জানা শুনা নিয়মিত ঘটনার সহিত মেলে কি না, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যা'ক্। যদি কোন প্রকার জানা শুনা নিয়মিত ঘটনার সহিত উহার সৌসাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহারই মধ্য দিয়া উহার বিশেষ কারণের অনুসন্ধান-পথ আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

সবে মাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে—এরূপ একটি অভিনব বালকের মনের ভাব কিরূপ তাহা আমরা জানি—জানিয়াও তাহার গুরুত্বের প্রতি সমুচিত মনোযোগ করি না। ফলে, ঐরূপ একটি বালকের জ্ঞান-পিপাসা এবং সরল সত্য-জিজ্ঞাসা অতীব খাঁটি বস্তু; তাহা এখনো মিথ্যা বিদ্যাভিমান, কৃত্রিম সামাজিকতা, অলীক কুসংস্কার, কুটিল স্বার্থাভিসন্ধি, এ সকল পাপ-প্রসক্তির কালিমায় কলঙ্কিত হয় নাই। তাহার সরল অন্তঃকরণের অকৃত্রিম সত্য-জিজ্ঞাসার—জ্ঞান-স্পৃহার—

* ব্রাহ্মসমাজ কমিটির অন্যতম অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক আলবার্ট হলে পঠিত।

আকর্ষণ এমনি বলবান্ যে, সেই কচি বালক অল্প সময়ের মধ্যেই মাতার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে মাতৃভাষার সমস্ত মৌলিক সম্বল বাহির করিয়া লইয়া অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করে—অথচ ব্যাকরণ বা অভিধান যে, কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। ক্রোড়স্থ শিশুর চক্ষু ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা (অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসা) অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়; যেমন যেমন উন্মেষিত হয়, তেমনি তেমনি মাতার মুখ-বিনিঃসৃত সুমধুর মাতৃভাষার পথ-দিয়া তাহার বিকাশোন্মুখ জ্ঞানাঙ্কুরের উপজীবিকা অবতীর্ণ হইতে থাকে। মাতা ক্রোড়স্থ শিশুকে ক্ষুধারও তীব্রতা টের পাইতে দে'ন না, জিজ্ঞাসারও (অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসারও) তীব্রতা টের পাইতে দে'ন না। শরীরের ক্ষুধা এবং মনের জিজ্ঞাসা মুখ মেলিতে না মেলিতেই মাতৃ-দুগ্ধ ক্রোড়স্থ শিশুর মুখপুটে এবং মাতৃ-ভাষা তাহার কর্ণ-পুটে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়। ক্ষুধা যে কাহাকে বলে তাহা মনুষ্য তখনই বুঝিতে পারে, যখন তাহাকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঘর্ম্মজল সিঞ্চন করিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিতে হয়; জিজ্ঞাসা যে, কাহাকে বলে, তাহা তখনই বুঝিতে পারে, যখন তাহাকে নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞানের পাক-চক্রময় জটিল পথ অনুধাবন করিয়া সত্য উপার্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য মাতৃ-দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া বড় হইলে তবে তো সে কৃষিকার্য্য দ্বারা অন্ন উপার্জন করিবে? মাতৃভাষায় তাহার জ্ঞানের গোড়া-পত্তন হইলে তবে তো সে ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিবে? অতএব মাতৃভাষা মনুষ্য-জ্ঞানের একটি আদিম উপকরণ তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু দুই হাত নহিলে তালি বাজে না। মনুষ্য-জ্ঞানের আর একটি আদিম উপাদান আছে—সেটি হ'চ্চে ধারাবাহিক পৈতৃক সংস্কার—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Heredity। পৈতৃক সংস্কার জ্ঞানের বীজ; মাতৃভাষা জ্ঞানের সরস মৃত্তিকা; আর, সেই মাতৃভাষার অর্থ-বোধ জ্ঞানের অঙ্কুর। পৈতৃক সংস্কারের প্রবর্ত্তনা-গতিকে মাতৃভাষার রসাকর্ষণ করিয়া জ্ঞানের অঙ্কুর উদ্বোধিত হয়। গোড়ায় পৈতৃক সংস্কারের বীজ না থাকিলে—শুধু কেবল মাতৃভাষা মুখস্থ করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে পারে না; তাহা যদি হইতে পারিত, তবে একটা কুক্কুরও তাহার প্রভুর নিকট হইতে অনায়াসে ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। একটা বিশিষ্টরূপ প্রণিধানশীল কুক্কুরকে অনেকগুলা ইঙ্গিত-প্রধান আদেশ-বাক্যের মোট অর্থ জো শো করিয়া গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এই যা কেবল, তা বই—সহস্র চেষ্টা করিলেও একটি সহজ বাক্যের বিভক্তি কারক প্রত্যয় প্রভৃতির প্রয়োগ-বিজ্ঞান সহকৃত অর্থ-বোধ তাহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে সংক্রামিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রবণ-পথবর্ত্তী বাক্যের প্রকৃত অর্থ-বোধ (অর্থাৎ ব্যাকরণ-ঘটিত এবং অভিধান-ঘটিত অর্থ-বোধ অবোধ শিশুরই বা স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ হয় কেন—অবোধ পশুরই বা তাহা না হয় কেন? উভয়ই সমান অবোধ—অথচ ফল বিভিন্ন—ইহার কারণ কি?

"কারণ" স্পষ্টই পড়িয়া আছে। অবোধ শিশুর অন্তর্নিহিত পৈতৃক সংস্কার তাহাকে ভিতর হইতে ধাক্কা দিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের পথে নিয়তই অগ্রসর করিয়া দেয়; কিন্তু অবোধ পশুর পৈতৃক সংস্কার তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্বেষণ প্রভৃতি গোটাকত সুনির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই করিতে বলে না। অতএব এটা স্থির যে, নব-প্রসূত বালকের মনোমধ্যে পৈতৃক সংস্কার তলে তলে কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহারই প্রবর্ত্তনা-গতিকে সে বালক মাতৃভাষার অর্থ-জ্ঞান অল্পে অল্পে আয়ত্ত করিতে থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যজ্ঞানের আদিম উপাদান দুইটি; একটি হ'চ্চে ধারাবাহিক পৈতৃক সংস্কার—আরেকটি হ'চ্চে মাতৃভাষা। মনুষ্যকে যদি মাতৃভাষার প্রভাবমণ্ডলী হইতে বিয়োজিত করিয়া জন্মাবধি কোনো একটা জনশূন্য উপদ্বীপে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাহার জ্ঞানের বীজ-ভূত পৈতৃক সংস্কার মাতৃভাষার সরস মৃত্তিকা বিহীনে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়; আর, সেই গতিকে তাহার মনুষ্যত্ব অনেক হাত জলের নিচে চাপা পড়িয়া যায়।

নবপ্রসূত শিশুর অন্তঃকরণে যেমন পৈতৃক সংস্কার এবং মাতৃভাষা একযোগে কার্য্য করিয়া তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তোলে—আমাদের আদিম পিতৃপুরুষদিগের অন্তঃকরণে তেমনি মহাপৈতৃক সংস্কার এবং মহামাতৃভাষা একযোগে কার্য্য করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। পৈতৃক সংস্কারের মূল—পিতৃপুরুষ; মহাপৈতৃক সংস্কারের মূল পিতৃপুরুষদিগেরও পিতা—সর্ব্ব জগতের পিতা—পরম পিতা পরমেশ্বর। মাতৃভাষার মূল স্বদেশরূপিণী জননী; মহামাতৃভাষার মূল—ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্ব জগতের প্রসবিত্রী জগজ্জননী পূর্ণ ব্রহ্ম। মহাপৈতৃক সংস্কার এবং মহামাতৃভাষা কিরূপ তাহা খুলিয়া বলিতেছি—শ্রবণ করুন:—

প্রথমতঃ আত্মা পরমাত্মা ধর্ম্ম এবং পরকাল বিষয়ক জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার যাহা পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে মনুষ্য-জাতির আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া পাত্রে পাত্রে পুরুষানুক্রমে পরিপোষিত পরিমার্জ্জিত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা পৈতৃক সংস্কার অপেক্ষাও মৌলিক সংস্কার—তাহা মহাপৈতৃক সংস্কার! দ্বিতীয়তঃ জগজ্জননীর সেই নানা-রস-পূর্ণ অকথিত এবং অলিখিত ভাষা—যেমন আদরের ভাষা মলয়ানিল-বিকসিত সুগন্ধি কুসুমে, হাসাইবার ভাষা সুপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায়, চোক-রাঙানি এবং ধমকানি ভাষা বিদ্যুৎ-বজ্রে, শান্ত করিবার ভাষা বিস্তৃত জলাশয়ের স্বচ্ছ সুগভীর সলিলরাশিতে, ঘুম পাড়াইবার ভাষা ঘোরা বর্ষা রাত্রির সুধীর ধারা-নিপাতনে—জগজ্জননীর সেই স্নেহভরা ভাষা যাহা নানা শব্দ, নানা স্পর্শ, নানা রূপ রস গন্ধের মধ্য দিয়া যখনই যাহার কর্ণে প্রবেশ করে তখনই তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়, তাহা মাতৃভাষা অপেক্ষাও মৌলিক ভাষা—তাহা মহা মাতৃভাষা।

আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা পরম পিতামাতা-বিধাতার নবপ্রসূত সন্তান ছিলেন—বলিলেও বলা যায়, তাঁই তাঁহাদের অন্তঃকরণ শিশুর ন্যায় নির্ম্মল এবং কৃত্রিমতা-শূন্য ছিল। অভিনব শিশু যেমন মাতৃভাষা অবলীলা-ক্রমে আয়ত্ত করে, আদিম ঋষিরা তেমনি প্রকৃতির নিজের মুখের ভাষা—সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের ভাষা—ওষধি বনস্পতির ভাষা—নদ-নদী পর্ব্বতের ভাষা—নবানুরাগে আয়ত্ত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ফলে তাঁ-

হারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিবেন তবে আর কে তাহা করিবে? কেননা, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মই হ'চ্চে এই যে, অকৃত্রিম বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্য আকর্ষণ করে; নিষ্পাপ নির্ম্মল এবং প্রেমপূর্ণ আত্মা পরমাত্মার প্রসাদ-বারি আকর্ষণ করে। আমরা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে পঙ্কিল পৃথিবীতে ডুবিয়া রহিয়াছি বলিয়া সেই কারণে মাটি হইয়া যাইতেছি; আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মে ডুবিয়া রহিয়াছিলেন বলিয়া সেই কারণে তাঁহারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ঈশ্বরপ্রাণিত আদি-পুরুষেরা যখন মহা-পৈতৃক সংস্কারের প্রবর্ত্তনায় মহা-মাতৃভাষার পথ দিয়া সত্য-ভরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করেন, তখন সেই জীবন্ত জ্ঞানের অনুশীলন-কালে জ্ঞাতার দৃষ্টি ঈশ্বরের মহিমাতেই ভরপূর সমাসক্ত থাকে। তাহার পরে যখন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা গুরু-পরম্পরাগত পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের বিভিন্ন অবয়ব তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং এক এক সম্প্রদায় এক এক বিচ্ছিন্ন অবয়বের বিশিষ্টরূপ অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া কেহ বা জ্ঞান-তত্ত্বে কেহ বা প্রকৃতি-তত্ত্বে কেহ বা কর্ম্ম-তত্ত্বে কেহ বা সাধন-তত্ত্বে, কেহ বা ভজন-তত্ত্বে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন; তখন সেই সেই একদিক্ ঘ্যাঁসা জ্ঞানের অনুশীলন-কালে জ্ঞাতা যদি সাবধান না হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টি ঈশ্বরের মহিমা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া দিন দিন আত্ম-প্রভাবের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কঠিন হইতে কঠিনতর বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যাইতে থাকে। যদিচ ঈশ্বরের প্রসাদ হইতেই মনুষ্যের আত্মপ্রভাব সতেজে অঙ্কুরিত হইয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া দাঁড়ায়, তথাপি মনুষ্যজীবনের সেই উঠন্তি সময়ে একটি গুরুতর বিপদ আশঙ্কনীয়; সে বিপদ্ হ'চ্চে এই ঃ—

মনুষ্যের বিশিষ্টরূপ শিক্ষার জন্য মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ তাহার জীবন-প্রবাহিনীর মাঝগঙ্গায় একটি ফাঁড়া দাগিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্য-নাবিক যখন সেই ফাঁড়াটি কাটাইয়া উঠে তখনই সে পাকা মাঝি হয়; আর, যতক্ষণ তাহা না করিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই নিরাপদ হইতে পারে না। মনুষ্য যখন কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্যের মাঝপথে উপনীত হয়, তখন যদি সে আত্ম-গরিমায় স্ফীত হইয়া ভিত্তি-মূলের কথা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে, এমন যে স্বর্গীয় শতদল—আত্ম-প্রভাব, তাহা দেবপ্রসাদের আলোক বিহীনে অহঙ্কারের নৈশ তিমিরে অন্ধ হইয়া—হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া—ঘাড় গুঁজিয়া রসাতলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে—বলিতেছি শ্রবণ করুনঃ—

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে"—ব্রহ্ম দেবতাদিগের জন্য জয় করিলেন। "তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত"—সেই ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন।

"ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি"—

তাঁহারা মনের মধ্যে এইরূপ অভিমান করিলেন যে, আমাদেরই এ বিজয়—আমাদেরই এ মহিমা। "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ"—ব্রহ্ম তাঁহাদের মনের কথাটি জানিলেন; জানিয়া "তেভো হ প্রাদুর্বভূব"

—তাঁহাদের সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। "তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি"—তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন জাতবেদঃ তুমি জানো গে যাও কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ। "তথেতি" আচ্ছা আমি জেনে আস্‌ছি। "তদভ্যদ্রবৎ"—অগ্নি দ্রুত-পদক্ষেপে তাঁনিকটে গেলেন। "তমভ্যবদৎ কোঽসীতি"—ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন কে তুমি। "অগ্নির্বাহমস্মীতি অব্রবীৎ জাতবেদা বা অহমস্মীতি" অগ্নি বলিলেন আমি অগ্নি আমি জাতবেদা। "তস্মিন্ত্বয়ি কিং বীর্য্যং"—তুমি যে অগ্নি জাতবেদা তোমাতে কি সামর্থ্য? "অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি"—এমন কি সব আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে। "তস্মৈ তৃণং নিদধাৎ"—ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একগাছি তৃণ ধরিলেন। "তদ্দহেতি"—ইহাকে দগ্ধ কর। "তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তং ন শশাক দগ্ধুং"—অগ্নি সেই তৃণের উপরে আপনার সমস্ত বলবীর্য্য পর্য্যবসিত করিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না! "স তত এব নিবব্রতে"—সেই অবধি অগ্নি নিবৃত্ত হইলেন। "নেতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি"—না—পারিলাম না জানিতে কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ! বায়ু বলিলেন আচ্ছা আমি জেনে আস্‌চি—এই বলিয়া দ্রুত পদ-ক্ষেপে ব্রহ্মের নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম বলিলেন কে তুমি। বায়ু বলিলেন আমি বায়ু আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন তুমি যে বায়ু মাতরিশ্বা—কি তোমাতে সামর্থ্য? বায়ু বলিলেন—এমন কি সব আমি উড়াইয়া দিতে পারি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে। ব্রহ্ম বায়ুর সম্মুখে এক গাছি তৃণ ধরিয়া বলিলেন—ইহাকে উড়াইয়া দেও। বায়ু সেই তৃণের উপরে আপনার সমস্ত বলবীর্য্য পর্য্যবসিত করিয়াও তাহাকে নড়াইতে পারিলেন না। সেই অবধি বায়ু নিবৃত্ত হইলেন—বলিলেন "না—পারিলাম না জানিতে কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ!" তাহার পরে দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটে যাইবামাত্র ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্ধান করিলেন। ইন্দ্র তখন সেই স্থানে বহুশোভমানা হৈমবতী উমাকে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে উনি অলৌকিক মহাপুরুষ" উমা বলিলেন ব্রহ্ম; ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছে।' উমা হৈমবতী শুনিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, হৈমবতী শব্দের অর্থ হিমবৎ-কন্যা; কেননা টীকাতে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, হৈমবতী উমা—কিনা হেমালঙ্কার-বিভূষিতা উমা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই সুন্দর আখ্যায়িকাটীর অর্থ দুইরূপ—আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক।

উহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে; জগতে যাহার যাহা কিছু বলবীর্য্য সমস্তই ব্রহ্মেরই প্রসাদাৎ। ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত হইলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না, বায়ুর বায়ুত্ব থাকে না, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব থাকে না, কিছুরই কিছুত্ব থাকে না। ব্রহ্মই সকল সত্তার মূলাধার, সকল শক্তির মূল প্রবর্ত্তক, সকল আত্মার অন্তরাত্মা। ব্রহ্মেরই প্রসাদে মনুষ্য অন্তরের এবং বাহিরের দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির উপরে জয় লাভ করিতে পারে। কিন্তু মাঝ পথে মনুষ্য যখন সেই গোড়ার কথাটা বিস্মৃত হইয়া আত্ম-গরিমায় স্ফীত হইয়া মনে করে যে, বিজয়-কার্য্যে তাহার নিজেরই ষোলো আনা কর্ত্তৃত্ব—তাহার

নিজেরই ষোলো আনা মহিমা, তখন তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্ম তাহার সমস্ত বলবীর্য্য হরণ করিয়া ল'ন। তাহার পরে যখন সে ব্রহ্মের প্রসাদ হইতে অধঃপতিত হইয়া একান্ত শ্রীভ্রষ্ট, অসহায়, এবং নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে তখন ব্রহ্মের কৃপায় জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা উমা আসিয়া তাহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। তখন সে ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করে। মনুষ্যের এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তনের অবস্থায় তাহার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রসাদ অল্পে অল্পে অবতীর্ণ হইয়া তাহার অন্তঃকরণে স্বর্গীয় বল-বীর্য্য এবং আশা-উদ্যমের সঞ্চার করে। অবশেষে সাধক ঈশ্বর-প্রসাদে বলী হইয়া পথের নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের উপরে জয়-লাভ করে, এবং পরম আনন্দে ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইয়া কল্যাণ হইতে কল্যাণে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে। এই গেল আধ্যাত্মিক অর্থ। উহার ঐতিহাসিক অর্থ যাহা—তাহা একপ্রকার ভবিষ্যৎ বাণী। তাহা এই যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানেরা যদি ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতির শক্তিকে এবং মনুষ্যের বল-বীর্য্যকে সর্ব্বোপরি বাড়াইয়া তুলেন; ব্রহ্মের আরাধনা ছাড়িয়া যদি শক্তিপূজায় এবং অবতারপূজায় প্রবৃত্ত হ'ন; তবে তাঁহাদের দুর্গতির আর সীমাপরিসীমা থাকিবে না; তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীভ্রষ্ট অসহায় নির্বীর্য্য এবং হতচেতন হইয়া মস্তকে হস্ত দিয়া হাহাকার করিতে থাকিবেন। যখন কোথাও আর কোনো উপায় দেখিতে পাইবেন না, তখন ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে। ব্রহ্মবিদ্যার ওঁঙ্কারমন্ত্রপূত সলিল-সিঞ্চনে ক্রমে তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে। তখন তাঁহারা ব্রহ্মের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার উপাসনায় জীবন সমর্পণ করিবেন; তাহা যখন করিবেন, তখন সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচিয়া গিয়া তাঁহাদের আর এক শ্রী হইবে, আর এক মূর্ত্তি হইবে, আর এক স্ফূর্ত্তি হইবে; তখন তাঁহারা ঈশ্বর-প্রসাদে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া আর এক মনুষ্য হইবেন, এবং নূতন বলে বলী হইয়া অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিবেন।

আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা এক সময়ে যাঁহাকে অগ্নিতে দেখিয়াছিলেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাতবেদা; আর এক সময়ে বায়ুতে দেখিয়াছিলেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মরুৎ; আর এক সময়ে জল-রাশিতে দেখিয়াছিলেন জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ কিনা আবরণকর্ত্তা—পৃথিবীর তৃতীয়াংশের আবরণ-কর্ত্তা; আর এক সময়ে গগনমণ্ডলে দেখিয়াছিলেন গগনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র; আর এক সময়ে সূর্য্যমণ্ডলে দেখিয়াছিলেন সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সবিতা—কিয়ৎ শতাব্দী পরে যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইল, তখন তাঁহাকেই তাঁহারা আত্মাতে দেখিলেন আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমাত্মা। তখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, যিনি অনাদি-অনন্ত কালের অধিদেবতা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা ওঁঙ্কার, তিনিই অসীম আকাশের অধিদেবতা সর্ব্বজগতের মূলাধার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনিই আত্মার অধিদেবতা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা। এইরূপে যখন তাঁহারা সেই অনাদি অনন্ত কালের অধিদেবতা ওঁঙ্কারকে এবং সেই অসীম আকাশের অধিদেবতা পূর্ণ ব্রহ্মকে একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা জানিয়া তাঁহাকে দেশকালের অতীতরূপে আত্মাতে উপলব্ধি করিলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মের ধ্যান, ব্রহ্মের আরাধনা, ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য-সাধন এবং ব্রহ্মের আনন্দরস পান করিয়া অজেয় ব্রহ্মতেজ উপার্জ্জন করিলেন, আর, তাহারই গুণে ব্রাহ্মণ হইলেন। ক্রমশঃ।

সংবাদ।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের ত্র্যশীতিতম শুভ জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার পর পরিবারস্থ সকলে যোড়াসাঁকোর বাটীতে সমবেত হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

আজ আমাদের কি আনন্দ এবং সৌভাগ্য যে, আমরা পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ৮৩ বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষে—শাখোপশাখা এবং লতা-পল্লব যেমন দেবদারু বা অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষের কাণ্ডকে পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে পারিতেছি; কেননা, সংসার-সাগরে ভাসিতেছে এই যে একটি ক্ষুদ্র অর্ণবপোত আমাদের এই বৃহৎ পরিবার, ইহার কাণ্ডারী মূলে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর এবং তাঁহার নীচে পরম ভক্তিভাজন পিতৃদেব।

আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা কলম্বসের ভিতরে যখন ঈশ্বরের আদেশ আসিয়াছিল, তখন কলম্বস্ যেমন তাঁহার জাহাজের যাত্রীদিগকে নানা প্রকার বিপদের ত্রিভীষিকার মধ্য দিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন—ভক্তিভাজন পিতৃদেব আমাদিগকে সেইরূপ নানা বিপদের মধ্য দিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া চলিতেছেন। তিনি নির্নিদ্র নয়নে হা'ল ধরিয়া রহিয়াছেন বলিয়া জাহাজ খানি—বামে ঘূর্ণার পাক দক্ষিণে চোরা পাহাড়, দুয়ের মধ্য দিয়া পথ কাটিয়া, এবং নানা বাদ-রিতণ্ডার তুমুল ঝঞ্ঝাতরঙ্গ পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রতি-নিয়তই ব্রাহ্মধর্ম্মের শান্তি-পরিশোভিত নিরাপদ কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ভক্তিভাজন পিতৃদেবের মনের পরিবর্ত্তন সর্ব্ব-প্রথমে যখন ঘটিয়াছিল তখন কিরূপ গভীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আর তাঁহার যাহা জীবনের আদর্শ তাহা তিনি তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত কিরূপ অপ্রতিহত উদ্যমে, অতন্দ্রিত নয়নে, এবং অপরাজিত অন্তঃকরণে পরিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা একবার প্রশান্ত মনে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ধ্রুব তারার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জাহাজ চালাইতেছেন। ধ্রুব তারা দুই নহে—ধ্রুব তারা এক। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এক। সে আদর্শ আকাশের ন্যায় মুক্ত—তাহার সহিত সংকীর্ণতার, মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। সে আদর্শ একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রীতিস্থাপন এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন।

এই অকূল সংসার-সাগরে—অন্ধকার রাত্রে, এই সংকটাপন্ন স্থানে এবং সঙ্কটাপন্ন সময়ে, আমরা যদি স্ব-স্ব-প্রধান

হইয়া ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট বিচক্ষণ কাণ্ডারীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আপন আপন মনোমত পথে জাহাজ চালাইবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিতে থাকি, অথবা জাহাজ হইতে জালিবোটে ঝম্ফ প্রদান করিয়া যেখানে সেখানে ভ্রাম্যমান হইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের বিপদের আর অন্ত থাকিবে না। আমরা যখন দেখিতেছি যে, আমাদের ভক্তিভাজন নেতা এবং উপদেষ্টা সুপ্রণিহিত চিত্তে এবং ঈশ্বর-প্রীতিমূলক শুভ বুদ্ধির আলোকে ঈশ্বরাদিষ্ট সমাজ-সঙ্গঠন কার্য্যে তাঁহার এই ভগ্ন-শরীরের সমস্ত বলবীর্য্য নিঃশেষিত করিতেছেন; যখন দেখিতেছি যে, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের আশ্রয়ে একান্ত নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার প্রেমামৃতরসে জরা ব্যাধি রোগ শোক বিস্মৃত হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিস্তম্ভ পৃথিবী সমক্ষে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া, নির্ভীকচিত্তে স্বপদে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তখন আমাদের উচিত হয় যে, আমরা তাঁহার অভেদ্য বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াই এবং তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গল-কার্য্যে তাঁহাকে সাধ্যানুসারে সহায়তা করিতে যত্নবান্ হই। তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ-সহকৃত তাঁহার কল্যাণময় শুভাশীর্ব্বাদে কৃতপুণ্য হইব। তাঁহার এই শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ আমরা তাই সকলে মিলিয়া সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্তিভাজন পিতৃদেব শৈশব কালে যেমন আমাদের সুশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া, আমাদিগকে আপনার নয়নে নয়নে রাখিয়া সদ্বিদ্যা সদ্বুদ্ধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দিয়া মানুষ করিয়াছেন, তেমনি যে পর্য্যন্ত তরঙ্গাহত অর্ণবপোত এই আমাদের বৃহৎ পরিবার সমুদ্র-তরণে সুদৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত যেন তিনি স্বহস্তে জাহাজ চালনা করিয়া আমাদিগকে কূলাভিমুখে লইয়া যাইতে থাকেন এবং আমাদিগকে কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া, তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত পরম পিতার প্রসাদ-বারি-সিঞ্চিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বৃক্ষের অমৃত ফল সশরীরে আমাদের মধ্যে দর্শন করিয়া, পূর্ণ পরিণতাবস্থায় পূর্ণ মনোরথে চিরাভিলষিত অমৃত আনন্দধামে সমুত্থান করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর পরিবারস্থ সকলে পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবকে প্রণিপাত করিবার জন্য ত্রিতলে গমন করিলে তিনি তাঁহাদের সকলকে যে আশীর্ব্বাদ করেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি, অমৃতের নেতা, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে পালন করিবার পক্ষে তিনি তোমাদের সহায় হউন। সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর তোমাদের সদ্ভাব, সাধুভাব পোষণ করুন, জ্ঞান ধর্ম্মে তোমাদিগকে উন্নত করুন, তোমাদের কুলমর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, যশঃ কীর্ত্তি অক্ষত রাখুন এবং এখানে তোমাদিগকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়া লোকলোকান্তরে স্বর্গ হইতে স্বর্গ লোকে উন্নত করিয়া অবশেষে আপনার অমৃতানন্দ ক্রোড়ে স্থান দিয়া

মোক্ষপদ প্রদান করুন। এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

তোমাদের স্বস্তি হউক, শান্তি হউক ব্রহ্মপদ লাভ হউক।

পত্র।

(৫ই জ্যৈষ্ঠের বসুমতী হইতে উদ্ধৃত।)

মহাশয়, আপনি আপনার গত সপ্তাহের বসুমতী পত্রে কুচবিহারের রাজকুমারীর সহিত শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের বিবাহ প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার নেতা পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এ বিবাহে সম্মতি আছে অনুমান করিয়া বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত নহেন। আমি মহর্ষি দেবের বহু দিনের শিষ্য ও সেবক। দিনের অধিকাংশ সময় আমি তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। আমি তাঁহার মনের ভাব যতদূর জানি অপরের ততদূর জানিবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথের বিবাহ লইয়া যখন সংবাদ পত্রে আন্দোলন উঠিয়াছে, তখন আমি বাধ্য হইয়া আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, এই অসবর্ণ বিবাহে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বা তাঁহার পরিবারবর্গের কাহারও সহানুভূতি বা অনুমোদন নাই। অধিকন্তু ইহাতে মহর্ষিদেব অত্যধিক ব্যথিত। আমি এ বিষয়ে আর অধিক না বলিয়া জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল তাঁহার কর্ম্মস্থান হইতে গত ১৫ই এপ্রিল মহর্ষিকে যে পত্র লিখিয়াছেন এবং যাহা আমার নিকট সংরক্ষিত আছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, উহাতেই সাধারণে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

"কুচবিহারের মহারাজার কন্যার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছি বলিয়া মহাশয় আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। * * যদিও এই বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব আমি কলিকাতায় থাকিতেই উপস্থিত হয়, তথাপি আপনার নিকট যে তাহা জানাই নাই, তাহার কারণ এই যে, মহাশয় হিন্দু সমাজের সহিত যোগ রাখিবার মানসে বিবাহাদি সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে যেরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলাম। সুতরাং আমি জানিতাম যে এরূপ প্রস্তাবে আপনার পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভবও নহে, সুযুক্তিও নহে। * * সুতরাং আমার নিকট যখন এ প্রস্তাব উপস্থিত হইল এবং উল্লিখিত কারণে আপনার অনুমতি লওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইল না তখন অগত্যা আমার নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইল। * * সাধারণ অবশ্যই জানে যে আমি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, তাহা ছাড়া তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে আমার পরিবারের কেহই,-এমন কি আমার পিতা মাতাও এবিবাহের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতেছেন না, তখন তাহারা ইহার জন্য পরিবারের আর কাহাকে দায়ী করিতে পারিবে না। * * অবশ্য অতঃপর আমাদের পরিবারের সহিত সেরূপ ঘনিষ্ট সামাজিক বন্ধন রক্ষিত হইবার আমি আশা রাখি না, কারণ তাহাতে

কতৃক পরিমাণে পরিবারের ক্ষতির কারণ হইতে পারে।”

আদি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী,
কলিকাতা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৯, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৭৭৷৷৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৯৫৭৸৶০
সমষ্টি	...	১৩৩৫।৶০
ব্যয়	...	৪০০ ৵৯
স্থিত	...	৯৩৫।৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ্	
বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট	২৮৪।৵০
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট	
বিল এক কেতা	১৩৮৵৩
	৯২২৷৷৩
সমাজের ক্যাশে মজুত	১২৸০
	৯৩৫।৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১২৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১২৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৲
	১২৪৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বসু, কলিকাতা	১৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, ঐ	১৲
	২৲
পুস্তকালয় ...	৫৸৶০
যন্ত্রালয় ...	২৪৫৷৷০
গচ্ছিত ...	৵০
সমষ্টি	৩৭৭৷৷৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	১৯১।৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৬। ৬
পুস্তকালয় ...	৫০৸৶৩
যন্ত্রালয় ...	১২৯।০৶৯
সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক ...	১২৲
সমষ্টি	৪০০৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর সপ্তচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীপ্রিয়শঙ্কর মজুমদার।
সম্পাদক।

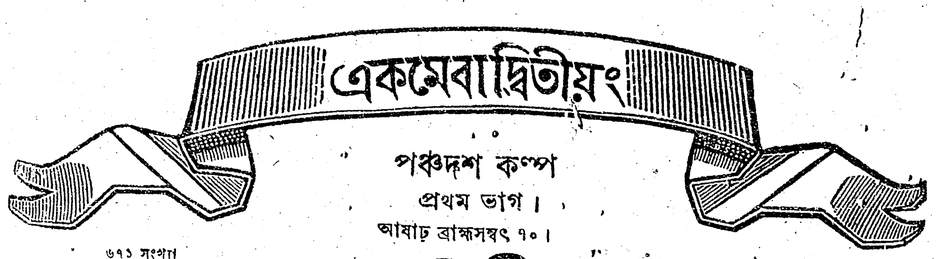

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭১ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপদেশ (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	৪১
কৃষ্ণাবতার (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	৪৩
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৫০
সংবাদ (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	৫১

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৬। কলিগতাব্দ ৫০০০। ১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প।
প্রথম ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৺৭১ সংখ্যা ১৭২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

অদ্য আমাদের সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার দিন—আত্মার আনন্দ ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার বিশেষ সময়। যিনি অন্তর্যামী ও পুণ্যপাপের সাক্ষী, যিনি কেবল মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে পাপে দণ্ডবিধান ও পুণ্যে পুরস্কৃত করিয়া উন্নতি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাইতেছেন; আমরা অদ্য বিশেষ ভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া ধন্য হইলাম।

"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং অধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।"

সেই এই পরমাত্মা সকল ভূতের অধিপতি এবং সকল ভূতের রাজা। যখন অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি যে, সেই দেবতা আমাদের সত্য সাধু ভাবের উপরে—আমাদের বিবেক ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের উপরে স্বীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের অন্তরের দেবতা, অধ্যাত্মরাজ্যের রাজা। সেখানে তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব প্রত্যক্ষ করি। যখন শরীর ও সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, বিষয়-বৈভব, মান-সম্ভ্রম ও পদ-বিত্ত গণনা করি তখন তাঁহারই অঙ্গলচ্ছায়া, তাঁহারই ঐশী শক্তি এখানকার রাজশক্তিতে প্রতিফলিত দেখি। এখানকার রাজশ্রীতে তাঁহারই রাজশ্রী প্রকাশিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। অন্তরের শাস্তা তিনি স্বয়ং, বাহিরে তাঁহার প্রতিনিধি রাজা বর্ত্তমান। "তস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে" তাঁহারই এই মহিমা দ্যুলোকে ও ভূলোকে। তাঁহার দণ্ড পুরস্কারে আমরা ধর্ম্মপথে স্থির থাকিয়া লোক হইতে লোকান্তরে পরলোকে উন্নত হইতেছি, বাহিরে তাঁহার প্রতিনিধি রাজার ন্যায়দণ্ডে ও পুরস্কারে শাসিত ও নিয়মিত হইয়া সকলপ্রকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতেছি। অন্তরে তাঁহার শাসন এবং বাহিরে রাজার শাসন-দণ্ডে তাঁহারই হস্ত। নিগূঢ় অনন্ত মঙ্গলের তিনি স্বয়ং যেমন কারণ, সেইরূপ তাঁহার প্রতিনিধি রাজা আমাদের সাংসারিক শান্তি বিরামের আয়তন। তিনি অজ আত্মা মহান্ প্রভু, আর তাঁহার প্রতিনিধি রাজা জরা মৃত্যুর অধীন মানব হইলেও তাঁহারই প্রসাদে

গরীয়ান্। সুতরাং এই রাজাও তাঁহার অধীনস্থ প্রজাবর্গের বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের আস্পদ।

সুখের বিষয় আমাদের বর্ত্তমান ভারতেশ্বরী মাননীয়া রাণী ভিক্টোরিয়া, যাঁহার অতুলনীয় শাসনে আমরা অনাপদ রাজ্যে বাস করিয়া শান্তি সুখ অনুভব করিতেছি, অদ্য তাঁহার জন্মদিন। অদ্য তিনি অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই শুভ দিনে, শুভ ব্রহ্মোপাসনার অমৃত মুহূর্ত্তে আইস আমরা সকলে মিলিয়া সেই রাজগণরাজা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, যে তিনি আমাদের জননীসদৃশা ভারতেশ্বরীকে আরো দীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া আমাদের উপরে তাঁহার মাতৃ-স্নেহ উজ্জ্বলতর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আরো নিকটবর্ত্তী করুন। আমাদের পরস্পরের প্রতি যে হিংসা দ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরমেশ্বর তাহা স্বীয় পবিত্র রশ্মিতে বিধৌত করিয়া রাজপ্রসাদের মধ্য দিয়া নির্ম্মল শান্তিতে সমস্ত রাজ্য সমাচ্ছাদিত করুন। রাজা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মানব সমাজের নিয়ন্তা, সেই রাজার প্রতি আমাদের হৃদয়ের ভক্তি অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত করুন।

প্রাচীন ভারত সমাজের নিয়ামক মহামুনি মনু যে সকল মর্ম্মী বাক্যে রাজাধিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছিলেন আমি তাহা আপনাদিগকে বিদিত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোবিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥"

জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে ব্যাকুল হয়, এই জন্য সমুদায় চরাচর রক্ষার্থে পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

"ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী॥"

ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন।

"যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥"

ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের অংশ বলিয়া রাজা তেজের আতিশয্যে সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

"তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং॥"

রাজা সূর্য্যের ন্যায় দর্শক লোকদিগের চক্ষু এবং মনকে উত্তপ্ত করেন—পৃথিবীতে কোন লোকই রাজাকে আভিমুখ্য ভাবে অবলোকন করিতে সক্ষম হয় না।

"সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥"

রাজা প্রতাপে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেন্দ্রর তুল্য হন।

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥"

রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যবোধে অবজ্ঞা করিবে না। যেহেতু তিনি মহান্ দেবতা মনুষ্য রূপে অবস্থান করিতেছেন।

"একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্॥"

যে ব্যক্তি অনবধান হইয়া অগ্নির অতি নিকট গমন করে, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, কিন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে সপরিবারে পশু ও দ্রব্য সম্পত্তির সহিত নষ্ট হইতে হয়।

"কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ॥"

প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ, স্বকীয় শক্তি এবং দেশকালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা ধর্ম্মানুরোধে নানা প্রকার রূপ ধারণ করেন।

"যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ॥"

যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয় লাভ হয় এবং যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, তিনি সর্ব্বতেজোময়।

রাজা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইলে আমাদের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হয়, রাজা দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইলে আমাদের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, রাজার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল ও রাজার সুখে আমাদের সুখ। রাজাই আমাদের সকল প্রকার উন্নতির নিয়ন্তা। অতএব অদ্য আমরা প্রাণ ভরিয়া সেই রাজার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তুমি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমাদের প্রভু, তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকলেরই প্রভু। তুমি এক হইয়া সর্ব্বভূতে গূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অসীম চরাচর শাসন করিতেছ এবং রাজার অন্তরে রাজধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছ। তুমি যেমন সাক্ষী হইয়া আমাদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করিতেছ, তেমনি কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া উপযুক্ত দণ্ডপুরস্কার বিধান দ্বারা আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছ। তুমি আমাদের রাজার হস্তকে সুদৃঢ় করিয়া এবং রাজনিয়মকে সকলের সুখকর রাখিয়া ভারতজননী ভারতেশ্বরীকে দীর্ঘজীবন প্রদান কর এবং আমাদিগের সকলকে সেই উন্নত রাজধর্ম্মের অনুরাগী ও অনুগামী রাখিয়া মাতা ভারতেশ্বরীর সহিত আমাদিগকে অনন্ত শান্তিতে উন্নীত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কৃষ্ণাবতার।

অষ্টম প্রস্তাব।

রাসলীলা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। অনেকে বলেন শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্য্যন্তও এদেশে বৈদেশিক বায়ু বহুমান ছিল। অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মে এমন অনেক নিদর্শন আছে, যাহা হইতে তাঁহার রোম ও গ্রীষের সহিত সম্বন্ধ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে ইউরোপীয় আর্য্যগণের সহিত তখনও ভারতীয় আর্য্যগণের আদান প্রদান সমস্তই চলিত। জাতিভেদের কাঠিন্য তখনও পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতে পারে নাই। কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চান যে শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই ইউরোপীয় সভ্যতার তদানীন্তন লীলাভূমি রোম বা গ্রীষের লোক; এবং ঐ মতের অনুকূলে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন—

১। পরস্ত্রীর সহিত অবিচ্ছেদে নৃত্যগীত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় যাহা দেখাইয়াছেন এদেশে উহার ঠিক প্রচলন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকে উহার অনুরাগী দেখিয়া তাঁহাকে রোমক বা গ্রীষীয় অনুমান করা যাইতে পারে। কেন না উহা বিলাতী নৃত্যের (ball dance) রূপান্তর মাত্র।

২। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মঠ প্রকৃতি, অর্থাৎ কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আর্য্যপ্রকৃতির প্রতিকূল; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া

অচল অটল ও নিষ্পন্দভাবে সমাধি-সাধনই ভারতের আদর্শ-শিক্ষা। তাঁহারা ভাবী জীবনের সুখভোগের প্রয়াসী, কিন্তু ঐহিক সুখ সম্পদের প্রতি উদাসীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে পৈতৃক রাজত্ব হইতে বঞ্চনা করিল, জতুগৃহ নির্ম্মাণে তাঁহাদের বিনাশ-সাধনে তৎপর হইল, দ্রৌপদীকে সর্ব্বজনসমক্ষে অবমাননা করিল, তাহাদিগকে বনবাস দিল, তথাপি ক্ষাত্রবীর্য্য প্রজ্জ্বলিত হইল না। অর্জ্জুন তখনও বলিতেছেন জ্ঞাতিবধ করিয়া রাজ্যপদ চাহিনা। অশেষবিঘ্ন নিগ্রহ সহ্য করিব তাহাও ভাল তথাপি জ্ঞাতিরক্তে ধরাগাত্র কলঙ্কিত করিতে পারিব না। এই ত ভারতীয় চরম শিক্ষা সাধন। কিন্তু একাকী কৃষ্ণ আসিয়াই পাণ্ডবদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ না থাকিলে কুরুপাণ্ডবদিগের ভীষণ যুদ্ধের অভিনয় কে শুনিতে পাইত। একমাত্র কর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবদিগকে কর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন; দেশী ও বিদেশীয় ভাবের মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। গীতার উপদেশে, ফলকামনাশূন্যতা যাহা খাঁটি এদেশের জিনিস তাহাও বজায় রহিল, এবং কার্য্যপরতা যাহা খাঁটি গ্রীষ ও রোমের বলি কেন সমগ্র ইউরোপের জিনিস তাহাও শ্রীকৃষ্ণ মিলাইয়া দিলেন। বলিতে কি শ্রীকৃষ্ণই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিলেন। ইহাই তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের বিজাতীয়ত্ব ও বিদেশীয়ত্বের অন্যতম প্রমাণ।

৩। স্থাপত্যের উন্নতি। শ্রীকৃষ্ণ বিদেশীয় আচার ও কর্ম্মানুরাগ এদেশে আনয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, শিল্পাদিও তাঁহার সাহায্যে এদেশে নবতরভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল; যুধিষ্ঠিরের রাজসভার নির্ম্মাণচাতুর্য্যই তাহার অন্যতম উদাহরণ। দুর্য্যোধন অবশ্য বিলাস ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, অথচ যখন তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রবেশ করিলেন, মর্ম্মর-চত্বরে তাঁহার জলভ্রম হইল, দ্বারদেশ ভাবিয়া যাই অদ্বার-গৃহে প্রবেশ করিবেন গৃহ-প্রাচীরে তাঁহার গতিরোধ হইল, মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। এ সমস্ত আর কিছুই নহে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আনীত রোম ও গ্রীষের শিল্প-কৌশল। সুতরাং ইহাও শ্রীকৃষ্ণের বিদেশীয়ত্বের আর একটি প্রমাণ।

৪। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় বসতি। দ্বারকা সমুদ্রকূলে ভারতের পশ্চিমতটে অবস্থিত; শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত অন্যান্য রোমীয় ও গ্রীষীয়গণের সহিত অর্ণবপোতযোগে ও বাণিজ্য ব্যপদেশে আসিয়া ঐ খানেই—ঐ অনার্য্য ভূমিতেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন, পরে পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কূটনীতি ও উদ্ভাবনী প্রতিভা তাঁহার ইউরোপীয় জন্ম ও শিক্ষা অনুসূচিত করে। বিদূরের সহিত কথোপকথনের সময় যুধিষ্ঠির যে ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করেন, উহার প্রচলন শ্রীকৃষ্ণের কেন বলি পাণ্ডবগণেরও বিদেশীয়ত্ব সম্বন্ধে সংশয় জন্মাইয়া দেয়। তাঁহাদের মতে ঐ ম্লেচ্ছভাষা রোমক বা গ্রীষীয় ভাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উল্লিখিত মতামত গ্রন্থাকারে বিধিবদ্ধ না হইলেও দুই চারি জন প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি। সহসা শুনিলে

তাঁহাদের মতে সার আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে উহা তাদৃশ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। উহার প্রতিকূল যুক্তি নিম্নে প্রদর্শিত হইল, মীমাংসা অবশ্য পাঠকের হস্তে।

১। হরিবংশের হল্লীষ যে বালিকাদিগের সহিত সংঘটিত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহারা পরস্ত্রী না হইলেও বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে ঐ বলিয়াই পরিচিত। ভাবী জীবনে শ্রীকৃষ্ণ কখন ঐরূপ উদ্দাম নৃত্যে যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভাগবতে বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার অনুমাত্র উল্লেখ নাই। এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যোচিত নৃত্যগীত তাঁহার বিদেশীয়ত্বের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। অন্য পক্ষে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণকে প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া ধরিলে তিনিত আশৈশব গোপগণের মধ্যে পরিপালিত, এরূপ অবস্থায় তাঁহার ইউরোপীয় শিক্ষা লাভের অবসর কোথায়। তবে যদি কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বাল্যে ঘটে নাই যৌবনে ঘটিয়াছিল, তাঁহার অন্যান্য বাল্যলীলা অলীক হইতে পারে, কিন্তু রাসলীলা প্রামাণ্য ঘটনা, তবে হয়ত অনেককে বলিতে হয় "গরজ বড় বালাই।"

২। শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম্মঠ প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহা অপেক্ষা এ বিষয়ে বড় কম ছিলেন না। কেনা জানেন তিনি পাণ্ডবগণকে প্রবঞ্চিত ও হতবীর্য্য করিবার জন্য একদণ্ডও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অক্ষক্রীড়া জতু-গৃহ-দাহ, পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন, কর্ণ ও ভীষ্মকে স্বীয় পক্ষে আনয়ন এ সমস্তই তাঁহার কর্ম্মঠ প্রকৃতির পরিচায়ক। তাঁহারই কৌশলে পাণ্ডবেরা সিংহসম তেজস্বী হইয়াও বাগুরাবদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কার্য্যোপায়ে ও কূটমন্ত্রণায় কোন অংশে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা হীন নহেন। তবে শ্রীকৃষ্ণে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও জ্ঞানের প্রাখর্য্য ছিল, শরীরেও অমানুষিক বল ছিল। পাণ্ডবগণকে যে উদাসীন ও নির্ব্বীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা প্রতিজ্ঞারক্ষণশীলতা ও জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাপালনই তাহার কারণ, কর্ম্মঠ প্রকৃতির অভাব বশত নহে।

৩। যুধিষ্ঠিরের রাজসভা ময়দানব কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়; তাহাতে কৃষ্ণের হস্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও বিশেষ সন্দেহের বিষয়। কিন্তু সর্ব্ববিধ শিল্পবিদ্যা জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-বোধ সাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণেও তাহার অল্পতা ছিল না। আর একটি কথা এই যে রোম ও গ্রীষ সাম্রাজ্যের পত্তন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে, সুতরাং সভ্যতা ও শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার উহার আরও পরে। ইহা ত গেল ইতিহাসের কথা কিন্তু, মহাভারতকে যতই আধুনিক ধরিয়া লওয়া হউক না, উহা যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে সংরচিত হয়, তাহা বোধ হয় কেহ সাহস করিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় তদানীন্তন কালের ভারতীয় শিল্পকে পাশ্চাত্য-জগতের নিকট অকারণ ঋণী করিবার কারণ দেখা যায় না।

৪। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বসতি করিতেন বটে, কিন্তু দ্বারকা অনার্য্যভূমি বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ নাই। অধিকন্তু ক্ষত্রিয়েরা দূর দূরান্তরে গিয়া বীর্য্যবলে রাজ্যস্থাপন করিতেন, পরে তত্তৎদেশ অনার্য্যভূমি বলিয়া কথিত হইত না। সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা করিবার কারণ কোথায়?

যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিতেন ইহা সত্য হইলে তাহাও যে রোম ও গ্রীষের ভাষা, এরূপ কোন অর্থ নাই। মহাভারতের সময়ে আর্য্যেরা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাজ্যশাসন-শৃঙ্খলা তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন পাশব বল যে তাঁহাদের সম্বল ছিল না, মহাভারতে তাহার ভূয়োভূয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কূটনীতি যাহার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ চলিতেছে, মহাভারতের ভিতরেও তাহার কতক কতক পরিচয় আছে। এরূপ অবস্থায় পাণ্ডবগণ যাহাকে ইংরাজিতে code system বলে তদপেক্ষা সহজ উপায়ে অপরের অবোধ্য ভাষায় গুপ্ত মন্ত্রণা চালাইবেন এবং তাঁহাদের যে সামর্থ্য ছিল, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ কি। পূর্ব্বপক্ষ কৃষ্ণের বংশী বিলাতী flute বলিতে চাহিলেও তাঁহার কৃষ্ণ-বর্ণত্ব খণ্ডন করিতে চাহেন নাই, সুতরাং আমরাও নীরব রহিলাম।

সে যাহা হউক ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ে রাসলীলা শেষ হইয়া গেল। ৩৪ শ অধ্যায়ে সুদর্শন-মোচন এবং শঙ্খচূড়বধ এবং ৩৫শ অধ্যায়ে গোপবালাদিগের সন্তাপ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৬শ অধ্যায়ে কৃষ্ণভয়ে ভীত কংসের মন্ত্রণা। বলিতে গেলে এই ৩৫ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। ইহার পরে তাঁহাকে কংসানুচর ও কংসবধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

কৃষ্ণ গোচারণে বহির্গত হইয়াছেন, বিরহতপ্তা গোপীগণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছে—

মণিধরঃ ক্বচিদাগনয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র।
ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ
গুণগুণার্ণমনুগম্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ।
৩৫ অধ্যায়। ১০ শ্লোক।

ইহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণ গাভী গণনা জন্য স্ফটিকমালা এবং সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট তুলসীমালা ধারণ করিয়া যখন প্রিয় অনুজের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া গান করেন, তখন সেই বেণুরবে মোহিতচিত্ত কৃষ্ণসারপত্নী হরিনীগণ গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আইসে; বুঝি আমাদিগের (গোপীদিগের) ন্যায় তাহারাও গৃহাশা পরিত্যাগ করিয়াছে।

এই শ্লোকটির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যত আছেই, কিন্তু টীকাকার বলিতে চাহেন যে শ্রীকৃষ্ণ গলধৃত মালার সাহায্যে গাভীগণনা করিতেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন

"মণিধরঃ গোগণসংখ্যানমণিমালাধরঃ শুক্লরক্ত শ্যামপীতানাং চতুর্ণাং বর্ণানাং প্রত্যেকং পঞ্চবিংশতি প্রভেদৈঃ শতং বর্ণা ভবন্তি * * ততশ্চ তত্তদ্বর্ণাকারৈরষ্টোত্তরশতমণিগোলকৈঃ গোগণনার্থং কৃষ্ণেন গোজপমালৈকা কৃতাস্তি তাং মালাং গৃহীত্বৈবাসঙ্খ্যানামপি গবামষ্টোত্তরশতং যূথান্ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণান্ গণয়তি" * * * বনাৎগোষ্ঠগমনসময়ে কাশ্চনাপি গাবো বিস্মৃতামাভেয়ুরিতোঽকৈকমণিগোলকাবর্ত্তনেন গা গণয়ন দয়িতগন্ধা তুলসী তস্যা মালয়া সহ বর্ত্তমানঃ * *।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে কয়েকটি গাভী লইয়া বাহির হইতেন, গোষ্ঠে প্রত্যাগমনকালীন তাহাদিগকে গলধৃত মণিমালা সাহায্যে গণিয়া লইতেন। মণিমালায় গাভীগণসংখ্যক বিভিন্ন বর্ণের মণি থাকিত, তাহাতে গাভীগণনার সুবিধা হইত। শ্রীধরস্বামী বৈষ্ণবতোষিণীও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কেন যে মণিমালা ধারণ করিতেন তাহার অর্থত বুঝা গেল, কিন্তু তিনি কেন তুলসী মালা ধারণ করিতেন, টীকাকারগণ তাহা খুলিলেন না। তবে দয়িতগন্ধ তুলসীর এই বিশেষণ আছে। আমাদের মনে হয়, মণিমালা শ্রীকৃষ্ণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যবহার করিতেন এবং প্রিয়গন্ধ তুলসীমালার সাহায্যে গাভীগণনা করিতেন এরূপ অর্থ করিলে আরও একটু সঙ্গত হয়। অর্থাৎ, আমরা এই ভাবে অন্বয় করিতে চাই

"মণিধরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ মলয়া গা আগণয়ন।"

অর্থাৎ উপলক্ষণে মালা শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি না দিয়া ও মণিধর শব্দের দূরার্থ বাহির করিবার চেষ্টা না পাইয়া তুলসী মালার সাহায্যে গাভীগণনা হইত বলিলেই ঠিক হয় এবং তুলসীমালাই বল আর রুদ্রাক্ষমালাই বল তাহা যে চিরকালই গণনা কার্য্যের সহায়তা করে এ ভাবও বজায় থাকে। পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া যে অর্থ সংলগ্ন হয় গ্রহণ করিবেন আমাদের আপত্তি নাই।

প্রসঙ্গত তুলসী মালা ও বৃক্ষের উপর সাধারণের শ্রদ্ধার মূল কি এখানে সে কথা উঠিতে পারে। এ কথার ঠিক উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে তুলসীপত্রের যে স্বাভাবিক একটি সুগন্ধ আছে, তাহা সকলেই জানেন। ভাগবৎকারও "দয়িতগন্ধ" তুলসীর এই বিশেষণ দিতেছেন। দয়িতগন্ধ অর্থ প্রিয় বা মনোরমগন্ধবিশিষ্ট। রাজনির্ঘণ্ট বলিতেছেন

"সামান্যতুলস্যাঃ গুণাঃ কটুত্বং তিক্তত্বং উষ্ণত্বং সুরভিত্বং শ্লেষ্মাবাতজন্তুভূতকৃমিবান্তিনাশিত্বং রুচিকারিত্বঞ্চ"।

অর্থাৎ সামান্য তুলসীর গুণ কটুত্ব তিক্তত্ব উষ্ণত্ব সুগন্ধিত্ব শ্লেষ্মাবাতনাশিত্ব ক্রিমিনাশিত্ব রুচিকারিত্ব ইত্যাদি। তুলসীর লাটিন নাম Ocymun villosum or sanctum। ইংরাজি ভৈষজ্য শাস্ত্রে বলে তুলসী-মূলের কাথ জ্বর রোগে, পত্ররস বালকদিগের শ্লেষ্মায় চূর্ণের জলের সহিত ত্বক্ রোগে, শুষ্কপত্রচূর্ণের নস্য পীনস রোগে প্রযোজ্য; কীটবিনাশেও তুলসীর বিশেষ উপযোগিতা আছে; এতদ্ভিন্ন সমুদয় বৃক্ষে বেশ একটি সুগন্ধ আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার তুলসীবৃক্ষ সম্বন্ধে সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য গল্প রচনা করিয়া বলিতে চাহেন যে তুলসী নামে কৃষ্ণের এক গোপিনী ছিলেন। রাধিকা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে দেখিয়া অভিশাপ দেন; সেই পর্য্যন্তই তুলসী বৃক্ষযোনি প্রাপ্তা। পদ্মপুরাণ বলেন তুলসীবৃক্ষের রোপণ ও উহাতে জলসেক পুণ্যের কারণ। বায়ু যতদূর তুলসীগন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হয়, দশদিক ততদূর পর্য্যন্ত পবিত্র হয় ইত্যাদি। মূলে আছে

রোপিতা সেবিতা নিত্যং পাপং হন্তি যুগার্জ্জিতং।
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তৃতং।
তাবৎ যুগসহস্রাণি তনোতি সুকৃতং হরিঃ।
তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ
দিশো দশ পুনত্যাশু ভূতগ্রামাংশ্চতুর্ব্বিধান।
রোপণাৎ পালনাৎ সেবাদ্দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাং
তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতং।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, তুলসী বৃক্ষ যাহাতে সমধিক পরিমাণে রোপিত হয়, শাস্ত্রকারের তাহারই দিকে দৃষ্টি রহিল; তুলসী বৃক্ষের সুগন্ধে যে চারিদিক আমোদিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ুশোধিত ও দুর্গন্ধ বিদূরিত হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রে একজাতীয় বৃক্ষ আছে যাহার পত্রের গন্ধ সুরভি কুসুমের ন্যায়; তুলসী সেই জাতীয় হওয়াও বিচিত্র নহে। এই সকল কারণেই তুলসী প্রতি হিন্দুগৃহের চত্বরে দেবমন্দিরের চারিধারে রোপিত হইয়া থাকে। এমন কি শাক্তেরাও তুলসীর সম্বন্ধ একেবারে

পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইহাত গেল তুলসী বৃক্ষের কথা। তুলসীর মালার দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য, বোধ হয় উহার বহুল ব্যবহারের অন্যতম কারণ। গণনা করিবার জন্য যে তুলসী মালার প্রয়োজনীয়তা আছে, মালাজপ তাহার জাজ্বল্যতর প্রমাণ। তাহার উপরে পৌরাণিক অনুশাসন ইতিহাস ও ফলশ্রুতি তুলসীকে বৈষ্ণব সাধারণের বিশেষ অনুরাগের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। যে দেশের লোকের কৃতজ্ঞতার সীমা মনুষ্যসমাজ ও জীবরাজ্য বলি কেন উদ্ভিদ্‌রাজ্য—জড়জগৎ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে, সে দেশের লোকে গাভীকে 'ভগবতী বলিয়া পূজা করিবে, কল্যাণদাত্রী তুলসীকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিবে, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। ফলত ইহা মৈত্রীসাধনের অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা হইতে দাঁড়াইতেছে যে এদেশীয় জন-সমাজের প্রথম অবস্থায় তুলসী মালা কেবল গণনার অবলম্বন রূপে পরবর্ত্তী সময়ে ঈশ্বরের নাম জপ জন্য এবং অধুনাতন-কালে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে খ্রীষ্ট-সমাজের মধ্যে রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাজক মণ্ডলী এখন পর্য্যন্তও একপ্রকার মালার সাহায্যে ঈশ্বরের নাম জপ করেন। মুসলমানেরা স্ফাটিকমালার সাহায্যে ঈশ্বরের নাম লয়েন। চীনদেশের সাধারণ লোকেরা ধাতুময় তার সংলগ্ন বীজে (beads) অদ্যাপিও মোটামোটি গণনা কার্য্য অবাধে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কাগজ পেনসিলের বড় আবশ্যক হয় না।

হিন্দোলযাত্রা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি বিশেষ উৎসব। সচরাচর ইহাকে দোলযাত্রা বলে। কিন্তু মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতের মধ্যে এই হিন্দোলযাত্রার বড় উল্লেখ নাই। অথচ ইহার প্রচলন এদেশের মধ্যে এত অধিক। ফল্গু উৎসব যাহাকে ফাগ খেলা বলে তাহা হিন্দোলযাত্রার এক অঙ্গ হইলেও তাহার কোন সন্ধান পূর্ব্বোক্ত পুস্তকত্রয়ে দুষ্প্রাপ্য। সংস্কৃত নাটকাদিতে ফাগ খেলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ফাগ-খেলার উপর কেমন করিয়া অনুরাগী হইলেন তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হিন্দু সাধারণের মধ্যে সনাতন হইলেও প্রচলিত নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সনাতন বলিয়া বড় বেশী দাবী করিতে পারেন না।

এইবারে রাসলীলা সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ঐতিহাসিক ভিত্তি বড়ই দুর্ব্বল। উহার বর্ণনা এতই অস্বাভাবিক যে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বড় কেহ অগ্রসর হয়েন না। তবে এই সকল অদ্ভুত ঘটনা যাহা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যে আরোপিত তাহাদের একটুকু মূল্য আছে। সে আর কিছুই নহে সাধারণের চক্ষে তাঁহার অবতারত্ব স্থাপন। আমরা "রামাবতারের অভিব্যক্তি" নামক প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, যে রাম ও কৃষ্ণে অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাদের মুখ হইতে সত্য নির্ঘোষিত করিলে সাধারণের চক্ষে সেই সত্যের একটা স্বতন্ত্র বল পৌঁছায়। যাঁহারা গীতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য

করিয়া থাকিবেন যে পাঠকের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সত্যকে দৃঢ় মুদ্রিত করিবার জন্য তিনি যেমন লালায়িত, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করিবার জন্য তেমনই বদ্ধ-পরিকর। গীতাকার অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াছিলেন সত্যের প্রবক্তাকে ঈশ্বর দাঁড় করাইতে না পারিলে তাঁহার মুখ-বিনির্গত সত্যে জনসাধারণের সেরূপ আস্থা পৌঁছিতে পারে না। এই কারণে বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত ও গীতার কৃষ্ণ, খাঁটি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক; অধ্যাত্মরামায়ণের রামচন্দ্র বাল্মীকিরামায়ণের রামচন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অবশ্য আজকালকার দিনে অনেকে গীতাকার ও অধ্যাত্মরামায়ণকারকে ঈদৃশ পথাবলম্বন জন্য দোষ দিতে পারেন, কিন্তু দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্ররচনা করিতে হইয়াছে।

ভাগবতের রাসলীলা যে বয়সে শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত তাহাতে সমস্ত ঘটনাকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পাঠকবর্গকে আমরা আবার স্মরণ করিয়া দিতে চাই যে হরিবংশের হল্লীষ ক্রীড়ার উপর রঙ্গ ফলাইয়া বিষ্ণুপুরাণকার নিজ গ্রন্থের রাসলীলা রচনা করিয়াছেন এবং ভাগবতকার তাহার উপরে আবার অঙ্গরাগ চড়াইয়া রাসপঞ্চাধ্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা রাসলীলার এই ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছি। এদেশের সংস্কৃত কবিই বল আর শাস্ত্রকারই বল রসালাপের অবসর পাইলে সহজে তাহা ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। ভাগবতকার এখানে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার্য্য ও বাল্যবয়স ভুলিয়া গেলেন। উপনিষদের ঈশ্বর "পতিং পতীনাং" "রসোবৈ সঃ" পতি হইতে ও শ্রেষ্ঠ, তিনি রসস্বরূপ প্রাণারাম, তাঁহার সহবাসানন্দের সহিত আর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না, ভাগবতকার ও বিষ্ণুপুরাণকারের মস্তকে এই ভাবটী যেন ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব স্থাপনের চেষ্টা অন্যদিকে তাঁহার জীবনের অপর অংশে রাসলীলার ন্যায় নূতন ঘটনা সংযোজনের অসুবিধা, পক্ষান্তরে কৃষ্ণের জীবনে মধুর ভাব বিকাশ করিবার জন্য শাস্ত্রকারের হস্ত কণ্ডূয়ন, এ সমস্ত যুগপৎ মিলিত হইয়া রাসের বর্ণনায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যত্বের দিক আছে, দেবত্বেরও দিক আছে। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রেমে মিলিত গোপীদিগের বিহারে অল্পাধিক ইন্দ্রিয়সম্বন্ধের বর্ণনা অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাই বুঝি ভাগবতের ও বিষ্ণুপুরাণের গোপীকারা মদালসা অভিসারবিনির্গতা লজ্জাভরণ-রহিতা চঞ্চলতামুপাগতা। কালভেদে রুচিভেদ হয় ইহা স্বীকার করিলেও ভাগবতাদির রাসলীলাচিত্রে আলোক ছায়ার সামঞ্জস্য যে সর্ব্বথা রক্ষিত হয় নাই ইহা এক প্রকার স্বীকার্য্য।

ভাগবতের রাস-পরিচ্ছেদের গূঢ়মর্ম্ম অনুভব করিবার দোষে বিদেশীয়গণ আমাদিগকে ত নিন্দা করিবেন, কিন্তু আমরা দোষক্ষালনের জন্য সেরূপ আয়াস পাই নাই। স্বকীয় পরকীয় প্রেমের যুক্তি অর্থাৎ পরপুরুষের উপর স্ত্রীর যে প্রেম তাহাতে মত্ততা ও আত্মবিস্মৃতি আছে সুতরাং তাহাকে আদর্শ করিয়া সেইরূপ আত্যন্তিক অনুরক্তি বা প্রেমের সহিত সাধনা না করিলে ঈশ্বর মিলে না এরূপ যুক্তির অবতারণা আমাদের বিবেচনায় রাসলীলার কলুষিত ভাবকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে এবং সাধন প্রকরণ আরও দুরভিগম্য হইয়া দাঁড়া-

ইয়াছে। কেহবা রাসলীলা পড়িয়া তদানীন্তন কালে এদেশে বিলাতী (বল ডান্‌সের) উদ্দাম নৃত্যের স্বপ্ন দেখেন, কেহবা রোমগ্রীষের সংস্পর্শ বুঝেন। আমরা বলি বই কয়েকখানা স্থিরভাবে ও সহিষ্ণুতা সহকারে নিজে পড়িলে এরূপ প্রলাপ বকিবার সম্ভাবনা কমিয়া আইসে। ঈশ্বরের মধুর ভাবই রাসে বর্ণনীয় ও আলোচ্য। তবে এইরূপ স্থূল বর্ণনায় যে অনেক আশঙ্কা আছে তাহা বলা বাহুল্য। বলিতে কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের মধ্যে এখনও রাস সম্বন্ধে চক্ষুর ঘোর কাটিতেছে না, একেবারে যে কাটিবে সে আশা অতি অল্প।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

তাহার পরে তাঁহাদের মধ্য হইতে এক এক সময়ে এক এক দল যাত্রী বাহির হইয়া ব্রহ্মতেজের প্রভাব দূরে দূরে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে নানা স্থানে বিকীর্ণ নানা প্রতাপান্বিত রাজবংশের সহিত মেলা মেশা আরম্ভ করিলেন।

অনতিপরে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয়-বীর্য্যের সংঘর্ষে বৈরিতা'র ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তার সাক্ষী—বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সময়েই বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" ধিক বল ক্ষত্রিয়বল—ব্রহ্মতেজ মহদ্‌বল! পরশুরামের তো কথাই নাই—পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাহার পরে ইংলণ্ডের ত্রেতাযুগে সাক্সন এবং নর্ম্মান নামক দুই বিভিন্ন জাতি একত্রে বাস করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল—ভারতবর্ষের ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কালে তাহাই ঘটিল। ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয়-বীর্য্যের মধ্যে প্রথমে যেরূপ সর্পনকুলের সম্বন্ধ বিষদাঁত বাহির করিয়াছিল—কালের মার্জ্জন-ঘর্ষণে তাহা সমূলে অপনীত হইয়া গিয়া তাহার স্থানে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ প্রাদুর্ভূত হইল। একই রাজকীয় শরীরে ব্রাহ্মণ হইলেন মস্তক—ক্ষত্রিয় হইলেন বাহুদ্বয়।

পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটি মুখ্য সন্ধিক্ষণে তিন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর, তিনজনই ব্রাহ্মণাধিপত্যকে স্ব স্ব কালোচিত বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

প্রথম সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে—ঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিতেছেন। এই সময়ে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, কে কাহার উপর আধিপত্য করিবে, এইরূপ এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল, তখন পরশুরাম পরশুর একুশ আঘাতে সেই সমস্যাটির জটিল গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, পরশুরাম ব্রাহ্মণাধিপত্যের সংস্থাপনকর্ত্তা।

দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে—ব্রাহ্মণেরা যখন আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উপচিয়া উঠিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন। এই সময়ে রামচন্দ্র রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্রাণ করিলেন; আর, কিয়ৎকাল পরে বানরাকৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের সাহায্যে রাক্ষস জাতির উচ্ছেদ-কার্য্য সমাধা করিয়া, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণাধিপত্যের মূল পত্তন করিলেন। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, রামচন্দ্র ব্রাহ্মণাধিপত্যের রক্ষাকর্ত্তা এবং বিস্তারকর্ত্তা।

তৃতীয় সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে—ইংলণ্ডের দ্বাপর যুগে ইংলণ্ড যেমন শ্বেত পাটলি এবং রক্ত পাটলি (white rose এবং red rose) এই দুই বিরোধী পক্ষের কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারে তোলপাড় হইয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তেমনি ভারতের দ্বাপর যুগে যে সময়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মহা ভীষণ প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়। এই সময়ে ক্ষত্রিয় বীর্য্যের প্রখর উদ্যমে ব্রহ্মতেজ রাহুগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় ক্ষত্রিয়-বীরদিগের তো কথাই নাই—দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ-চূড়ামণিরাও শাস্ত্রকে হেয়জ্ঞান করিয়া শস্ত্রকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন; আর, সেই সকল মহতের দৃষ্টান্ত চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে জনসাধারণের মনোমধ্যে এইরূপ একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, বাহুবলই বল; তা বই, বুদ্ধিবলও কোনো কার্য্যের নহে, শাস্ত্রবলও কোনো কার্য্যের নহে, ধর্ম্মবলও কোনো কার্য্যের নহে। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ পূতনা বকাসুর প্রভৃতি শত্রুদিগের দলবল বুদ্ধি-কৌশলে নিহত করিয়া বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবলের বিশিষ্টরূপ চমৎকারিতা এবং ফলদায়কতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন; দ্বিতীয়তঃ, যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহুবল অপেক্ষা ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিলেন; তৃতীয়তঃ আপন ক্ষত্রিয়-বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন ধারণ করিয়া শস্ত্রবলের উপরে শাস্ত্রবলের প্রাধান্য আপনাতে মূর্ত্তিমান্ করিলেন। যে সময়ে সরযূ এবং গঙ্গা নদীর সমীপবর্ত্তী বিশিষ্টরূপ উর্ব্বরা প্রদেশ সমূহে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়া চুকিয়া যমুনা-নদীর তটোপান্তে মথুরা গোকুল বৃন্দাবন প্রভৃতি নগর-গ্রাম পল্লীর সবে মাত্র পত্তন হইয়াছে; যে সময়ে মথুরা বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল কালীয় পূতনা বকাসুর প্রভৃতি নাগ রাক্ষস এবং অসুর জাতিদিগের আবাসভূমি ছিল; যে সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রজপল্লী রাখাল-গণেরই বসতি ছিল (কৃষি-কার্য্যে অনুরাগী ছিলেন, সেখানে, একা কেবল বলরাম); যে সময়ে কংশ রাজা যামুন্য প্রদেশের অব্রহ্মণ্যতার আড়ালে আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্মশাসন অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেই সময়ের অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলতার মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা নগর হইতে পলাইয়া গিয়া গোকুল গ্রামে নন্দালয়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন সেই অবরোধবিহীন রাখাল-পল্লীতে যে, তাঁহার কৈশোর লীলা আর্য্য ধর্ম্ম-শাসনের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সব রাখালেরা যাহা করিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিতেন—দোলের সময় দোলে, ঝুলনের সময় ঝুলনে, রাস-লীলার সময় রাসলীলায় মাতিতেন। তাহাতে আবার, ইংলণ্ডীয় কোন নাচের মজ্‌লিসে যুবরাজ উপস্থিত থাকিলে, তিনি যেমন নাট-মন্দিরের সমস্ত সমাদর এবং সম্মান একচেটিয়া করেন—রাখালদিগের নাচের মজ্‌লিসে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ক্ষত্রিয়-বংশীয় রূপবান্ এবং গুণবান বীরপুরুষ যে, সেই-

রূপ একাধিপত্য করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যৌবন-সুলভ কুহক-পাশে জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে পাশে তিনি যে অধিক কাল বাঁধা থাকিবেন—তাঁহার অন্তরের প্রকৃতি সেরূপ ছাঁচে গঠিত ছিল না—বিলাসিতার ছাঁচে গঠিত ছিল না। তাঁহার অন্তরের প্রকৃতি যে, যশস্বী মহাপুরুষদিগের ছাঁচে গঠিত ছিল—সমগ্র মহাভারত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই কালীয়-নাগকে (অর্থাৎ সর্পের উপাসক কোন বলবান্ অনার্য্য জাতিকে) দমন করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; এবং কংশের টুঁয়াইয়া দেওয়া পূতনা নামক রাক্ষসীর এবং বক নামক অসুরের দলবল কলে কৌশলে নিহত করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বকাসুরের চঞ্চু বিস্ফারিত করা এবং জরাসন্ধকে দুই চির করিয়া বিভক্ত করা—দুইই, আর কিছু না, ইংরাজীতে যাহাকে বলে শত্রুর রাজ্যকে দুই বিরোধী Partyতে split করা এবং আমাদের দেশের রাজনীতি-শাস্ত্রে যাহাকে বলে ভেদ উৎপাদন করা। বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা যেমন প্রথম নেপোলিয়নের চরিত্র সম্বন্ধে নানা-প্রকার দুর্নাম রটাইয়া তাঁহার সহিত সমস্ত ইউরোপের মনান্তর ঘটাইয়াছিলেন এবং তাহার পরে তাঁহার উপরে ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়াছিলেন, ঠিক্ সেরূপ না হউক্—কতকটা তাহার অনুরূপ কোন না কোন প্রকার নীতি-কৌশলের সাহায্যে জরাসন্ধ এবং বকাসুরকে বধ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল শত্রুদমন কার্য্য অসামান্য নিপুণতার সহিত সুনির্ব্বাহ করাতে তাঁহার যশোরশ্মি দিগ্‌দিগন্তরে ছট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল; আর, সেই সূত্রে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের বীরপুরুষদিগের মধ্যে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শত সহস্র অভ্যাগত ব্রাহ্মণের চরণ-প্রক্ষালনের সঙ্গে সঙ্গে—ব্রাহ্মণের নিকট অবনতি স্বীকারের নিন্দনীয়তা কলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মণ্য-দেবের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেবের মৃতপ্রায় শরীরে নব জীবন সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে এ কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া আনিবার কর্ত্তা। বৃদ্ধ ব্রহ্মণ্যদেব অমন এক জন মহাপ্রতাপশালী অভিভাবকের হস্তাবলম্বন পাইয়াছিলেন বলিয়া এখনও তাই তাঁহার চলা বন্ধ হয় নাই—এখনও তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্যযুগের শেষ ভাগে পরশুরাম, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

সংবাদ।

মহাবোধি সভার মহোৎসব।

বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতা নগরস্থ মহাবোধি সভার মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ সূচিত করিবার নিমিত্ত তৎপূর্ব্ব ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতঃকালে এই মহাবোধি সভার নেতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক অনাগরিক এইচ ধর্ম্মপাল মহাশয় আমাদের পূজ্যপাদ ব্রাহ্মসমাজ-গুরু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

নিকট সমাগত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ শাস্ত্রান্তর্গত "রত্ন সুত্তং" নামক গাথা তাঁহার সমীপে পাঠ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহর্ষি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন ধর্ম্মপাল হস্ত প্রক্ষালন করিলেন এবং এক খণ্ড সূত্রের একপ্রান্ত স্বয়ং ধারণ করিয়া অন্য প্রান্ত মহর্ষি দেবকে ধরিতে দিলেন। মহর্ষি এই সূত্র ধরিয়া বলিলেন যে, "ইহা আমি হস্তে ধারণ করিব কেন? ইহা আমি বক্ষে ধারণ করিতেছি। এই সূত্রযোগে তোমার গাথা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।" তিনি এই কথা বলিয়া সেই সূত্রান্তভাগ নিজ বক্ষে স্থাপিত করিয়া ধারণ করিলেন এবং ধর্ম্মপাল ভক্তিবিনম্র বিশুদ্ধ চিত্তে ও তাঁহার স্বাভাবিক কোমল মিষ্ট স্বরে সেই গাথা পাঠ করিলেন। ধর্ম্মপালের গাথা পাঠ শেষ হইলে মহর্ষিদেব একটি সুপক্ব সুমিষ্ট আম্র ফল তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপাল এই আম্র হস্তে ধারণ করিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন যে, "আমি এই আম প্রথমে বুদ্ধদেবকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন করিব।"

ধর্ম্মপাল আর একটি শ্লোক পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে বুদ্ধদেব সমাধি অন্তে বোধি বৃক্ষ মূল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার জন্য আর গৃহ নির্ম্মাণ করিও না। আমাকে আর শরীর ধারণ করিতে হইবে না। এই যে মৃত্যুর মুখে আসিয়া পঁহুছিয়াছি এই মৃত্যু অতিক্রম করিলে আর আমাকে কখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে না।" মহর্ষি বলিলেন যে, "বুদ্ধদেব কেবল আপনারই উপরে নির্ভর করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর গতি নাই। মৃত্যু হইতে অমৃতেতে তিনি আমাদের নেতা। তিনি এখনি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রাণ দিয়া প্রাণের আরাম হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। তিনি আমাদের প্রাণেতে, মনেতে, আত্মাতে—তিনি আমাদের সমুদায় শরীরে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষণমাত্র তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করি। তাঁহার সাধনাতেই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করি, আমাদের মুক্তি হয়। নিত্যকাল তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকি। ইহাই বেদের উপদেশ, ইহাতেই আমাদের শ্রদ্ধা, ইহাতেই আমাদের বিশ্বাস। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মহাবোধি সভার উৎসব-প্রণালীটি কিরূপ সুভাব ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা সেই নিয়মাবলী ও সানুবাদ সেই, "রত্ন সূত্তটি" নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

২৫এ মে (১২ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার বৈশাখী পূর্ণিমা, ভগবান্ মহামুনি গৌতম বুদ্ধ এই দিবসে জন্ম পরিগ্রহ করেন ও বোধিস্বত্ত্ব প্রাপ্ত ও পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত আর্য্য সন্তান এই পবিত্র দিনে প্রত্যূষে ৪ টার সময় শয্যা ত্যাগ করতঃ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া শুভ্রবাস ও প্রসূনপাণি হইয়া এক নিভৃত স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক জগতের মঙ্গল ও শান্তির কামনা করিবেন। তাঁহারা সকলে সংকল্প করিবেন যে,—

(১) জীব হত্যা করিবেক না;

(২) চুরি করিবেক না ;

(৩) ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবেক না ;

(৪) মিথ্যা কুৎসা ও কটু বাক্য হইতে বিরত থাকিবেক ;

(৫) মাদক সেবন করিবেক না ;

(৬) বেলা দ্বিপ্রহর হইতে পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আহার করিবেক না ;

(৭) নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিবেক ;

(৮) সুন্দর বিলাস শয্যায় শয়ন করিবেক না। এবং নিদিধ্যাসন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, লোভ গ্লানি, গর্ব্ব, আত্মগরিমা, বৃথা দর্প, প্রতিশোধ ও অনমনীয়তা হইতে চিত্ত বিশুদ্ধীকরণের চেষ্টায় দিবাত্রিপাত করিবেন।

অপরাহ্ণ ৬ টার সময় সকলে শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, পুষ্প ধূপাদি সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া ২ নং ক্রীকরো মহাবোধি সভাগৃহে সমাহিত হইবেন। তথা হইতে সকলে "রত্ন সূত্র" হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গোলদিঘি অভিমুখে ও অবধি গমন করিবেন।

নিশি সমাগমে সভাগৃহ আলোকিত হইবেক। রাত্রি ১০'টা অবধি সকলে পদ্মাসনে উন্নতগ্রীব হইয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিবেন। এবং যাঁহারা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলের সমীপে প্রীতিসূচক সাধুবাদ প্রেরণ করিবেন। বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘরত্নের কৃপায় দেশ হইতে সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হউক, এই আমাদিগের একান্ত আন্তরিক প্রার্থনা। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

রত্নসুত্তং।

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু,
অথো পি লক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং॥

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে,
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং,
তস্মাহি নে রক্‌খথ অপ্পমত্তা॥

৩। যঙ্কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্‌গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ননো সমং অত্থি তথা গতেন,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৪। ক্ষয়ং বিরাগং অমতং পণীতং,
যদজ্‌ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৫। যং বুদ্ধসেট্ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং,
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৬। যে পুগ্‌গলা অট্ঠসতং পসত্থা,
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্‌খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্‌ফলানি;
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দলেহন,
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্হ,
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া,
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো।
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি,
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৯। যে অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি,
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা,
ন তে ভবং অট্ঠমমাদিয়ন্তি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১০। সহাবস্স দস্সন সম্পদায়,
তয়স্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ,
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহপায়েহি চ বিপ্পমুত্তো,
ছচাভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং,
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায়,
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্‌সিতগ্‌গে,
গিম্হানমাসে পঠয়স্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরং অদেশয়া,
নিব্বাণগামিং পরমং হিতায়।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১৩। বর বরঞ্ঞু বরদো বরাহরো,
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেশয়ি।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং,
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরুল্হিছন্দা,
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে!
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং,
বুদ্ধং নমস্যাম সুবত্থি হোতু॥

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্‌খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং,
ধম্মং নমস্যাম সুবত্থি হোতু॥

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি যানি ব অন্তলিক্‌খে।
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং,
সংঘং নমস্যাম সুবত্থি হোতু॥

১। ভূমি ও বিমানচর যে সকল ভূত এইখানে সমবেত আছ, সকলেই সুমনা হও, অথচ ঐহিক পারত্রিক সুখজনক বুদ্ধবাক্য মনোযোগ দিয়া ভক্তির সহিত শ্রবণ কর।

২। অতএব ভূতগণ! মনোযোগের সহিত শুন। সকলে মানবগণকে দয়া কর। যে সকল মনুষ্য দিবানিশি পূজা করিতেছে, এই হেতু, তোমরা সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩। ইহ পরলোকে যে কিছু বিত্ত ও স্বর্গরাজিতেই বা যে কিছু পরম রত্ন আছে, এতদুভয়ও তথাগত সত্যজ্ঞ বুদ্ধের সমান নহে। বুদ্ধে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৪। সমাহিত-চিত্ত শাক্যমুনি, যে ক্ষয়, বিরাগ, অমৃত ও পরম নির্ব্বাণধর্ম্ম কুঝিয়াছেন, তাহার সমান আর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মে এই পরম রত্ন-ভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৫। বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ যে শুচির প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা আনন্তর্য্য-সমাধি বলিয়া কথিত, তাহার সমান আর কোন রূপাবচর-সমাধি নাই। ধর্ম্মে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৬। যেই অষ্টপুদ্গল, সাধু-প্রশংসিত তাঁহারা চারি যুগ্ম, তাঁহারা দক্ষিণীয় ও সুগত-শ্রাবক; ইহাদের প্রতি প্রদত্ত দানই মহাফল দায়ী। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৭। যাঁহারা দৃঢ় মনে গৌতম শাসনে আসক্ত, নিষ্কাম ও অমৃতে অবগাহন করিয়া বিনা মূল্যে বদ্ধ নির্ব্বাণসুখ ভোগ করিতেছেন তাঁহারা প্রাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৮। ভূমিতলে দৃঢ় প্রোথিত ইন্দ্রকীল যেমন চতুর্দ্দিকের বায়ুর দ্বারাও কম্পিত হয় না, যিনি নিত্য প্রজ্ঞা-নয়নে চারি মহাসত্য দর্শন করেন, সেই সৎপুরুষকেও আমি তদুপমেয় বলি। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৯। যাঁহারা গভীরপ্রজ্ঞ বুদ্ধ সুদেশিত চতুরার্য্য-মহাসত্য সুষ্ঠুরূপে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যদিও বা অত্যন্ত প্রমত্ত হন, তথাপি অষ্টম জন্মগ্রহণ করেন না। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১০। ইহাঁর সত্যবোধের সঙ্গে সঙ্গেই সৎকায় দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত এই যে তিনটি অধর্ম্ম দূরীকৃত হয়। তিনি চতুর্ব্বিধ নরক-বিমুক্ত ও ছয় প্রকার অভিস্থান সম্পাদনে অসমর্থ। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১১। তিনি যদিও বা কায়মনোবাক্যে কোন পাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা গোপন করিতে পারেন না। দৃষ্ট পদের পাপ গোপনে অসম্ভাবিতা উক্ত হইয়াছে। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১২। গ্রীষ্মকালের প্রথম গ্রীষ্ম মাসে বন প্রগুল্মে সুপুষ্পিত শাখাগ্রে যেমন শোভা হয়, তদুপমেয় ধর্ম্মবর পরম হিতের জন্য যিনি উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধে এই পরম রত্নভাবও প্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১৩। যিনি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞ, শ্রেষ্ঠদাতা ও শ্রেষ্ঠ আহরণকারী, যিনি অনুত্তর ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১৪। যাঁহাদের পুরাতন, ক্ষীণ, নূতন ও তৃষ্ণা ক্ষয় হওয়াতে ছিন্নমূল তরুর পুষ্পের ন্যায় ভাবী ফল উৎপাদনে অসমর্থ, অসম্ভব, যাঁহারা পুনর্জন্মে বিরক্ত-চিত্ত; তাঁহারা কর্ম্ম ক্ষয় জ্ঞানে, ক্ষীণ-বীজ, অবৃদ্ধিছন্দঃ, ঐ সকল ধীর ব্যক্তি এই প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংঘে পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১৫। ভূচর ও বিমানচর যে সকল ভূতাত্মা এই স্থানে সমবেত আছ, চল, দেব-মনুষ্য পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করিব। তাহাতে শুভ হউক।

১৬। ভূচর ও বিমানচর যে সকল ভূতাত্মা এই স্থানে সমবেত আছ, চল, দেব-মনুষ্য-পূজিত তথাগত ধর্ম্মকে নমস্কার করিব। তাহাতে শুভ হউক।

১৭। ভূচর ও বিমানচর যে সকল ভূতাত্মা এই স্থানে সমবেত আছ, চল, দেব-মনুষ্য-পূজিত তথাগত সংঘকে নমস্কার করিব। তাহাতে শুভ হউক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর সপ্তচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১লা আষাঢ়, ১৩০৬।

শ্রীপ্রিয়শঙ্কর মজুমদার।
সম্পাদক।

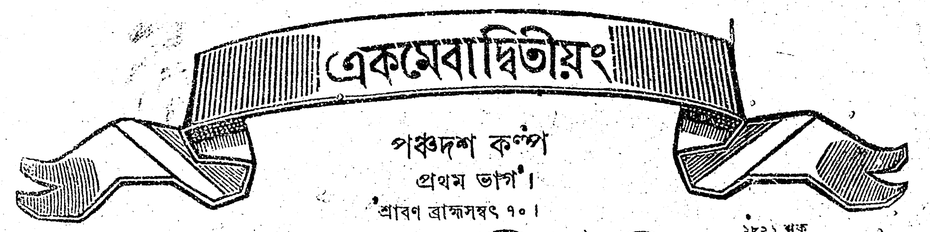

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭১ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবং নিত্যং জ্ঞাননন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং।
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়		পৃষ্ঠা
একটি কথা (যোগ) (শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	... ...	৫৭
বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	... ...	৫৯
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৬১
কৃষ্ণা বতার (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	... ...	৬৮

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৬। কলিগতাব্দ ৫০০০। ১ শ্রাবণ রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭১ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

একটি কথা। (যোগ)

৫ আষাঢ় ১৮২১ শক।

প্রভাতে উঠিয়া নিত্য-নিয়মিত রূপে শ্রীমন্মহর্ষি গুরুদেবের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলাম। কিন্তু গুরুদেবের অদ্য কোন সম্ভাষণা বা কোন জিজ্ঞাসা নাই। তিনি প্রশান্ত ভাবে উন্নত-শির-গ্রীব হইয়া যেমন বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। তাঁহার ওষ্ঠোপরি তর্জ্জনীয় অঙ্গুলীটি স্থাপিত ও নেত্র তৃতীয়াংশে নিমীলিত, কখন কখন বা তাহা অর্দ্ধ নিমীলিত হইতেছে। আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভাবিলাম অদ্য বা ইহাঁর শরীর ভাল নাই, তাই বহির্দ্দিকে চিত্তকে আনয়ন করিতে ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। পূর্ণ এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল—বলিলেন "চক্ষের জল দাও"। দিলাম—দিয়া বলিলাম, আজ কি শরীর ভাল নাই? উত্তরে বলিলেন, "বেশ আছে—খুব সুস্থ আছি, তাই যোগে আনন্দে ছিলাম। আমি কেবল পরমাত্মাতে একান্তে অবস্থান করিতেছিলাম—এই যোগে অনন্তকাল অবস্থান করিব এই আভাস পাইয়াছি। এই যোগের সময়ে আর অন্য কাহাকেও বা অন্য কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, খোদা বা মাবুদ—কেবল ঈশ্বরই আমার সঙ্গে ছিলেন। আকাশও ব্যবধান ছিল না। আকাশ ব্যবধান থাকিলেই তুমি, তিনি ও, ইহা, উহা, তাহার জ্ঞান হয়। কিন্তু আমি কেবল সেই 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত পরমাত্মাকেই দেখিতেছিলাম ও তাঁহাকেই প্রীতি করিতেছিলাম, তাঁহা ছাড়া আর কাহাকেও বা কোন পদার্থকেই দেখিতেছিলাম না, আর তিনি কেবলই আমাকেই দেখিতেছিলেন ও অমৃত ভোগ প্রদান করিতেছিলেন। এই যোগে যুক্ত হইলে সকলেই আপনার আপনার আত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান জানিতে পারে, অন্য কিছুই দেখে না—অন্য কিছুই জানে না। ঈশ্বরও এই রূপ প্রত্যেক যোগীর নিকটে কেবল তাঁহারই আপনার একমাত্র বস্তু হইয়া থাকেন। আমি উৎসাহ সহকারে

বলিলাম যে, "অত্র পিতা অপিতা ভবতি" মন্ত্রটি এই ভাবের। মহর্ষিদেব নিমেষের মধ্যে সমস্ত মন্ত্রের ভাব স্মরণ করিয়া বলিলেন যে "যাহা বলিলাম তাহা ঐ মন্ত্রেরই ভাবের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

"অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসো নন্বাগতং পুণ্যেনান্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্হৃদয়স্য ভবতি।"

এই যে বলা হইল, এ অবস্থায় চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, স্তেন অস্তেন হয়। কিন্তু সে কখন হয়? আমার পরলোক ও মুক্তির উপদেশে তাহা সুস্পষ্ট বলিয়াছি, "যে ব্যক্তি পাষাণসম কঠিন হৃদয় লইয়া জগতে বিচরণ করিল, নরহত্যা, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, সংসার-বিপ্লবকারী ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মে জীবন ক্ষেপণ করিল, পাপলোক তাহারই জন্য। এই পাপলোকে থাকিয়া পাপাশ্রিত দেহ ধারণ করিয়া অনুতাপের ক্রন্দনে অনুশোচনার হাহুতাশে কালক্রমে তাহার কুটিল পাপ সকল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভস্মীভূত হইয়া গেলে আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোৎস্নায় তাহার অন্তর্দ্দেশ আলোকিত হইবে। পরিশেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবসানে সেই বিগতপাপ আত্মা পুণ্যশরীর ধারণ করিয়া পুণ্যলোকে গিয়া পূর্ব্বজন্মে যাহা কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিল, তাহার ফল উপভোগ করিতে পাইবে; এবং পুণ্যফল ভোগ শেষ হইলে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রেমে কৃতাত্মা হইয়া সে আবার দেবলোকে যাইতে সক্ষম হইবে। * * স্বর্গলোক হইতে উন্নত স্বর্গলোক লাভ করিয়া দেবাত্মা তাহার সমধিক তেজস্বী চক্ষুবলে ও প্রখর বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যতর রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। সেই কৌশলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল ভাবের নিদর্শন পাইয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। সে দেবতাদিগের সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল গীতে স্বর্গরাজ্য পরিপূরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে প্রাচীন দেবতাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া তাহার বিজ্ঞান আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। যখন বিজ্ঞান উজ্জ্বল, প্রেম বিস্তারিত হইল, সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তখন তাহার নিকট উন্নত স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে আবার উন্নততর স্বর্গের শিক্ষা আরম্ভ হইল। লোক লোকান্তর পর্য্যটনে যতই তাহার বিজ্ঞান প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই সে ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান-ক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল। উন্নত লোকেরও শেষ নাই, ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান-ক্রিয়ারও অবধি নাই, বিজ্ঞানের বিস্তারেরও অন্ত নাই। এইরূপে যখন এই দেবাত্মা অধিকাধিক উন্নত জ্ঞানক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও গিয়া অনন্ত জ্ঞানকে ধরিতে পারিল না, তখন তাহার তাঁহাকে লাভ করিবার স্পৃহা ক্রমিকই উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সে লোক পরিভ্রমণে নিষ্কাম হইল, অনন্ত জ্ঞানকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইল, তাহার বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয় হইতে "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই" এই বিষাদের গান অহরহ ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাঁহাকে পাইবার সকল পরিশ্রম বিফল দেখিয়া সে তীব্র বিলাপ করিতে লাগিল, স্বর্গসুখও তাহাকে ধরিয়া

রাখিতে পারিল না, তখন সে মুক্তি লাভের অধিকারী হইল। সেই ভক্তবৎসল পরমেশ্বর তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে তাহাকে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন এবং দেশকালবদ্ধ সংসারের অতীত আপনার অন্তরতর অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিলেন। সেখানে শরীরের অভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিবৃত্ত হইল, বহির্বিষয়ের অভাবে বিজ্ঞানের ক্রিয়া নিরস্ত হইল, মনের ভাব সকলও তাহাকে আর অধিকার করিতে পারিল না। তখন সেই আত্মজ্ঞানের পরিমিত মাত্রাকে ঈশ্বর পূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি আপনার পদানত ভক্তকে সকলই প্রদান করেন, আপনার জন্য কিছুই রাখেন না। তখন সে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে অনন্ত জ্ঞান প্রেমানন্দকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হইল। By love and worship blends itself in God. জীবাত্মার মুক্ত অবস্থা পরমাত্মারই সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব। পরমাত্মারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই প্রসাদে জীবাত্মা মুক্ত হয় এবং তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কোনো লাভকেই অধিক লাভ মনে করে না, তাঁহাতেই কামনার সমস্ত ফল উপভোগ করে। এই অবস্থাকে উপলব্ধি করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

"অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ।"

ইহাই অধ্যাত্ম যোগ—ইহাই শ্রেষ্ঠ যোগ।

বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা।

১৮২০ শক ৷ ১৮ই ফাল্গুন, বুধবার।

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"।

পরমেশ্বর আনন্দ ও অমৃতরূপে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রকাশ পাইতেছেন। কি শীত কি বসন্ত সকল ঋতুতেই তাঁহার আবির্ভাব। সেই যে গগনস্পর্শী হিমাচল, যাহার শিখরদেশ কেবল মাত্র শুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন, সেখানেও তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ও আনন্দ রূপে বিরাজ করিতেছেন। যেন শান্তং শিবমদ্বৈতং নাম, গম্ভীর স্বরে তথায় ধ্বনিত হইতেছে।

শীতকালের প্রান্তে যখন আমরা সুরম্য হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হই, তখন কি এক শোভাই আমাদের চক্ষের সমক্ষে পতিত হয়। দেখি যে শিশির রাশিতে সমস্ত ক্ষেত্র আচ্ছন্ন। তখন মনে হয়, আকাশস্থিত কোটি কোটি স্বর্গ-লোকে যে সকল দেবগণ বাস করেন, তাঁহারাই প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত নিশা প্রেমময়ের পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পবিত্র চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়া, ধরাতলকে শোভা ও আনন্দময় করিয়াছে। এখন আর শীত নাই। এখন সেই আনন্দময়েরই আদেশে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। উচ্চ পর্ব্বতের বক্ষোপরি মন্দ মন্দ বসন্ত-বায়ু বহমান হইবা মাত্রই, শত শত গোলাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহারা যেন ভগবানের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ তাহা চুম্বন করিতেছে। সুগন্ধ দান করিয়া যেন তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেছে। মানস সরোবরে কোটি কোটি পদ্ম, সূর্য্য উদিত হইবা মাত্র প্রস্ফুটিত হইতেছে। কোথায় সূর্য্য—আর কোথায় আমাদের মানসের পদ্ম! কে তাহাদের মধ্যে এমন নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিল? সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, যাঁর পক্ষে দূর ও নিকট সমস্তই এক, তিনিই কি তাহাদের মধ্যে সমকালে বর্ত্তমান থাকিয়া এই আনন্দের

খেলা দেখিতেছেন না? তিনিই কি এখন সহকার শাখার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়া, তাহাকে মুকুলিত করিতেছেন না? কাহার ইচ্ছাতে কপোত ও কোকিল এবং বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ বিহঙ্গ, জগৎকে সুধাময় সংগীত-রসে অভিষিক্ত করিতেছে? তিনি স্বয়ং কি এখন তাহাদের মধুর কণ্ঠে আবির্ভূত নহেন? ঐ যে দক্ষিণানিল, যাহা, সকল প্রাণীর শরীরে, এক অভূতপূর্ব্ব স্পর্শ-সুখ প্রদান করিতেছে, তাহার প্রতি-অণু পরমাণুতে কি তিনি বর্ত্তমান নাই? হায়! এমন সুন্দর সুশীতল বায়ু-সেবন যেন ব্যর্থ না হয়। আমরা যেন সেই স্নেহময়ী মাতার কোমল হস্তের স্পর্শ-সুখ তাহাতে অনুভব করিতে পারি। সেই স্নেহময়ী মাতা চারিদিকে শোভা ও সুখের সামগ্রী ঢালিয়া দিয়াছেন। মাতা যেমন আপনি হাসিয়া, সন্তানকে হাসাইয়া দেন, আমাদের জগৎ-জননী কি তেমনি আপনার আনন্দে সকলকে আনন্দিত ও আপনার শোভায় সকল বস্তুকে শোভিত করিতেছেন না? কোথায় দিব তাঁহার স্নেহের উপমা!!

কি আশ্চর্য্য তাঁহার শক্তি! তিনি নিজে রূপ রস গন্ধ বিহীন হইয়াও কেমন করিয়া তাঁহার সংসারকে রূপ রস গন্ধের আধার করিলেন? ঐ দেখ নিষ্পাপ শিশুর ও সাধ্বী কুললক্ষ্মীর এবং ধ্যানমগ্ন যোগীর মুখমণ্ডলে আর এক নবতর উচ্চতর শোভা বিকীর্ণ হইতেছে!! এই সকল শোভাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সুধার সার। এমন যে শোভার আগার সংসার—এমন যে আনন্দময়ীর সুখময় ক্রোড়—এখানে থাকিয়াও কেন আমরা নিরানন্দে থাকি? কেন আমরা তাঁর আনন্দময় বিভূতির মধ্যে তাঁহাকে না দেখি—তাঁহাকে না ভোগ করি? কেন তাঁর ক্রোড়ের উষ্ণতা অনুভব না করি? নিশ্চয়ই আমরা আমাদের বিশ্বাস-চক্ষু জ্ঞান-চক্ষু ও ভক্তি-চক্ষু কুসংস্কার—পাপ ও সংসার আসক্তিরূপ শলাকা দ্বারা নষ্ট করিয়াছি। অন্ধের নিকটে শোভাই বা কোথায়, সুখ স্বস্তিইবা কোথায়! সকলই অন্ধকার সকলই বিষাদময়। অন্তরে যদি পাপ-গরল থাকে, তবে বাহিরে ভোগের সামগ্রী ও অপরিমেয় শোভারাশি থাকিলে কি হইবে? বিষজর্জ্জরিত শরীর কি বসন্তের বায়ুস্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে? সেই প্রকার পাপগ্রস্ত মন কি আনন্দময়ীর আনন্দময় বিভূতি দর্শনে সুখী হইতে পারে? কখনই নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসার-আসক্তি নিরানন্দের আর এক কারণ। আসক্তিই তৃষ্ণা। বিকারী রোগীর তৃষ্ণার ন্যায় এই যে ঘোরতর সংসার-তৃষ্ণা, ইহাই যত অনর্থের মূল। ইহা কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। এই আসক্তি হইতেই, ধন জন দারা পুত্রের প্রতি অত্যন্ত মমতা জন্মে। কিন্তু ইহারা কখনই চিরস্থায়ী নহে। একদিন না এক দিন ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ হইবেই হইবে। এই বিরহ-বিচ্ছেদ-জনিত যাতনা বড় সহজ নহে। ইহাতে হৃদয়ের শোনিত একবারে শুষ্ক হইয়া যায়। তখন নিরানন্দ ও বিষাদ প্রবল বেগে আত্মাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সংযম অভ্যাস দ্বারা আত্মাকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সংসার-আসক্তি মনে বদ্ধমূল হইতে পারিবে না। কিন্তু মনুষ্য বড় দুর্ব্বল, সে কেবল মাত্র নিজ বলে নিজ চেষ্টায় কিছুই করিতে পারে না। প্রতিহত জল-স্রোতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ পশ্চাৎ

পদই হইতে থাকে। পাপ সংসার-আসক্তি ও শোক হইতে মুক্ত হইতে হইলে, ঈশ্বরের নিকটে প্রাণগত প্রার্থনা ও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকা চাই। যেমন করিয়া ধ্রুব প্রহ্লাদ ও ব্রহ্মর্ষি নারদ ডাকিতেন, তেমনি করিয়া অশ্রুজলে স্নাত হইয়া ডাকা চাই। তাহা হইলেই দেখিবে শরীর মন আত্মায় কোথা হইতে এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক বল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই বলপ্রভাবেই শরীর কণ্টকিত হইবে, আত্মা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইবে। বলিতে পারি না, কি এক আবেগ তখন আত্মায় উপস্থিত হয়, জানি না করুণাময় প্রেমময় কি অদ্ভুত কৌশলে তাঁহার পদানত ভক্তকে তখন স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় বক্ষের ভিতর গ্রহণ করেন!! তখন কোথা পাপ, কোথায় তাপ, কোথায় সংসার-আসক্তি, কোথায় বিরহ বেদনা, কোথায় শোক-মোহ—সকলি ডুবিয়াছে। তাঁর অতলস্পর্শ আনন্দ-নীরে ডুবিয়াছে। ধন্য সাধু সুখী সেই, যিনি এই প্রকার সংযম অভ্যাস ও প্রার্থনার বলে আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন।

কোথায় অগতির গতি! অনাথের নাথ! তুমি আমাদের পাপ ও সংসার-আসক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও। তুমি আমাদের নিরানন্দ দূর করিয়া দাও। নিরানন্দই মৃত্যু। এপ্রকার মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি অমৃত স্বরূপ, সেই অমৃতে আমাদিগকে লইয়া যাও। তোমার আবির্ভাব যে লোকে জাজ্বল্যতর আছে, মৃত্যুর পর, সেই লোকে আমাদিগকে স্থান দান করিও। হো! কি আনন্দময় স্থান!! যেখানে দেবগণ নিয়ত তোমাকে বক্ষে করিয়া প্রেমাশ্রু-ধারা ফেলিতেছেন, শোকাশ্রু যে কি তাহা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমগানে আকাশ মধুময় হইয়া রহিয়াছে। যেখানে বিরহ বিচ্ছেদের উষ্ণ বায়ু কোন কালে প্রবাহিত হয় না। যেখানে তোমার প্রেম-মুখের জ্যোতি নিমেষের জন্যও অস্তমিত হয় না। হায় সে কি স্নিগ্ধ জ্যোতি! কি সুখী তাঁহারা যাহারা চির দিনের জন্য সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মগ্ন রহিয়াছেন। কোথায় দয়াময়—কোথায়!! সেই জ্যোতিতে তুমি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন কর। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা—এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য এক সময়ে খুবই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল—তার সাক্ষী কুরুক্ষেত্রের হত্যা-কাণ্ড। এই সময়ে, ক্ষত্রিয়-বার্য্য তেজের সহিত মাথা তুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা লোক-সমক্ষে আপনাদের আধিপত্য অটুট্ রাখিবার জন্য প্রভূত যাগ-যজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের বিধান-প্রবর্ত্তনার দিকে বেশীমাত্রা ঝোঁক দিতে লাগিলেন; তার সাক্ষী—মহাভারতের আদি অন্ত মধ্য যজ্ঞে যজ্ঞে ছয়লাপ হইয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের অভ্যুদয়ের কাল হইতে ক্রমাগতই রাজ্যে রাজ্যে, অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি মহা মহা যজ্ঞ বিপুল অর্থব্যয় এবং আড়ম্বর সহকারে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। হরণ এবং পূরণ পাশাপাশি চলিতে থাকিল—

যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের প্রাণ-হরণ, এবং যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের উদর-পূরণ। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মোপাসনা গিরি-গুহা-অরণ্যে প্রস্থান করিল। এখানে এইটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, প্রভূত অর্থব্যয় ব্যতিরেকে বড় বড় যাগযজ্ঞ সুনির্ব্বাহিত হইতে পারা অসম্ভব। কাজেই—সূর্য্য যেমন সমুদ্র হইতে রসাকর্ষণ করিয়া মেঘের ভাণ্ডার পূরণ করে, এবং তাহার পরে সেই ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়া উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করে—প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়-বীরেরা তেমনি বৈশ্যদিগের নিকট হইতে ধনরাশি শোষণ করিয়া রাজকীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন, এবং যজ্ঞকালে সেই ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। দ্যুদেবগণের প্রতি ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল, ভূদেবগণের প্রতি ধনরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বারো আনা আহার্য্য দ্রব্য দুই দিকের দুই দেবতারা আপনাদের মধ্যে বাঁটিয়া লইতে থাকিলেন, অবশিষ্ট চারি আনা অংশে ভর করিয়া বৈশ্যাদি বর্ণেরা কথঞ্চিৎপ্রকারে দিনপাত করিতে লাগিল। মনুর বিধানমতে রাজারা ষষ্ঠাংশবৃত্তি অর্থাৎ প্রজাবর্গের কৃষি-জাত ধান্যের কেবল ষষ্ঠাংশের ন্যায্য অধিকারী; কিন্তু হইলে কি হয়—সর্ব রাজা রঘুও না, রামচন্দ্রও না, যুধিষ্ঠিরও না! রাজা-রাজড়াদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সংখ্যা অতি অল্প—দুর্য্যোধনের সংখ্যাই অধিক। মন্ত্রণা-দাতাদিগের মধ্যেও ভীষ্মের সংখ্যা অতি অল্প—শকুনির সংখ্যাই অধিক। তা ছাড়া—প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠানের মহোৎসবে যখন রাজপুরুষেরা এবং রাজ্যশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা মাতিয়া উঠিয়াছেন, তখন রাজা যদি দ্যুদেব এবং ভূদেবগণের প্রিয়ার্থে এবং দেশের কল্যাণার্থে আড়াই আনার জায়গায় বারো আনা রাজস্ব আদায় করেন, তবে কে এমন পাষণ্ড—কাহারই বা এত সাহস যে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারণ করিবে? এক এক যজ্ঞে অসংখ্য পশুর রক্তপাত এবং অসংখ্য দীনদরিদ্র প্রজার হাড়মাস-নিঙড়ানো রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত সহৃদয় ব্যক্তিরা যাগযজ্ঞের প্রতি তো বীতরাগ হইলেনই, তা ছাড়া—যে সকল দেবতার নামে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত তাঁহাদের প্রতিও তাঁহাদের অভক্তি জন্মিল। এই সময়ে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রভাবের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন; আর, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্বিশেষে, জ্ঞানধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য-জাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় ভারতের দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম পথ-প্রদর্শকদিগের মধ্যে বুদ্ধদেব সর্ব্বাগ্রগণ্য; কেননা, সেরূপে যে, ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে—বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করা যে, নিতান্তই বৃথা কার্য্য, আর, আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যে, শ্রেয়ঃপথের একমাত্র দ্বার—এই কথাটির প্রতি বুদ্ধদেব জন-সাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। আপামর-সাধারণ সকলেরই প্রতি বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ ছিল এই যে, ঠিক্ মতে ভাবনা করিতে শেখ', ঠিক্ কথা বলিতে শেখ', ঠিক্ পথে চলিতে শেখ'; তা বই, কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের প্রতি তাঁহার বিশিষ্টরূপ উপদেশ ছিল এই যে, ক্লেশের মূল অন্বেষণ কর; ক্লেশের যাহাতে মূলোচ্ছেদ হইতে পারে তাহার বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ কর; এবং সেই সুনির্দ্ধারিত উপায় অবলম্বন করিয়া ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপিণী নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। বুদ্ধদেবের প্রদত্ত এই সকল কাজের উপদেশ শুনিয়া তাহার উপর যদি কোন শিষ্য ঈশ্বর-বিষয়ক কোন জ্ঞানের উপদেশ তাঁহার নিকটে শুনিতে চাহিত, তবে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের নাম লইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন ইহা সত্য, আর, ইহাও সত্য যে, তাঁহার পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ দর্শনকারেরা প্রকারান্তরে নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া বুদ্ধদেব নিজে যে, নাস্তিক ছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, আর, তাহা বিশ্বাস-যোগ্যও নহে। তবে, বুদ্ধদেবের লোকোত্তেজক কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তখনকার কালের সমাজের নেতৃপক্ষেরা যে, তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সক্রেটিসও তাঁহার স্বদেশীয় মহামহোপাধ্যায়গণ কর্ত্তৃক ঐরূপে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। আমেরিকার সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপত্রে ঈশ্বরের নাম করা হইবে কি না—ইহা লইয়া প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, না—ঈশ্বরের নাম করা হইবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিষ্ঠাতাগণ কি নাস্তিক ছিলেন? তাহা দূরে থাকুক্—তাঁহারা ঈশ্বরভক্ত সাধু-প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে আর ভুল নাই। তবে কি? না—পাছে পরবর্ত্তী কালের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ঈশ্বরের দোহাই দিয়া প্রতিষ্ঠা-পত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করে—এইরূপে ঈশ্বরের নামে রাজ্যের ভিত্তিমূল বিপর্য্যস্ত করিয়া ঈশ্বরের নামকে কলঙ্কিত করে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহাদের নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-পত্রে ঈশ্বরের নাম সন্নিবেশিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন।

প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মবীর; এমন কি তাঁহার মতো উচ্চাশয় ধর্ম্মবীর পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে পূর্ণ উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। অতএব তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝিতেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহার সময়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার অধিক আর কিছু করিতে গেলে—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও হয়তো তিনি করিতে পারিতেন না। করিয়াছেন যাহা—তাহা একটা অপরিমেয় বৃহৎ ব্যাপার। বিশুদ্ধ ব্যবহার-ধর্ম্মের প্রতি—অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচারিতা, সদাচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি আপামর-সাধারণ সকলশ্রেণীর লোকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া কম কথা নহে—তাহা লিউথরের ন্যায় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসংস্কারকের কর্ম্ম নহে—তাহা একজন মহাজ্ঞানী উদারচেতা বিশাল-হৃদয় সর্ব্বলোকহিতৈষী মহাপুরুষেরই কর্ম্ম—তাহা বুদ্ধদেবেরই কর্ম্ম!

তাহার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবের চরণে দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে এ যাবৎ কাল বাঁধা রহিয়াছে এবং চিরকাল বাঁধা থাকিবে। সবই সত্য—কিন্তু তথাপি, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিসদৃশ পরিণাম দেখিয়া আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, তিনি যদি তাঁহার শিষ্যদিগের আত্মার ক্ষুধা-নিবারণের জন্য ঈশ্বরারাধনার একটি সুনির্ম্মল পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল করিতেন। তাহা না করিয়া ঈশ্বর-সম্বন্ধে তিনি প্রগাঢ় মৌন অবলম্বন করিলেন! ইহার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। আমাদের বুদ্ধিতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি—সে কারণ আর কিছু না—বুদ্ধদেবের ছয় সাত শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের একজন জগদ্বিখ্যাত ইহুদীয় মহাপুরুষ আপন চেলাদিগকে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন;—কি? না শূকরদিগের সম্মুখে মুক্তা ছড়াইও না—আমরা বলি উলুবনে মুক্তা ছড়াইও না। কিন্তু শাক্য মুনির শিষ্যেরা তাঁহার মৌনাবলম্বনের অর্থ উল্টা বুঝিল। তাহারা বুঝিল যে, তবে বুঝি ঈশ্বর কেবল একটা কথার কথা—এইরূপ বুঝিয়া মনুষ্যের পুরুষকারকে এবং অনাদি কর্ম্মকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল।

পুরাণে যে বলে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" তা' বড় মিথ্যা নয়! বৌদ্ধধর্ম্মের সূক্ষ্ম-গতি তলাইয়া বুঝিতে গিয়া—মুক্তার লোভে ডুবুরির যেমন অনেক সময় প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়—তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তির তেমনি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হয়। তার সাক্ষী—এ দিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর-বাদী এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ; ও দিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্য-পূজা এবং মূর্ত্তি-পূজার আদি-গুরু:—এটা সত্য, কি ওটা সত্য? বিষম সমস্যা! ইতিহাস কিন্তু ও-সব হেঁয়ালিকে ডরায় না। যাহা দেখিয়া আমরা বলিলাম "বিষম সমস্যা!" ইতিহাসিনী দেবী তাহা দেখিয়া হাস্য করেন আর বলেন "From the sublime to the ridiculous there is but a step" 'কিছু চাহি না' বলিয়া কঠোরতার ডানায় ভর করিয়া আকাশে ওড়াউড়ি, আর, 'পুত্রং দেহি ধনং দেহি' বলিয়া মৃণ্ময় প্রতিমার পদতলে গড়াগড়ি, দুয়ের মধ্যে কেবল এক পা ব্যবধান!"

ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে যেমন নানা-রসের নাটক অভিনীত হয় এমন আর কোথাও না। যেমন করুণ-রস—তেমনি হাস্য-রস! একদা চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি চেলা খুব ভাল কামিনী চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই চাউলে ভাত রাঁধাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব আহারান্তে তাঁহার সেই চেলাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ চাউল তুমি পাইলে কোথায়?" চেলাটি বলিল "অমুক বিধবা রমণীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।" এই—চৈতন্য মহাপ্রভুর ক্রোধ দেখে কে! "কি! প্রকৃতি-সম্ভাষণ! তুমি আজ হইতে আমার সম্মুখে আর আসিও না!" চেলা-বেচারী আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া অনতিপরে ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। যে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি কারখানা এইরূপ, তাঁহার দোহাই দিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন কোন বিখ্যাত শাখা অসঙ্কোচে এইরূপ কথা রটনা করিয়া থাকে যে, প্রকৃতির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে সংসার-ত্যাগী বৈরাগীর ধর্ম্মসাধন সুসম্পন্ন হইতে পারে না! এই হাস্যোদ্দীপক নাটকের

জুড়ি আর একটি আছে; তাহা এই:—

পাছে লোকে ঈশ্বর-বিষয়ক কূট তর্কে বিভ্রান্ত হইয়া আত্মপ্রভাব-সাধ্য পুরুষার্থ-সাধনে অযত্ন করে, এই আশঙ্কায় বুদ্ধদেব ঈশ্বর-প্রসঙ্গে নিতান্তই পরাঙ্মুখ ছিলেন; এত পরাঙ্মুখ ছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর-বিষয়ক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়বোধে মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! পৃথিবী হইতে যেমনি তিনি অন্তর্ধান করিলেন, তাহার কিয়ৎপরে ভারতবর্ষের এ মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেব-দেবীর প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল; তার সাক্ষী—ইলোরা, অজন্তা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র। সেই যে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত হইল তাহার লেজুড় এখনো পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে সটান চলিয়া আসিতেছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখে আমি শুনিয়াছি যে, কিয়ৎ-পূর্ব্বে যখন তিনি সক্ষেত্রে (অর্থাৎ সরে জমিনে) বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য অনুসন্ধান করিবার মানসে নেপালে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেখানে তিনি দেখিলেন যে, দেবালয় অনেক আছে কিন্তু দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কোথাও বা মহাদেব, কোথায় বা বুদ্ধদেব—এই যা কেবল, তা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার কূত্রাপি নাম গন্ধও নাই। নেপালের অধিবাসীরা শৈব নহে—সবাই বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম দেবপ্রসাদের প্রতি পরাঙ্মুখ, অথচ কি আশ্চর্য্য, নেপালের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের অমন একটা পীঠস্থানে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে! ইহার অবশ্য বিশেষ কোন কারণ থাকিবে। সে কারণ আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন:—

বুদ্ধদেব অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, শুদ্ধাচার, ইত্যাদি নানাপ্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্বলিত সদ্ধর্ম্ম জনসমাজে প্রচার করিলেন;

কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রভাবকে অতি মাত্র প্রশ্রয় দিলেন;

এত বেশী প্রশ্রয় দিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালে তাঁহার পথাবলম্বী সাধকদিগের মনে এইরূপ একটা অসঙ্গত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বল করিয়া উঠিল যে, সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ বা অস্ফুট চক্ষু মনুষ্যের আত্মার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিশিষ্টরূপ সাধন দ্বারা তাহাকে কেবল ফুটাইয়া তুলিবার অপেক্ষা—তাহা হইলেই মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।

বুদ্ধদেবের ন্যায় ত্রিলোক-বিজয়ী সাধক কেহ হয় নাই হইবে না। সাধন-প্রভাবে তিনি সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছেন। অতএব বুদ্ধদেব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর।

বুদ্ধদেব এমনি করুণাময় যে, যদিও তিনি মনে করিলেই আর-এক ধাপ উপরে উঠিয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি সর্ব্বজগতের পরিত্রাণের পথ-প্রস্তুত করিবার জন্য ঈশ্বরত্বের ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়া সেইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হাজার হউক্ বুদ্ধদেব মনুষ্য:—তিনি এক সময়ে হামাগুড়ি দিয়াছেন; তাহার পরে এক সময়ে বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়াছেন; তাহার পরে এক স-

ময়ে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল; সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় বুদ্ধ নামের সার্থক্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পরে রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা বুদ্ধের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বলিলেন বুদ্ধদেব ঈশ্বর বটে কিন্তু মনুষ্য-বুদ্ধই যে ঈশ্বর তাহা নহে। মনুষ্য-বুদ্ধের অভ্যন্তরে তিন শ্রেণীর দেবতা-বুদ্ধ স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি অধিষ্ঠান করিতেছেন;—প্রথম স্তরে রহিয়াছেন পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর—ইনি বোধিসত্ত্ব-শ্রেণীর বুদ্ধ; দ্বিতীয় স্তরে রহিয়াছেন অমিতাভ—ইনি ধ্যানী বুদ্ধ; তৃতীয় স্তরে রহিয়াছেন বজ্রপাণি আদি বুদ্ধ—ইনিই সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর—ইনিই মহেশ্বর। এখন বক্তব্য এই যে, নেপালে বুদ্ধদেব এবং মহাদেবের মধ্যে যেরূপ হরিহরাত্মা রকমের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার ভিতরকার নিগূঢ় কথাটি আর কিছু না—যিনি বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি মহেশ্বর, তিনিই পৌরাণিকদিগের শূলপাণি মহেশ্বর; যিনি আদি বুদ্ধ, তিনিই শিব।

এখন আমরা দিব্য একটি স্থানে পৌঁছিয়াছি! চমৎকার তীর্থস্থান এটি! ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থান! একটি বেণী হচ্চেন বৌদ্ধ শাস্ত্রের সরস্বতী নদী—এক্ষণে যিনি দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পড়িয়া স্মৃতিপথে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বেণী হচ্চেন বেদান্তদর্শনের গঙ্গা নদী। তৃতীয় বেণী হ'চ্চেন সাংখ্যদর্শনের যমুনা নদী। এই সঙ্গমস্থানটিতে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত প্রথমতঃ শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তদর্শনের ঐক্য, দ্বিতীয়তঃ কপিল সাংখ্যদর্শনের ঐক্য, তৃতীয়তঃ পাতঞ্জল সাংখ্যদর্শনের ঐক্য—তিন দর্শনের তিন ভাবের ঐক্য—যাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা ক্রমান্বয়ে আপনাদের চক্ষের সমক্ষে অনাবৃত করিতেছি—প্রণিধান করুন;—

একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণের পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধশাস্ত্রের মতানুসারে মনুষ্য-বুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক পুরী এক প্রকার চৌতালা দেবমন্দির। একতালায় রহিয়াছেন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—ইঁহাকে পদ্মপাণি বিষ্ণু বা বৈশ্বানর বলিলেও চলে। দোতালায় রহিয়াছেন ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ কিনা অপরিমিত-জ্যোতি—ইঁহাকে সুবর্ণজ্যোতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বলিলেও চলে। তেতালায় রহিয়াছেন বজ্রপাণি আদি বুদ্ধ যাঁহার সহিত শূলপাণি মহেশ্বরের সৌসাদৃশ্যের কথা আমরা একটু পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। চৌতালায় রহিয়াছে বটে কিন্তু সে না রহার'ই মধ্যে—নির্ব্বাণ-মুক্তি। বেদান্ত-দর্শনের চৌতালা মন্দির ইহারই এক প্রকার দ্বিতীয় সংস্করণ। বেদান্ত দর্শন বলিতে বেদান্ত শাস্ত্র বুঝিলে চলিবে না। বেদান্ত শাস্ত্র বেদান্তদর্শন নহে। বেদের সার ভাগ যে, দশোপনিষদ্ তাহারই নাম বেদান্ত শাস্ত্র। শাঙ্কর ভাষ্য বেদান্ত-শাস্ত্র নহে—বেদোপনিষদ্ শাস্ত্রই বেদান্ত শাস্ত্র। বেদোপনিষদ্ শাস্ত্রের প্রজাপতি, বিষ্ণু, শিব এবং ঈশান ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি-সূচক নাম; তা বই, বেদোপনিষদের অভিপ্রায়ানুসারে প্রজাপতি বিষ্ণু এবং ঈশান বিভিন্ন দেবতাও নহেন; আর, ত্রিমূর্ত্তিও নহেন। বেদোপনিষদের ভাষার মধ্যে হেঁয়ালির ন্যায় অস্পষ্ট কিছুই নাই; বেদোপনিষদে যে

বাক্যের যে অর্থ তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে; তার সাক্ষী—ব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে এই অর্থে তিনি প্রজাপতি; ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন এই অর্থে বিষ্ণু; তিনি মঙ্গল-নিধান এই অর্থে শিব; তিনি সকলের নিয়ন্তা এই অর্থে ঈশান। কিন্তু বেদান্তদর্শনের মতানুসারে বিষ্ণু বা বৈশ্বানর, ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ, এবং ঈশ বা ঈশান, তিন স্থানের তিন অধিদেবতা। বৌদ্ধশাস্ত্রের দেখাদেখি—বেদান্ত দর্শনের চৌতালা দেব-মন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একতালা দেওয়া হইয়াছে বৈশ্বানর বিষ্ণুকে বাসের জন্য—ইনি জাগ্রৎকালীন স্থূল জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দোতালা দেওয়া হইয়াছে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে—ইনি স্বপ্নকালীন সূক্ষ্ম জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তেতালা দেওয়া হইয়াছে ঈশানকে—ইনি সুষুপ্তিকালীন বীজ-ভূত জগতের বা আদ্যা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চৌতালা দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে—এ স্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্য স্থান বা সমাধিস্থান—এখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কোনো কথাই আসিতে পারে না। ত্রিবেণী-সঙ্গমের উঁচা পাড়ে দাঁড়াইয়া আমরা বেদান্ত-দর্শনের মুখ্যতম কথাটির গোড়ার বৃত্তান্ত চক্ষের সমক্ষে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইতেছি—জীবেশ্বরের ঐক্য-প্রতিপাদন-চেষ্টার গোড়ার বৃত্তান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; সে বৃত্তান্তটি এই;—বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নাই—কিন্তু ঈশ্বর চাই। বৌদ্ধেরা প্রথমে মনুষ্য-বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিল; তাহার পরে তাহাদের মনে হইল যে, মনুষ্য-বুদ্ধকে ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরেতে অনিত্যতা দোষ পড়ে; এইরূপ মনে হওয়াতে পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা মনুষ্য-বুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জগতের তিনটি বিভিন্ন স্তরে তিনটি দেবতা-বুদ্ধ বসাইলেন। নিচের স্তরে বসাইলেন অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ—মধ্যম স্তরে বসাইলেন অমিতাভ বুদ্ধ—সর্ব্বোচ্চ স্তরে বসাইলেন আদি বুদ্ধ। এইরূপে যখন তাঁহারা এক বুদ্ধকে চারি বুদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, চারি বুদ্ধকে ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরের একত্বে দোষ পড়ে; এইরূপ ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন যে, চারি বুদ্ধ একই বুদ্ধ—কেবল উপাধি-ভেদে বিভিন্ন। বৌদ্ধেরা মনুষ্য-বুদ্ধকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিতে সাহসী না হইয়া আদি-বুদ্ধের সহিত ঐক্য-সূত্রে তাঁহাকে প্রকারান্তরে ঈশ্বর-পদবীতে সমুত্থাপন করিলেন। এইটিই হ'চ্চে জীবেশ্বরের ঐক্য-প্রতিপাদন-চেষ্টার গোড়ার কাহিনী; তা বই—ঐ কথাটির পোষকতার জন্য উপনিষদের এখান ওখান সেখান হইতে যে দুই চারিটি মহাবাক্য টানিয়া হেঁচড়িয়া বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা কবিতার উচ্ছ্বাস বই আর কিছুই না। মহারাণীকে "হর্‌মাজেষ্টি" বলিলে এরূপ বুঝায় না যে, সত্য সত্যই তিনি মাজেষ্টি-মাত্র! সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহার ভাবার্থ এই যে, সবই ব্রহ্মের মহিমা। "সোঽহং" ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি অহং অর্থাৎ The Great I am পরমাত্মা। তত্ত্বমসি বাক্যের ভাবার্থ এই যে, তুমি তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব। স্পষ্টই দেখিতে পা-

ওয়া যাইতেছে যে, উপনিষদের ঐ মহাবাক্যগুলা এক প্রকার কবিতার ছেঁদো কথা, তা বই তাহার কোনোটিই বিজ্ঞানের কঠোর সত্য নহে। ফলে, বৌদ্ধ চৌতালা-মন্দিরের নির্ব্বাণ মুক্তি এবং বৈদান্তিক চৌতালা-মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এপিট ওপিট তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে, আর, সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের একজন ভীষণ প্রতিক্ষক হইলেও বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাব-সলিলে তাঁহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চোবানো ছিল। পদ্মপুরাণের প্রণেতা ঠিক্‌ই বলিয়াছেন যে, "মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ" মায়াবাদ প্রকৃত শাস্ত্র নহে—তাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র।

ক্রমশঃ।

কৃষ্ণাবতার।

৯ম প্রস্তাব।

আমরা গতবারে রাসলীলা-আলোচনা শেষ করিয়াছি। উহার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুদর্শন মোচন, এবং শঙ্খচূড় বৃষরূপী অরিষ্ট হয়-রূপী কেশী ও ব্যোম বধ। ফলে বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে সুদর্শন মোচন শঙ্খচূড় ও ব্যোম বধের উল্লেখ নাই। এদিকে কংস স্বীয় অনুচরবর্গকে নিহত দেখিয়া কুবলয় হস্তী চানুর ও মুষ্টিকের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ-সাধন মানসে ধনুর্ম্মখ যজ্ঞের সূচনা করিলেন এবং ব্রজপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর কংসের অনুচর হইলেও ধর্ম্মগতপ্রাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী। অক্রূর রথযোগে সায়াহ্নে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি কথাপ্রসঙ্গে উদ্‌যাপিত হইল। কংস যে শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন তাহাও তিনি কৃষ্ণকে বুঝাইয়া দিলেন। পরদিন প্রভাতে রাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের সহিত মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নন্দাদি গোপগণও বার্ষিক কর ও রাজোচিত উপচার লইয়া কংসের আদেশে তাঁহাদের সহযাত্রী হইল। এইখানে অনুরক্ত গোপীগণের মানসিক বিকারের ছবি অতি জ্বলন্ত ভাবে ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে অঙ্কিত। ক্রমে রথ পাপনাশিনী যমুনার তীরে উপস্থিত হইলে অক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে ঐ রথে রাখিয়া অবগাহন মানসে কালিন্দীর হ্রদে প্রবেশ করিলেন। মগ্ন হইয়া দেখেন রামকৃষ্ণ জলের মধ্যে বিদ্যমান। সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিলেন এ কি তাঁহাদিগকে ত রথের উপর স্থাপন করিয়া আসিয়াছি। জলের মধ্যে তাঁহাদের সম্ভাবনা কোথায়। এই ভাবিয়া জলমধ্য হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখেন তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় রথে রহিয়াছেন। সন্দেহ-দোলায়িত হইয়া আবার জলে মগ্ন হইলেন দেখিলেন দুই ভ্রাতা জলের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, আর অগণ্য দেবগণ করযোড়ে ভক্তিভরে তাঁহাদের বন্দনা করিতেছেন। তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি রথে প্রত্যাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে জলে কোন আশ্চর্য্য দর্শন নিরীক্ষণ করিয়া থাকিবে। অক্রূর উত্তরে কহিলেন সে যুগলমূর্ত্তি ত সম্মুখেই। এই মহাশ্চর্য্যময় জগৎ যাঁহার একটি মূর্ত্তি, তুমি সেই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ। আমি তোমারই সহিত সঙ্গত হইয়াছি। মধুসূদন! সে কথার আর প্রয়োজন নাই, চল এক্ষণে

মথুরায় যাই, এই বলিয়া রথচালনা করিলেন।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ জলের ভিতরে সত্যসত্যই কি miracle অলৌকিক লীলা দেখাইলেন? বাস্তবিকই ঐরূপ ঘটিয়াছিল? আমরা উহার উত্তরে বলিতে চাই যে উপনিষদের গভীরতত্ত্ব ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণাদি গল্পচ্ছলে পুরাণাদিতে বিবৃত। উপনিষদ বলিলেন

"যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ"

অর্থাৎ যিনি (ঈশ্বর) অগ্নিতে যিনি জলেতে যিনি বিশ্বভুবনে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। পুরাণকারও স্থূলভাবে দেখাইলেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্থলেও আছেন জলের ভিতরেও আছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহিরে বিরাজ করিতেছেন।

দিনশেষে মথুরায় উপনীত হইয়া, কৃষ্ণ ও রাম পুরীদর্শনে বহির্গত হইলেন। অক্রূর রথ লইয়া কংসকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন এই অবসরে দেখিলেন বস্ত্ররঞ্জনকারী রজক অদূরে যাইতেছে। তাঁহারা তাহার সমীপস্থ হইয়া উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সেই ব্যক্তি কংসের অনুগ্রহ লাভে বিলক্ষণ গর্ব্বিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ রোষদৃপ্ত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন, এবং নীল ও পীত বস্ত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন। পরে মাল্যজীবীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে সে প্রফুল্লবদনে স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ মাল্য ও পুষ্পে তাঁহাদিগকে ভূষিত করিল। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন কুব্জা কংসের জন্য অনুলেপন লইয়া যাইতেছে। কৃষ্ণ তাহা প্রার্থনা করিলে কুব্জা তাঁহাদের গাত্রের উপযুক্ত বর্ণানুরূপ অনুলেপন সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার কুব্জ দেহ সরল করিয়া দিলেন। কুব্জা তখন বিবিধ বিলাসবিভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য আকিঞ্চন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ "পরে আসিব" বলিয়া কুব্জাকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং বলদেবের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা ধনুর্যজ্ঞ শালায় উপস্থিত হইয়া প্রকাণ্ড ধনু দেখিতে পাইলেন এবং কৃষ্ণ তাহাতে জ্যা যোজনা করিয়া বলপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। কংসের অনুচরবর্গ কুপিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু তিনি সৈন্যসামন্তের সহিত তাহাদিগকে সমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মল্লযুদ্ধের আয়োজন হইল। নগরবাসিগণের জন্য মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিণী রমণী ও বারনারীদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কংস রাজবেদী গ্রহণ করিলে মল্ল-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। হস্তিপকচালিত কুবলয়াপীড় রামকৃষ্ণের প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যের সমক্ষে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে। কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিয়া রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সমাগত সজ্জনেরা নানা রূপ অনুমান করিতে লাগিল। এইখানে বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা একটু দীর্ঘ হইলেও ভাগবতকার একটি শ্লোকে তাহাদের মনোগত ভাব অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গাঙ্গনে মল্লগণের পক্ষে বজ্র, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রমণীগণের পক্ষে কন্দর্প, গোপগণের স্বজন, দুরাত্মা রাজাদিগের শাসয়িতা, নিজ পিতামাতার নিকটে শিশু, কংসের মৃত্যু, অজ্ঞগণের পক্ষে বিরাট, যোগীদিগের পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিগণের পরম দেবতা রূপে অর্থাৎ বিভিন্ন লোকের নিকটে বিভিন্নভাবে

প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ১০ম স্কন্ধ, ৪৩ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক।

সে যাহা হউক রামকৃষ্ণকে রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া চানূর কহিল। তোমরা বীর্য্যবান; শক্তি পরীক্ষা জন্য রাজা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, আইস আমরা মল্লক্রীড়া করি। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন আমরা বালক, আমরা বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে চাহি। চানূর কহিল তোমরা বালকও নহ, কিশোরও নহ, তোমরা বলশালী ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ, তুমিত অবলীলাক্রমে হস্তীকে সংহার করিলে; যাহারা বলী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, তাহাতে কোন অংশে অধর্ম্ম নাই। এই বলিয়া চানূর কৃষ্ণের সহিত এবং মুষ্টিক বলরামের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহারা কি করিতে পারে, প্রবল বিক্রমের পরিচয় দিয়া অবিলম্বে নিজ নিজ জীবন আহুতি প্রদান করিল। তদ্দর্শনে কূটনামা দানব এবং নল ও তোশল নামা দুইজন মল্ল অগ্রসর হইল। রাম কৃষ্ণ তাহাদিগকেও নিহত করিলেন। কংস ভীত হইয়া সহসা আসন হইতে উত্থিত হইল, কিন্তু গরুড় যেরূপ সর্পকে গ্রহণ করে কৃষ্ণ তদ্রূপ উহাকে গ্রহণ করিলেন। কংস নিষ্পিষ্ট হইয়া অচিরে প্রাণত্যাগ করিল। চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। কংসভ্রাতা কঙ্কন ও ন্যগ্রোধ ভ্রাতৃবধের প্রতিযোধ গ্রহণ করিবার জন্য কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল কিন্তু পরক্ষণেই নিহত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব ত্বরান্বিত হইয়া বসুদেব ও দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন। বসুদেব ঈশ্বরজ্ঞানে শঙ্কিত হইয়া কৃষ্ণের স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন, কিন্তু আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ বুঝিলেন আমাদের প্রতি পিতা মাতার ঈশ্বরবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। এই ভাবিয়া তাঁহাদের ও যদুবংশীয় সকলের মোহ সম্পাদন জন্য জনমোহিনী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বসুদেব ও দেবকী মায়ামনুষ্য হরির মায়ায় বিমোহিত হইয়া দুই ভ্রাতাকে ক্রোড়ে লইয়া পরমানন্দে পুলকিত হইলেন, বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইল, স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া অশ্রুধারায় তাঁহাদিগকে সেচন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাতামহ কংসপিতা উগ্রসেনকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যযাতির অভিশাপ আছে বলিয়া যদুবংশীয়দিগের মধ্যে কেহ রাজ্যভাগী হইলেন না।

এদিকে কংসকে বিনষ্ট দেখিয়া কংসের পত্নী ও মাতৃগণ আসিয়া বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও নিজে ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ভাগবতের এই অংশের বর্ণনা ঠিক অধ্যাত্মরামায়ণের অনুরূপ। ভাগবতে ইহাও আছে যে কংস পান ভোজন বিচরণ নিদ্রা জাগরণ ইত্যাদি সকল সময়েই চক্রধর নারায়ণকে (কৃষ্ণকে) সম্মুখে দর্শন করিত, এক্ষণে তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হইল। ভাগবতের মূলে আছে

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং
পিবন্নদন বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যতস্তদেব রূপং দুরবাপমাপ।

অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—

ভূত্যৈঃ সহ সদা রামচরিতং দ্বেষসংযুতঃ
শ্রুত্বা রামাৎ স্বনিধনং ভয়াৎ সর্ব্বত্র রাঘবং
পশ্যন্নুদিনং স্বপ্নে রামমেবানুপশ্যতি
রামেন নিহতশ্চান্তে নির্দ্ধূতাশেষকল্মষঃ
রামসাযুজ্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ।

এতদ্ভিন্ন অধ্যাত্মরামায়ণে কৌশল্যার সমক্ষে রামচন্দ্রের মায়াবিস্তারবর্ণনা ও কৌশল্যার স্তবস্তুতি, বিষ্ণুপুরাণের শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার এবং বসুদেবের স্তবস্তুতির অনুরূপ। পাঠকবর্গ উহা নিজে মিলাইয়া দেখিবেন।

অতঃপর রাম ও কৃষ্ণ নন্দের নিকট গমন করিয়া কহিলেন আপনারা স্নেহপূর্ব্বক আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা আপনার যে পুত্র নহি এরূপ মনে করিবেন না, পোষণ ও রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শিশুগণকে

যাঁহারা প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই পিতা তাঁহারাই মাতা। হে তাত! আপনারা এক্ষণে ব্রজে গমন করুন, আমরাও, সুহৃদগণের সুখ বিধান করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতি যে আপনারা, আপনাদিগকে দেখিতে যাইব। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে ব্রজবাসী জনগণ সহিত নন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বসনভূষণাদি দ্বারা পরমাদরে পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া নন্দ স্নেহাধিক্য বশতঃ প্রথমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরে রাম ও কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া গোপগণ সহিত ব্রজে গমন করিলেন।

তদনন্তর বসুদেব স্বীয় পুরোহিত গর্গাচার্য্য ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বীয় পুত্র দ্বয়ের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করাইলেন, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া গুরুকুলবাস বাসনায় কাশীস্থ অবন্তিপুর নিবাসী সন্দীপনি মুনি সমীপে গমন করিলেন। দ্বিজবর সন্দীপনি গুরু সেই দুই শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শিল্প কলাদি সমুদয় বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ নিখিল বেদ, নীতি, ধনুর্ব্বেদ মীমাংসাদর্শন ছয় প্রকার রাজনীতি চতুষষ্ঠী কলা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আইসেন তখনও তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই বা তখনও তিনি গুরুগৃহে গমন করেন নাই। সুতরাং গোপীগণের সহিত ভাগবতোক্ত তাঁহার রাসলীলা যে কতদূর সঙ্গত হইতে পারে তাহা পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। হরিবংশ যে ভাবে বুঝেন আমরাও সেইভাবে বলিতে চাহি, রাসলীলা বাল্যক্রীড়া মাত্র, উহাতে বাস্তবিক বিবাহিতা যুবতীগণের বিশেষ সংশ্রব ছিল না। ভাগবতের রাসলীলা কবির হস্তে কল্পনার মাত্রাধিক্যে অতিরঞ্জিত ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বৃন্দাবন হইতে অক্রূর কংসের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মথুরাযাত্রা অবলম্বনে ব্যাকুলা গোপীগণের হা হুতোস্মির ভিতর দিয়া আষাঢ়ের রথযাত্রা অনুস্যূত। প্রকৃত পক্ষে ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশে উহার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের মথুরাযাত্রাকে সোজা রথ ধরিয়া লইলেও আটোহ পরে পুনর্যাত্রা কৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এইবারে এইটুকু বলিয়া রাখিলাম। আগামী বারে রথযাত্রা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৪২৷৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৯৩৫৷৵৩
সমষ্টি	...	১১৭৮৴৩
ব্যয়	...	২১১৷৶০
স্থিত	...	৯৬৬৷৯৵৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	
বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট	২৮৪৷৶০
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট	
বিল এককেতা	১৩৮৵৩
	৯২২৷৷৩
সমাজের ক্যাশে মজুত	৪৪৵০
	৯৬৬৷৯৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৭৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পারিবারিক দান ১৬৲

শ্রীযুক্ত বাবু পরাণকৃষ্ণ সরকার মাসিক দান। ২৲

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাম্বৎসরিক দান। ১৪০৲

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲

১৬৭৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২০।৶/৬

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ১২৲

„ „ সুরেশনাথ রায়, জাড়া ৫৷৷৵০

„ „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, ভাগলপুর ২৸/৬

২০।৶/৬

পুস্তকালয় ... ৪৶/৬

যন্ত্রালয় ... ৫০৲

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ১৲

সমষ্টি ২৪২৷৷৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৬৭৸৶/৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৩ ৶/৬

পুস্তকালয় ... ৸/০

যন্ত্রালয় ... ২৯।৵০

সমষ্টি ২১১।৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ৪৭৭।৵০

পূর্ব্বকার স্থিত ... ৯৬৬৷৷৵৩

সমষ্টি ... ১৪৪৪ ৩

ব্যয় ... ৮৪০৸/৬

স্থিত ... ৬০৩৵৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১০৩৵৯

৬০৩৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ২৪০৸০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০৸০

২৪০৸০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৬৸০

৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা ১৲

শ্রীযুক্ত „ গোপালচন্দ্র সুর, ঐ ৩৲

„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ ৬৲

„ „ গৌরীশঙ্কর রায়, কটক ৩।৵০

„ „ ভবদেব নাথ, কালনা ৩।৵০

১৬৸০

পুস্তকালয় .. ২৩৸০

যন্ত্রালয় ... ১৭৯৸০

গচ্ছিত ... ৮।৵০

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৮৲

সমষ্টি ... ৪৭৭।৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৭০৩ /৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৪৸৵০

পুস্তকালয় ... ১৷৷৵৬

যন্ত্রালয় ... ১১৩৶৬

গচ্ছিত ... ৮৲

সমষ্টি ... ৮৪০৸/৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭৩ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়			পৃষ্ঠা
একটি কথা (যোগ)	(শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	... ...	৭৩
আত্মার অমরত্ব	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	... ...	৭৫
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)		৭৮
কৃষ্ণাবতার	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	... ...	৮৩

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

মধ্বর্থা১৯০৬। কলিগতাব্দ ৫০০৭। ১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

"আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭২ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

একটি কথা। (যোগ)

৫ আষাঢ় ১৮২১ শক।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥

বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনাসক্ত আত্মা আত্মাতে যে সুখ লাভ করেন, সেই ব্রহ্ম-যোগযুক্তাত্মা অক্ষয় সুখ সম্ভোগ করেন।

প্রভাতে উঠিয়া নিত্য-নিয়মিত রূপে শ্রীমন্মহর্ষি গুরুদেবের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলাম। কিন্তু গুরু-দেবের অদ্য কোন সম্ভাষণা বা কোন জিজ্ঞাসা নাই। তিনি প্রশান্ত ভাবে উন্নত-শির-গ্রীব হইয়া যেমন বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। তাঁহার ওষ্ঠোপরি তর্জ্জনীয় অঙ্গুলীটি স্থাপিত ও নেত্র তৃতীয়াংশে নিমীলিত, কখন কখন বা তাহা অর্দ্ধ নিমীলিত হই-তেছে। আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভাবিলাম অদ্য বা ইহাঁর শরীর ভাল নাই, তাই বহির্দ্দিকে চিত্তকে আনয়ন করিতে ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। পূর্ণ এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল—বলিলেন "চক্ষের জল দাও"। দিলাম—দিয়া বলিলাম, আজ কি শরীর ভাল নাই? উত্তরে বলিলেন, "বেশ আছে—খুব সুস্থ আছি, তাই যোগে আনন্দে ছিলাম। আমি কেবল পরমাত্মাতে একান্তে অবস্থান করিতেছিলাম—এই যোগে অনন্তকাল অবস্থান করিব এই আভাস পাইয়াছি। এই যোগের সময়ে আর অন্য কাহাকেও বা অন্য কিছুই দে-খিতে পাইতেছিলাম না, খোদা বা মাবুদ — কেবল ঈশ্বরই আমার সঙ্গে ছিলেন। আ-কাশও ব্যবধান ছিল না। আকাশ ব্যবধান থাকিলেই তুমি, তিনি ও ইহা, উহা, তাহার জ্ঞান হয়। কিন্তু আমি কেবল সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত পরমাত্মাকেই দেখিতেছিলাম ও তাঁহাকেই প্রীতি করিতেছিলাম, তাঁহা ছাড়া আর কাহাকেও বা কোন্ পদার্থকেই দেখিতেছিলাম না, আর তিনি কেবলই আমাকেই দেখিতে-ছিলেন ও অমৃত ভোগ প্রদান করিতে-ছিলেন। এই যোগে যুক্ত হইলে সক-লেই আপনার আপনার আত্মাতে,পরমাত্মার অধিষ্ঠান জানিতে পারে, অন্য কিছুই দেখে

না—অন্য কিছুই জানে না। ঈশ্বরও এই রূপ প্রত্যেক যোগীর নিকটে কেবল তাঁহারই আপনার একমাত্র বস্তু হইয়া থাকেন। আমি উৎসাহ সহকারে বলিলাম যে, "অত্র পিতা অপিতা ভবতি" মন্ত্রটি এই ভাবের। মহর্ষিদেব নিমেষের মধ্যে সমস্ত মন্ত্রের ভাব স্মরণ করিয়া বলিলেন যে "যাহা বলিলাম তাহা ঐ মন্ত্রেরই ভাবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। "অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসো নৈবাগতং পুণ্যেনাবাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।"

এই যে বলা হইল, এ অবস্থায় চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, স্তেন অস্তেন হয়। কিন্তু সে কখন হয়? আমার পরলোক ও মুক্তির উপদেশে তাহা সুস্পষ্ট বলিয়াছি, "যে ব্যক্তি পাষাণসম কঠিনহৃদয় লইয়া জগতে বিচরণ করিল, নরহত্যা, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, সংসার-বিপ্লবকারী ভ্রষ্টাচার প্রভৃতি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মে জীবন ক্ষেপণ করিল, পাপলোক তাহারই জন্য। এই পাপলোকে থাকিয়া পাপাশ্রিত দেহ ধারণ করিয়া অনুতাপের ক্রন্দনে অনুশোচনার হাহুতাশে কালক্রমে তাহার কুটিল পাপ সকল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ভস্মীভূত হইয়া গেলে আত্মপ্রসাদের বিমল জ্যোৎস্নায় তাহার অন্তর্দ্দেশ আলোকিত হইবে। পরিশেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবসানে সেই বিগতপাপ আত্মা পুণ্যশরীর ধারণ করিয়া পুণ্যলোকে গিয়া পূর্ব্বজন্মে যাহা কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিল, তাহার ফল উপভোগ করিতে পাইবে; এবং পুণ্যফল ভোগ শেষ হইলে জ্ঞানে, ধর্ম্মে প্রেমে কৃতাত্মা হইয়া সে আবার দেবলোকে যাইতে সক্ষম হইবে। * * স্বর্গলোক হইতে উন্নত স্বর্গলোক লাভ করিয়া দেবাত্মা তাহার সমধিক তেজস্বী চক্ষুবলে ও প্রখর বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যতর রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। সেই কৌশলের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও মঙ্গল ভাবের নিদর্শন পাইয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। সে দেবতাদিগের সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল গীতে স্বর্গরাজ্য পরিপূরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে প্রাচীন দেবতাদিগের নিকট শিক্ষা পাইয়া তাহার বিজ্ঞান আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। যখন বিজ্ঞান উজ্জ্বল প্রেম বিস্তারিত হইল, সেখানকার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তখন তাহার নিকট উন্নত স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেখানকার শিক্ষা শেষ হইলে আবার উন্নততর স্বর্গের শিক্ষা আরম্ভ হইল। লোক লোকান্তর পর্য্যটনে যত ই তাহার বিজ্ঞান প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই সে ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান-ক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল। উন্নত লোকের ও শেষ নাই, ঈশ্বরের উন্নত জ্ঞান-ক্রিয়ারও অবধি নাই, বিজ্ঞানের বিস্তারেরও অন্ত নাই। এইরূপে যখন এই দেবতা অধিকাধিক উন্নত জ্ঞানক্রিয়ার পরিচয় পাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও গিয়া অনন্ত জ্ঞানকে ধরিতে পারিল না, তখন তাহার তাঁহাকে লাভ করিবার স্পৃহা ক্রমিকই উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সে লোক পরিভ্রমণে নিষ্কাম হইল, অনন্ত জ্ঞানকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইল, তাহার বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয় হইতে "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই" এই বিষাদের গান অহরহ ধ্বনিত হইতে

লাগিল, তাঁহাকে পাইবার সকল পরিশ্রম বিফল দেখিয়া সে তীব্র বিলাপ করিতে লাগিল, স্বর্গসুখও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তখন সে মুক্তি লাভের অধিকারী হইল। সেই ভক্তবৎসল পরমেশ্বর তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে তাহাকে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন এবং দেশকালবদ্ধ সংসারের অতীত আপনার অন্তরতর অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিলেন। সেখানে শরীরের অভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিবৃত্ত হইল, বহির্বিষয়ের অভাবে বিজ্ঞানের ক্রিয়া নিরস্ত হইল, মনের ভাব সকলও তাহাকে আর অধিকার করিতে পারিল না। তখন সেই আত্মজ্ঞানের পরিমিত মাত্রাকে ঈশ্বর পূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি আপনার পদানত ভক্তকে সকলই প্রদান করেন, আপনার জন্য কিছুই রাখেন না। তখন সে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে অনন্ত জ্ঞান প্রেমানন্দকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত ছায়াতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত হইল। By love and worshipe blends itself in God. জীবাত্মার মুক্ত অবস্থা পরমাত্মারই সাক্ষাৎ প্রতিবিম্ব। পরমাত্মারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই প্রসাদে জীবাত্মা মুক্ত হয় এবং তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহা অপেক্ষা আর কোনো লাভকেই অধিক লাভ মনে করে না, তাঁহাতেই কামনার সমস্ত ফল উপভোগ করে। এই অবস্থাকে উপলব্ধি করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

"অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ।

ইহাই অধ্যাত্ম যোগ—ইহাই শ্রেষ্ঠ যোগ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২০ শকাব্দা। ২৩ চৈত্র, বুধবার।

আত্মার অমরত্ব।

অধ্যাত্মবিদ্যার সার গীতা বলিতেছেন,

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী"॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে। আরো বলিতেছেন,

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।"

শস্ত্র সকল ইহাঁকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাঁকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না, এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আত্মা যে অবিনাশী ইহা, সকল দেশের সকল মনুষ্যের মনে স্বভাবতই উদিত হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক বিশ্বাসকে, জ্ঞানীগণ প্রমাণ দ্বারা আরো দৃঢ়ীভূত করেন। আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিরাও মনে করে, মরণোত্তর তাহারা আবার কংগো নদীর কূলে বসিয়া তালের অমৃতময় সুরস পান করিতে পাইবে।

জ্ঞানীরা প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখেন যখন একটি পরমাণুর চিন্তাশক্তি নাই, তখন দেহাশ্রিত সহস্র সহস্র পরমাণু একত্রিত হইলেই যে তাহাদের সমষ্টির চিন্তাশক্তি জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? সুতরাং দেহের চিন্তাশক্তি নাই। তদ্বিপরীত বস্তু যে আত্মা তাহারি চিন্তা শক্তি আছে। আত্মা এই শরীরকে আ-

শ্রয় করিয়া আছে। আত্মা কোন ক্রমেই জড় পদার্থ নহে। জড়পদার্থই রূপান্তরিত হয়। কিন্তু যে জড় নহে, সে কোন রূপেই বিশ্লেষণ-ক্রিয়া দ্বারা রূপান্তরিত হয় না। সে যেমন তেমনিই থাকে। চিরদিনই তাহার স্মরণ মনন ও চিন্তন প্রভৃতি কার্য্যে অধিকার থাকিবে। অমর আত্মার এই লক্ষণ জানিবে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন, আত্মায় যে দয়া প্রেম রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি প্রবৃত্তি, নানাবিধ ভাব, জিজীবিসা, স্বীয় অনস্তিত্বের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা নিহিত আছে এবং সদনুষ্ঠানে তাহার আত্মপ্রসাদ এবং পাপাচরণে আত্মগ্লানি জন্মিয়া থাকে, ইহাতেই তাহার অমরত্বের প্রমাণ হয়।

তৃতীয়তঃ আত্মা অমর না হইলে, পরমেশ্বরের ন্যায়-বিচার মঙ্গলভাব পরমজ্ঞান ও সত্যভাবের সার্থক্যই হইতে পারে না। অন্যান্য যুক্তির মধ্যে একটি প্রধান যুক্তি এই, যে, আত্মা পূর্ণতার দিকে অনবরতই অগ্রসর হইতেছে। মনুষ্যের বুদ্ধিতে ইহা আসিতেই পারে না, যে, যে আত্মার শক্তি ও গুণ, বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ও নব নব উন্নতি লাভ করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে, সে যে সৃষ্ট হইবা মাত্রই, তাহার অস্তিত্বে বিসর্জ্জন দিবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। আত্মার এই সকল শক্তি তবে কি নিরর্থক হইবে? আত্মা যে পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রমাণ এই।

পশুদিগের প্রকৃতি দেখ, তাহাদের এখানে যতটুকু উন্নতি হইবার, তাহা তাহাদের জীবন কালের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়েই হইয়া থাকে। তাহার পরে যদি তাহারা আর দশ সহস্র বৎসরও জীবিত থাকে, তাহাদের সে উন্নতির আর রেখামাত্রও বৃদ্ধি পায় না। মানুষ যদি উন্নতির পথে, এমন করিয়া বিরাম পাইত, এবং পশুদিগের ন্যায় যদি তাহার মনোবৃত্তি সফল এখানে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার জীবন কালেই উন্নতি হইতে নিবৃত্ত হইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, মানুষের আত্মা পতনশীল এবং বিনশ্বর। কিন্তু ইহা কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, যে, যে জীব চিন্তাশীল, উন্নতিশীল, সে কি কেবল এই বিশাল সৃষ্টি দর্শন মাত্র করিয়া, ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলভাব জ্ঞান ও শক্তির আভাস মাত্র পাইয়া, এবং জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু হইবা মাত্রই চিরবিনাশের করাল কবলে পতিত হইবে? মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে আপাততঃ মনে হয়, যেন সে কেবল আপনার প্রবাহ রক্ষার্থেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে আপন স্থানে বসাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করে। সমুদ্র মধ্যে যেমন এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গের অনুবর্ত্তী হয়, এখানে তেমনি এক উত্তরাধিকারীর পর আর-এক উত্তরাধিকারী আসিয়া উপস্থিত হয়। বোধ হয় না যে মনুষ্য জীবন ভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছে; যেন সে আর এক জনের হস্তে ইহা সমর্পণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছে। পশুদের বিষয়ে এরূপ মনে করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ তাহারা স্বীয় স্বীয় জীবনে আপনাপন কৃত্য সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করিতে পারে। গুটি পোকা সূতা প্রস্তুত করিয়াই মরিয়া যায়। ঐটুকুই তাহার জীবনের কার্য্য। কিন্তু মানুষ এখানে পূর্ণ জ্ঞানের অল্প মাত্রই উপার্জ্জন করে। সে এখানে মৃত্যুর পূর্ব্বে, সমুদয় ঋণকে বশীভূত করিতে

যথেষ্ট সময় পায় না। আপন আত্মাকে ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে অক্ষম। অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর এমন গৌরবান্বিত জীবকে কি কোন নীচ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি এমন জ্ঞানের অধিকারী জীবকে ক্ষণস্থায়ী করিয়া অকালে অপক্ক অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারেন? তিনি আত্মাকে সদ্‌গুণ সমূহে শোভিত করিয়া কি তাহাদের উৎকর্ষ সাধনে অবসর দিবেন না? ইচ্ছা দিয়া কি তাহাকে চরিতার্থ করিবেন না? আশা দিয়া কি তাহাকে সফল করিবেন না? উপরে অনন্তকোটি নক্ষত্রলোকে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। সেই জ্ঞানের প্রতি চাহিলেই বুঝিতে পারি, যে মনুষ্যের সৃষ্টিতেও তাঁহার সেই জ্ঞানই প্রকাশ পাইতেছে, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারি, যে মনুষ্যের আবাস ভূমি যে এই মর্ত্ত্যলোক সে কেবল ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় লোকে যাইবার প্রথম শিক্ষাস্থান মাত্র। নিশ্চয়ই মনুষ্য এখানকার শিক্ষা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের তারতম্য অনুসারে যথোপযুক্ত লোকে মরণোত্তর চলিয়া যাইবে। সেখানে সে আবার শিক্ষা ও ধর্ম্মলাভ করিয়া আরো উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে ক্রমে ক্রমে উত্থিত হইতে থাকিবে। আত্মার উন্নতির সীমা নাই, ধর্ম্মভাবের মধ্যে এই ভাব যেমন আনন্দকর এমন আর কিছুই নাই। আত্মায় স্বভাবতঃ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। যখন সে জানিতে পারে যে তাহার বল, তাহার জ্যোতিঃ তাহার ধর্ম্ম তাহার জ্ঞান অনন্তের অভিমুখে যাইতেছে, তখনই সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে থাকে। ঈশ্বরের চক্ষেও ইহা শোভনতম দৃশ্য, যে তাঁহার সৃষ্ট জীব সকল, চিরদিনই নব নব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া, তাঁহার অতুল্য সাদৃশ্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। পরিমিত জীবাত্মা ক্রমশঃ অপরিমিত পরমাত্মার সাদৃশ্য ধারণ করিবে, এই ভাবই কি নিকৃষ্ট মনুষ্যকে উৎকৃষ্টের প্রতি বিদ্বেষ নির্ব্বাণ করিতে শিক্ষা দিবে না? উৎকৃষ্টকে কি নিকৃষ্টের প্রতি ঘৃণা দূর করিতে উত্তেজিত করিবে না? যে উন্নতলোকনিবাসীকে, মনুষ্য এক্ষণে দেবতা বলিয়া মনে করিতেছেন, কালে এমন সময় আসিবে, যখন মনুষ্য আবার সেই দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি সেখানে যাইয়া মনুষ্যকে আবার আপনার পূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত দেখিতে পাইবেন। এই প্রকারে জগতে জীবের মধ্যে চিরদিনই উচ্চ ও নীচ শ্রেণী রহিয়া যাইবে; অথচ জীব উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে যাইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম ও আনন্দের পর আনন্দ লাভ করিতে থাকিবে। পরমাত্মা আত্মার ভিতর কত যে অক্ষয় শক্তি জ্ঞান ও আনন্দ গুপ্তভাবে রাখিয়াছেন, তাহা কে মনন করিতে সক্ষম হয়? তাহা মনে হইলে, একবারে আত্মা বিস্ময় ও ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়।

হে পরমাত্মন্! আত্মা মৃত্যুর পরে জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া নব নব লোকে যাইয়া যে কত আনন্দ উপভোগ করিবে এবং কতদিন পরে তাহার জ্ঞানের মাত্রা পরিপূরিত হইলে যে সে তোমাকে পূর্ণ জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে তাহারই জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে তুমি কৃপা করিয়া আত্মার, সে আকুলতা প্রশমন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

এই গেল বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত বেদান্ত-দর্শনের ঐক্য। তাহার পরে আসিতেছে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত নিরীশ্বর কাপিল দর্শনের ঐক্য।

কাপিল সাংখ্য-দর্শন যে, প্রকৃত প্রস্তাবেই বৌদ্ধদর্শন, "তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন—তবে প্রণিধান করুন্;

দর্শন=আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। আন্বীক্ষিকী শব্দ অন্বীক্ষণ শব্দ হইতে আসিয়াছে। অন্বীক্ষণ=অনু+ঈক্ষণ=অনু+দর্শন। তবেই হইতেছে যে, দর্শন=অনুদর্শন। কিসের অনুদর্শন? ধর্ম্মশাস্ত্রের মতামত সমালোচনা করিয়া তাহার মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করিবার জন্যই দর্শন-শাস্ত্র হইয়াছে; অতএব, দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অনুদর্শন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কাপিল সাংখ্য-দর্শন কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুদর্শন? কাপিল সাংখ্যদর্শন কি বেদোপনিষদ্ শাস্ত্রের অনুদর্শন? বেদোপনিষদ্ তো কাপিল সাংখ্যের ন্যায় নিরীশ্বর নহে। সাংখ্য-দর্শনকার বলেন যে, ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মুক্তি; কিন্তু বেদোপনিষদের মতে দুঃখ-নিবৃত্তি অতি তুচ্ছ কথা—বেদোপনিষদের মতে ব্রহ্মের সহিত প্রগাঢ় সম্মিলন-জনিত অনুপম আনন্দ উপভোগই মুক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ। সাংখ্য-দর্শনের আদি অন্তের ঐ দুটি মুখ্য কথা বেদোপনিষদ্ শাস্ত্রের সহিত যেমন মেলে না—বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত তেমনি সর্ব্বাংশে মেলে; তার সাক্ষী প্রথমতঃ মূল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং কাপিল সাংখ্য দুইই নিরীশ্বর; দ্বিতীয়তঃ দুয়েরই মতে ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। ফলে, "ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি" এই কথাটার গায়ে লেখা রহিয়াছে যে, বৌদ্ধ শাস্ত্রই উহার মূল আকর; কেন না, বৌদ্ধ শাস্ত্রের গোড়ার কথা জীবের ক্লেশ, মাঝের কথা—ক্লেশের মূলোচ্ছেদ যেরূপে হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপায়-চেষ্টা; শেষের কথা—ক্লেশের ঐকান্তিক নিবৃত্তি। এই তিনটী মূল কথা এবং তাহার বিস্তৃত শাখোপশাখা ভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রের মুখে আর কোনও কথা নাই। অতএব, এটা যখন স্থির যে, দর্শন-শাস্ত্রের আরেক নাম আন্বীক্ষিকী বিদ্যা—দর্শন-শাস্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই অনুদর্শন, তখন সেই সঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত যে, কাপিল সাংখ্য-দর্শন বৌদ্ধ শাস্ত্রেরই অনুদর্শন। অতঃপর বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত সেশ্বর পাতঞ্জল সাংখ্যের কিরূপ ঐক্য তাহা দেখা যা'ক।

কাপিল-সাংখ্য এবং পাতঞ্জল সাংখ্য দুয়ের মধ্যে আর আর সমস্ত বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ মতের মিল আছে—কেবল একটী বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়; সেটি হ'চ্ছে এই যে, কাপিল সাংখ্য নিরীশ্বর, পাতঞ্জল সাংখ্য সেশ্বর। পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে একপ্রকার গোঁজা-মিলন-দেওয়া-ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে; এরূপ ভাবে অবতারণা করা হইয়াছে—যেন তাহা পাঁচ আঙ্গুলের পার্শ্ববর্ত্তী ষষ্ঠ আঙ্গুল; তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলে পাতঞ্জল শাস্ত্রের অঙ্গ-হানি হওয়া দূরে থাকুক্—বরং আরও অঙ্গ-সৌষম্য হয়। পতঞ্জলি ঋষি মন স্থির করিবার আর আর নানা উপায় প্রদর্শন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, আর একটি উপায় হ'চ্ছে

ঈশ্বর-প্রণিধান; অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যতিরেকেও উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া যোগে সিদ্ধি-লাভ করা যাইতে না পারে এমন নহে, তবে কিনা—ঈশ্বর-প্রণিধানও সিদ্ধি-লাভের আর আর উপায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্টরূপ ফলদায়ক উপায়। পতঞ্জলি ঋষি ঈশ্বরের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার গোড়া'র কথাটির গাত্রে বৌদ্ধ শাস্ত্রের স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে; পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে ঈশ্বর-নির্ণায়ক প্রথম সূত্রের গোড়াতেই রহিয়াছে "ক্লেশ"। সে প্রথম সূত্র এই:—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ"

ক্লেশ হইতে এবং কর্ম্মফল-পরিণতির আধার যে, বাসনা, সেই বাসনা হইতে, নির্লিপ্ত পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। আদি বুদ্ধের লক্ষণের সঙ্গে ঈশ্বরের এই লক্ষণটির দিব্য মিল রহিয়াছে। বুদ্ধদেব আর পাঁচজন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ; কিন্তু তিনি তোমার আমার মতো যে সে পুরুষ নহেন—তিনি মহাপুরুষ। তা বলিয়া, মনুষ্য-বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন; কেন না মনুষ্য-বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে; মনুষ্য-বুদ্ধ ক্লেশ এবং বাসনায় জড়িত। আদি বুদ্ধই নিত্য বুদ্ধ—তিনি ক্লেশ এবং বাসনা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ-বিশেষ—তিনিই ঈশ্বর। তাহার পরসূত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিতেছেন "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞরূপ বীজ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ নিরতিশয় অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা বিকাশপ্রাপ্ত। বুদ্ধদেবেও সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরসূত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিতেছেন যে, "স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন।" এই যে একটি কথা পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—যে, "ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন" এ কথাটির ভিতরে একটি নিগূঢ় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লুক্কায়িত আছে; তাহা এই:—পতঞ্জলি ঋষির জীবিত কালেই হউক্, অথবা তাহার এক আধ শতাব্দী পূর্ব্বেই হউক্, বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর-বোধে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; পতঞ্জলি ঋষি তাই তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, মনুষ্য বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন—যেহেতু তিনি কাল-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেহেতু তিনি জন্মিয়াছেন মরিয়াছেন। কে তবে ঈশ্বর? না যিনি বুদ্ধেরও গুরু, শুধু তা নয়—বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু—যিনি কাল-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন—তিনিই ঈশ্বর; আদি বুদ্ধই ঈশ্বর। অতএব নেপাল এবং তিব্বত-প্রদেশীয় বুদ্ধেরা আদি-বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছে এটা যখন স্থির; আর, এটাও যখন স্থির যে, যোগশাস্ত্রের প্রদর্শিত আদি গুরু মহেশ্বরের লক্ষণের গাত্রে আদি বুদ্ধের লক্ষণের পরিষ্কার ছাপ পড়িয়াছে, তখন বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত যোগ-শাস্ত্রের যে, এক সময়ে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাবে গতিকে বুঝিতে পারা যাইতেছে। ফলে, সাংখ্য দর্শন বৌদ্ধ দর্শনেরই নামান্তর। বৌদ্ধ শাস্ত্র যেমন প্রথমে নিরীশ্বর ছিল—তাহার পরে আদি বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সেশ্বর হইয়াছিল; সাংখ্য দর্শনও তেমনি প্রথমে নিরীশ্বর ছিল (যেমন কাপিল সাংখ্য), তাহার পরে সর্ব্বজীবের একজন আদি গুরু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিয়া সেশ্বর হইয়াছিল (যেমন

পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্র)। কি আশ্চর্য্য! যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে ভয় করিতেন, সেই বুদ্ধদেবের পথাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদান্ত-দর্শন, এবং সাংখ্য-দর্শন, এই তিন প্রবাহিণীর ত্রিবেণী-সঙ্গম কিরূপ তাহা আমরা দেখিলাম; এক্ষণে বৌদ্ধশাস্ত্রের যে প্রদেশ হইতে পুরাণাদি শাস্ত্র বিনির্গত হইয়াছে, সেখানকার নদীর মোহানাটা কিরূপ তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যাক্।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্টরূপ সাধন-প্রধান ধর্ম্ম। সাধনের লক্ষ্য ভূত কালের দিকে নয় কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের দিকে; সৃষ্টির দিকে নয় কিন্তু পরিত্রাণের দিকে—মৃত্যুকে জয় করিবার দিকে। এই জন্য মৃত্যুঞ্জয় শিবই বৌদ্ধদিগের এবং যোগী তপস্বীদিগের বিশিষ্টরূপ আরাধ্য দেবতা। সাধন দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করা—দুঃখ ক্লেশের ঐকান্তিক নিবৃত্তির পথ প্রস্তুত করা—বৌদ্ধশাস্ত্র এবং যোগ-শাস্ত্র উভয়েরই চরম লক্ষ্য; তা ভিন্ন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং যোগী তপস্বীদিগের নিকট ভজনের তেমন আদর নাই। ভজনের মর্ম্ম এবং রস বৈষ্ণবেরা যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কেহই নহে।

ইউরোপ-বাসীরা যেমন তারের লাগাম দিয়া এবং বাষ্পের চাবুক দিয়া বাহিরের প্রকৃতি-অশ্বকে বশীভূত করিয়াছেন—যোগী-তপস্বীরা তেমনি ধৈর্য্যের লাগাম দিয়া এবং শমদমের চাবুক দিয়া অন্তরের প্রকৃতি-অশ্বকে বশীভূত করেন। এখন, কথা হ'চ্চে এই যে, অশ্বকে বশীভূত করিলাম কিন্তু অশ্ব আরোহণ করিয়া গম্যস্থানে গেলাম না; সাধন দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করিলাম কিন্তু ভজন দ্বারা পরমেশ্বরের বিমল প্রসাদবারিতে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলাম না; তবে অশ্বকে বশীভূত করাই বা কি জন্য, চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্য? বুদ্ধদেব কিন্তু ভজনের প্রতি নিতান্তই মৌন-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ষোলো আনা দৃষ্টি ছিল সাধনের প্রতি নিবদ্ধ। রোগী ব্যক্তির চিকিৎসার সময় চিকিৎসক যেমন ঔষধ পথ্যেরই ব্যবস্থা করে—মিঠাই সন্দেশের ব্যবস্থা করে না, বুদ্ধদেব তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সাধনেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—ভজনের কোনো কথাই উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতার পথ পরিস্কার করিবার জন্যই তারের সংবাদ, রেলের গাড়ি, বাষ্পের আলোক, প্রভৃতি আয়াস-সাধ্য ব্যাপারের যোগাড় যন্ত্র আবশ্যক; ভজনের পরম পরিশুদ্ধ আনন্দের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সাধনের পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার আবশ্যক। পথ পরিষ্কার করিবার বিধেয়তা এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শন করিয়া বুদ্ধদেব তো ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন—কিন্তু যাত্রীজনেরা পথ পরিষ্কার করিয়া শুধু কেবল সেই পথে হাঁটাহাঁটি করিয়া জীবন অবসান করিতে পারে না! তাহারা গম্যস্থানে না হউক্—অন্ততঃ মাঝপথের কোনো একটা পান্থশালায় পান ভোজন করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার আবেগ প্রশমন করিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা আর-কাহাকেও হাতের কাছে না পাইয়া বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বৌদ্ধ

সন্ন্যাসী এবং যোগী তপস্বীরা সবে মাত্র ভজনের প্রথম পঁইটাতে পদার্পণ করিয়া সেই খানেই থামিয়া দাঁড়াইলেন—তা বই, ভজনের ভিতর-মহলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই জন্য যোগী-তপস্বীদিগের ভজন সাধনেরই অঙ্গ—তাহা মন স্থির করিবার একতম উপায়; তা বই, তাহা মুখ্য ভজন নহে। যোগী-তপস্বীদিগের এবং বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতাও বিশিষ্টরূপে সাধনের দেবতা—তিনি কে? না শূলপাণি মৃত্যুঞ্জয় অথবা যাহা একই কথা—বজ্রপাণি আদি বুদ্ধ।

দক্ষ যজ্ঞের আখ্যায়িকার প্রতি নিবিষ্ট মনে প্রণিধান করিলে রূপকের পর্দ্দার আড়ালে, বুদ্ধদেবের সহিত মহাদেবের কোলাকুলির একটি আবছায়া-রকমের চিত্র চিন্তার আলোকে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে; কিরূপ তাহা দেখাইতেছি—প্রণিধান করুন ঃ—

বহু প্রাচীন কালের যজ্ঞ ছিল ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া ছাগ মেষাদি এবং হবি দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা; দেবতাদিগের প্রসাদান্ন সকলের সহিত বাঁটিয়া ভোজন করা; আর সেই সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। এক্ষণকার যজ্ঞ হ'চ্চে প্রীতি-ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করা; ঈশ্বর-প্রেরিত সুখ-সম্পদ যথা-পাত্রের সহিত যথা-পরিমাণে বাঁটিয়া ভোগ করা; আর, সেই সঙ্গে জনসমাজের দুঃখ ক্লেশ এবং পাপতাপ প্রশমন করিবার জন্য সকলে মিলিয়া জোগাড় যন্ত্র করিয়া তাহার সুনির্ব্বাহ-পক্ষে সাধ্যানুসারে সহায়তা করা। তখনকার যজ্ঞই হউক্ আর এখনকার যজ্ঞই হউক্, যজ্ঞের অর্থ আর কিছু না—ধর্ম্মের জন্য ন্যায্য-পরিমাণে স্বার্থ-ত্যাগ। দেশকালপাত্র অনুসারে কিরূপ প্রণালীতে কোন্ প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিশিষ্টরূপ ফলদায়ক হয়, তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে বিদ্যা আবশ্যক। সে বিদ্যার নাম সতী অর্থাৎ লোকহিতকরী সদ্‌বিদ্যা। যজ্ঞ মঙ্গলের ব্যাপার; সদ্‌বিদ্যা সত্যের ব্যাপার। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দেবতা যজ্ঞেশ্বর হ'চ্চেন শিব কিনা মঙ্গল; সদ্‌বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেবতা হ'চ্চেন সতী কিনা সত্যরূপিণী দেবী। অতএব শিবের সহিত সতীর বিবাহ আর কিছু না—মঙ্গলের সহিত সত্যের বিবাহ।

লোকে যখন নিষ্কাম-ভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, যখন ঈশ্বরকে মানিয়া প্রীতি ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করে, যখন আপনার সুখসম্পদ যথা-পাত্রের সহিত যথা-পরিমাণে বাঁটিয়া ভোগ করে, এবং যখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের দুঃখক্লেশ অপনোদন করিতে চেষ্টা করে, তখন সে এক কাল! তখন জন্ম মঙ্গল, বিবাহ মঙ্গল মৃত্যু মঙ্গল, সবই মঙ্গল। পক্ষান্তরে যখন লোকে ঈশ্বরও বোঝে না, লোকহিতও বোঝে না, কেবল আত্মসুখই বোঝে; যখন বিশিষ্টরূপ সঙ্গতিপন্ন লোকেরা আপনার নাম, আপনার যশ, এবং আপনার ঐহিক পারত্রিক ইন্দ্রিয়-সুখের কামনায় মহা আড়ম্বরের সহিত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তখন জনসমাজ "দৌর্ভিক্ষাৎ যান্তি দৌর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্‌ভয়ং" দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, পদ-নিক্ষেপ করে; তখন জন্মও অমঙ্গল, বিবাহও অমঙ্গল, সবই অমঙ্গল। কাজেই, জন-সমাজের সেরূপ অবস্থায় বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজা-

পতি মঙ্গল নহে—মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরই তখন শিব কিনা মঙ্গল।

বুদ্ধদেব বোধ হয় শেষোক্ত প্রকার সামাজিক অবস্থার মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ে হয় তো বৈশ্যাদি শ্রেণীর লোকেরা খুবই কষ্টে দিনপাত করিত। ব্যাপক রকমের এবং বিশিষ্ট রকমের কোনো কারণ না থাকিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় ধীর-প্রকৃতি সুবিচক্ষণ দয়ালু ব্যক্তির মনে ছোটো খাটো কারণে এত বড় একটা সুগভীর দুঃখের কাহিনী প্রবেশ পাইতে পারিত না যে, জীবের জন্ম কেবল ক্লেশেরই জন্য। বাস্তবিকই বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান মত হ'চ্চে এই যে, জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা ক্লেশেরই নামান্তর। তাহা যদি হয়—জন্ম যদি নিছক কেবল ক্লেশেরই ব্যাপার হয়, তবে জন্মের মৃত্যু হইলেই তো ভাল হয়! কিন্তু গুরু মহাশয় মরিলেও বালকের নিস্তার নাই—বাবা আরেকটা গুরু মহাশয় আনিয়া যুটাইবে। এ জন্ম মরিলে কি হইবে? মনোমধ্যে যদি বিষয়ের কামনা থাকে—কাম থাকে—তবে সেই দুরন্ত কাম আর একটা জন্ম যুটাইয়া আনিবে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা বা কাম যতক্ষণ না মরিতেছে ততক্ষণ রক্ষা নাই। ক্লেশের মূল জন্ম, জন্মের মূল কাম; তবেই হইতেছে যে, কামই ক্লেশের মূল উৎস। মঙ্গল তবে কে? শিব কে? যিনি কামকে ভস্ম করেন, তিনিই শিব। ফলে, মঙ্গল যদি ক্লেশের মূলোচ্ছেদ না করিবেন—শিব যদি কামকে ভস্ম না করিবেন—আর কে তাহা করিবে? এটা যেন বুঝিতে পারা গেল যে, কাম যখন সকল ক্লেশের মূল, তখন শিব, যিনি মঙ্গল, তিনি কামকে ভস্ম করিতে বাধ্য; কিন্তু, যজ্ঞ তো আর অমঙ্গল নহে—যজ্ঞ বিশিষ্টরূপ মঙ্গল কার্য্য। শিবের নামই যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর হইয়া তিনি যে যজ্ঞভঙ্গ করিলেন—এ'র অর্থ কি আমাকে বুঝাইয়া দেও! অর্থ খুবই স্পষ্ট। শিব যে কারণে কামকে ভস্ম করিলেন, সেই কারণেই কাম-প্রধান যজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন।

পূর্ব্বতন কালে বেদের সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রীতিপ্রধান ছিল। আদিম ঋষিরা দেবতাগণকে প্রিয় বন্ধুর ন্যায় অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন বলিয়াই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া হোমাদি দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি-সাধনে যত্ন করিতেন; এবং যখন মনে করিতেন যে, দেবতাদিগের যথেষ্ট তৃপ্তি-সাধন হইয়াছে, তখন তাঁহাদের প্রসাদান্ন সকলের সহিত বাঁটিয়া ভোজন করিতেন। তাই বলিতেছি যে, আদিম ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ প্রীতিপ্রধান ছিল। তখন, দেবপ্রীতি এবং লোকপ্রীতি যজ্ঞের অন্তরের কথা ছিল। বুদ্ধদেবের সময় যজ্ঞ কামপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল; পুত্রকাম, ধনকাম, যশঃকাম প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলকামনায় দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানের এইরূপ লক্ষ্য-বিপর্য্যয় হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিতে সাহসী হ'ন নাই; তার সাক্ষী—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম; তা বই, কোনো শাস্ত্রেই বলে না যে, যাগযজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এরূপ কামপ্রধান যজ্ঞ—সকাম যজ্ঞ সদ্বিদ্যার অনুমোদিত হইতে পারে না; যেহেতু তাহা মঙ্গলের বিরোধী—শিবের বিরোধী। সকাম যজ্ঞে সদ্‌বিদ্যা অপমানিত হইয়া যজ্ঞস্থানের ত্রিসীমার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। তাহার পরে শিব, কিনা মঙ্গল, জাগ্রত হইয়া সতী-বিসর্জ্জনের প্রতিফল প্রদান করেন—যজ্ঞ ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন।

ক্রমশঃ।

কৃষ্ণাবতার।

১০ম প্রস্তাব।

রথযাত্রা।

আমরা গতবারের প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার সামান্য উল্লেখ করিয়াছি; বর্ত্তমানে উহার প্রামাণিকতা বিষয়ে আলোচনা করিব। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের মধ্যে রথযাত্রার কোন সন্ধান নাই। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত উৎকল খণ্ডেই উহা আলোচিত। ইহা হইতে এই টুকু সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে প্রাগুক্ত তিন গ্রন্থ রচনার সময়ে রথযাত্রা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে নাই। কেননা উক্ত গ্রন্থত্রয়ে উহার বিধান প্রদত্ত হয় নাই। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা, উৎকলখণ্ডে * রথযাত্রা স্নানযাত্রাদির ব্যবস্থা দেখিয়া এবং স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বিবিধ খণ্ডের রচনা পদ্ধতি দেখিয়া উহাদের আধুনিকতা সম্বন্ধে শেষ মীমাংসায় পৌঁছিতে বড় বিলম্ব হয় না। সে যাহা হউক আমরা নিম্নে উৎকলখণ্ডের কতকটা পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

উৎকলখণ্ডকার বারাণসীর উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন একদা মেনকা পরিহাসচ্ছলে স্বীয় কন্যা গৌরীকে কহিলেন পৃথিবীতে যে সমস্ত রমণী আছে তাহারা বিবাহিতা হইলেই পিত্রালয় হইতে স্বামিগৃহে গমন করে, কিন্তু তোমার সেই বৃদ্ধ পতির গুণ কি? তোমাকেই বা বস্ত্রালঙ্কার কি দিয়াছেন? চির দিনই ত আমার গৃহে বাস করিতেছেন, আমার দ্রব্যাদি ভোজনে কালাতিপাত করিতেছেন। অবশ্য এ সকল কথা জামাতাকে বলিও না, কেন না তিনি বিষ্ণুসদৃশ মান্য। গৌরী জননীর মুখে ভর্তৃনিন্দা শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া শঙ্করকে কহিলেন, স্বামিন্! তোমার শ্বশুরালয়ে বাস করা সাতিশয় দোষাবহ হইতেছে। ত্রিশূলী তচ্ছ্রবণে ভবানীকে লইয়া বৃষারোহণে দ্রুতবেগে মধ্যদেশে উপস্থিত হইলেন এবং নানা তীর্থ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগামিনী গঙ্গার উত্তর তটে আসিয়া বসবাসের নিমিত্ত বারাণসী নাম্নী (বিখ্যা) পূর্ব্ব পঞ্চক্রোশ পুরী নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বকর্ম্মাকে অনুমতি দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা শঙ্করের আদেশে শুভ্রবর্ণ বিবিধ দেবালয়, শত শত অট্টালিকা, জনাকীর্ণ জনস্থান, রত্নস্তম্ভ-বিরাজিত রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। সেখানে গমন করিলেই গঙ্গার সুশীতল ও পূত সলিল স্পর্শে জন্মান্তরীণ কলুষরাশি বিনষ্ট হয়। শঙ্কর সেইস্থানেই গৌরীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান বিশ্বনাথ কখন সে পুরী পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাত গেল বারাণসী তীর্থের কথা।

উৎকলখণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ে আছে। পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক পরমধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনান্তে অবভৃত স্নান করিয়া দেবা-

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্যে পণ্ডিত ঠাকুর দাস চূড়ামণি কর্ত্তৃক প্রকাশিত উৎকলখণ্ড।

র্চ্চনা করিতেছেন এমন সময়ে তৎকালীন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত কয়েক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল, মহারাজ! মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহারুক্ষ সমুপস্থিত; সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ স্রোতের অভিমুখে, মূলভাগ বেলাভূমিতে অবস্থিত। সেই বৃক্ষ রক্তবর্ণ, উহার গাত্রে শঙ্খচক্র গদার চিহ্ন, উহা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, উহা সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। বোধ হয় উহা দেবতরু, কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে এখানে সমাগত। রাজা নারদকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার সৌভাগ্য বশতঃ যজ্ঞের ফলস্বরূপ এই অপূর্ব্ব তরুবর আসিয়াছে, এক্ষণে চতুঃশাখারূপ চতুর্ভুজ ভগবানকে অবলোকন করুন। রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। চারিদিকে নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইতে হইলেই রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় মহিতরুবরে কীদৃশী প্রতিমূর্ত্তি বিনির্ম্মিত হইবেক, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল, "এক বৃদ্ধ সূত্রধর যাইতেছে, রাজা স্বপ্নযোগে যে দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন সে তদনুরূপ মূর্ত্তি অতি গোপনে গঠন করিয়া দিবে"।

পঞ্চদশ দিবস মধ্যে মূর্ত্তি বিনির্ম্মিত হইল। রাজা দেখিলেন লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মী বলভদ্র ও সুদর্শনের সহিত দিব্য রত্নসিংহাসনে বিরাজমান। লক্ষ্মী কৃষ্ণাবতারে রোহিণীর গর্ভে বলদেবের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন এজন্য বলভদ্রার আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণা। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারে ও পুরাণে এই দেবী বলদেবের ভগিনী বলিয়া পরিচিতা। পুরুষবেশধারী ভগবান কৃষ্ণ, স্ত্রীবেশধারিণী শক্তিস্বরূপা কমলালয়া লক্ষ্মী—সুভদ্রা, বলদেব, ও দানবগণের বলক্ষয়কারী সুদর্শন চক্র, ভগবানের এই চতুর্বিধ মূর্ত্তি। রাজা ভগবানের এই দারুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং বিবিধ দেশ হইতে প্রস্তররাজি আনয়ন করিয়া বহুকোটি মুদ্রাব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

উৎকলখণ্ডের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে তিনখানি স্বর্ণনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। ভগবান পুরুষোত্তমের রথ গরুড়ধ্বজ, সুভদ্রার রথ পদ্মধ্বজ, বলরামের রথ লাঙ্গলাঙ্কিত হইল। নারদ পুণ্য তিথিতে রথ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন। উহার প্রতিষ্ঠাবিধি নারদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ ঐ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ঐ উৎকলখণ্ডেই রথপ্রতিষ্ঠার প্রথম প্রবর্ত্তন। ঠিক এই সময়ে মহারাজ গালো ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধার্থ নীল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। (২৫শ অধ্যায়)। কিন্তু তিনি রথপ্রতিষ্ঠার দ্রব্য সম্ভার দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং নিজ রাজ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠান প্রচলন করিবেন এরূপ মনস্থ করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিলে বিনীতভাবে কহিলেন আমি অল্পবুদ্ধি মন্ত্রীগণের পরামর্শে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার বিস্ময়জনক কার্য্য এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিলাম। শুনিতেছি পিতামহ ব্রহ্মা আপনারই অনুরোধে স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করিবেন। ইহা অপেক্ষা মর্ত্ত্যবাসীর ভাগ্যে আর কি হইতে পারে। ইন্দ্রদ্যুম্ন উত্তরে কহিলেন আপনি আমার রাজ্যপদ গ্রহণ করুন। আমি প্রাসাদ মধ্যে ভগবানকে

স্থাপন করিয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিব। পুরুষোত্তমের যেরূপ উপচার দ্বারা উৎসবাদি করিতে পদ্মযোনি আদেশ দিবেন, আপনি অতি যত্ন সহকারে সেইরূপ কার্য্য করিবেন; যেন কোন কার্য্যের ত্রুটি না হয়। রাজা গালো কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে ভগবান ব্রহ্মা মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইলেন। ঐরাবতাদি মাতঙ্গগণের বৃংহিত-ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ হইল। পারিজাত-রেণু-মিশ্রিত মন্দাকিনীর পূত জল মন্দ মন্দ বর্ষিত হইতে লাগিল। দেবগণের কণ্ঠনিঃসৃত ভগবানের স্তুতিগানে চারিদিক শব্দায়মান হইয়া উঠিল। তেজোরাশিতে স্বর্গমর্ত্ত্য ভরিয়া গেল। ভগবান ব্রহ্মা, নারায়ণের রথ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে সুভদ্রা ও বলদেবের রথ ও সুদর্শন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিলেন। ২৭ অধ্যায়ের এক স্থলে আছে ভগবানের চতুর্ধা মূর্ত্তি চতুর্ব্বেদময়ী। সে যাহা হউক দারুরূপী লক্ষ্মীপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে আমি মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম ঐদিনই আমার জন্ম বাসর। ঐ তিথিতে আমাকে স্নান করাইবে এবং স্নানান্তে আমাকে ও রামকে দৃঢ় মঞ্চকোপরি স্থাপন করাইবে। যিনি ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে নিরীক্ষণ করিবেন তাঁহার সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। ইহা গেল স্নানযাত্রা। তদনন্তর পঞ্চদশ দিবস আমার মূর্ত্তি কদাচ অবলোকন করিবে না। আষাঢ় মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়া তিথিতে বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর সহিত আমাকে রথে স্থাপন করিয়া উত্তরাভিমুখে মহামহোৎসবে গীতকোলাহলে গুণ্ডিকালয়ে লইয়া যাইবে। আমি মার্কণ্ডেয় সরোবর তীরে সপ্ত দিন অবস্থান করিব। যে মানব আমাকে রথস্থ অবলোকন করিবে সে দেহান্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। ৩৩ অধ্যায়। ইহা গেল রথযাত্রা।

অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখী করিয়া নবমীতিথিতে গুণ্ডিকামণ্ডপ হইতে নীলাচলে আমাকে ফিরাইয়া আনিবে। ৩৪ অধ্যায়। ইহা গেল পুনর্যাত্রা। আষাঢ়ী একাদশী হইতে কার্ত্তিকী একাদশী চারি মাস আমাকে শায়িত রাখিবে। ইহার নাম শয়ন-যাত্রা। বহু যুগ কাশীবাস করিলে যে ফল, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে এই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে এক দিন বাসেই সেই ফল। অতএব মানবগণ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিবেন। ৩৬ অধ্যায়ে আছে আমার প্রসাদ পথেই হউক গৃহেই হউক, চণ্ডাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও যিনি নির্ব্বিচারে ভক্ষণ করিবেন, তিনি মুক্তিমার্গে গমন করিবেন। আমার প্রসাদে পর্য্যুসিত ও অস্পৃশ্যস্পর্শজন্য দোষ কিছুই থাকে না। যে আকণ্ঠ আমার প্রসাদ ভক্ষণ করিবে তাহার সকল পাপ তিরোহিত হইবে, বংশ আয়ু ও সম্পদ বিবর্দ্ধিত হইবে।

৩৮শ অধ্যায়ে ভগবানের পার্শ্বপরিবর্ত্তনযাত্রা। একপার্শ্বে শয়নে যদি তাঁহার ক্লেশাধিক্য হয় এই কারণে ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষের হরিবাসরে আশ্বিন-একাদশীতে পর্য্যঙ্ক-শায়িত ভগবানকে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠান্তে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম পাশ ফিরাইয়া দিবে

দেবদেব জগন্নাথ কল্যাণং পরিকল্পয়
পরিবর্ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং

স্বচ্ছাবেষ্টিতৈরেব জগৎ স্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ
জগদ্ধিতায় সুপ্তোসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব।

কার্ত্তিক মাসে শুক্ল পক্ষে হরিবাসরে ভগবানকে নিদ্রা হইতে উঠাইবার জন্য এই মন্ত্র পাঠ করিবে

উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগৎপতে—ইত্যাদি

ফাল্গুন মাসে দোলারোহণ যাত্রা করিবে। ৩৯ অধ্যায়। এবং ফল্গুৎসব করিবে। যে ব্যক্তি গোবিন্দদেহে ফল্গুমুষ্টি নিক্ষেপ করে, সে কলিকালে অযুত সহস্র বর্ষ ভগবানের পাদপদ্মে লীন থাকে। যে ব্যক্তি দোলায়মান ভগবানকে দর্শন করে তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হয়।

উৎকলখণ্ডের ৪৫ অধ্যায়ে রাজা গালো জৈমিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শুকদেব ব্যাসদেব প্রভৃতি যোগীগণ সনাতন শ্রুতির অবলম্বনে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান দ্বারাই সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন-কিন্তু আপনি বলিতেছেন, এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মরণান্তে মুক্তি দান করেন। এইটি অর্থবাদ বলিয়া আমার সংশয় হইতেছে। পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না ইহাইত বেদের মত, মহাভারতাদি ইহাইত নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমার সন্দেহ নিরাস করুন। জৈমিনি গোলধোগে পড়িয়া চাপাচুপি দিয়া বলিলেন অল্প-পুণ্য লোক সকল এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহারা বহু সহস্র বৎসর পুণ্য সঞ্চয় করিলে যখন তাহাদের পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহারা এই ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া জনার্দ্দনের প্রতি নিশ্চলা ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক এখানে প্রাণত্যাগ করিবে এবং ভগবান তাহার কর্ণমূলে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলে তাহারা সেই বিদ্যাপ্রভাবে ভগবানকে নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তিলাভ করিবে ইত্যাদি।

আমরা উপরে উৎকলখণ্ডের সারাংশ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কৃষ্ণাবতারের বহু পরে জগন্নাথের জন্ম। কৃষ্ণ ও বলরাম পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ভাগবতাদির মতে যদি ব্রহ্ম ও পুরুষ হইলেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি চাই। কেননা যেখানে পুরুষ সেইখানেই প্রকৃতি। এভাব প্রচলিত হিন্দুয়ানির অস্থিমজ্জায় বিজড়িত। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি বাহির করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী শাস্ত্রে রাধিকাকে প্রকৃতি সাজাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইল। বর্ত্তমানে রাধাকৃষ্ণের চিত্র প্রতি হিন্দুগৃহে বিরাজিত। ঐতিহাসিক ভাবে খুঁজিলে রাধিকাকে প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, এ কথা বারংবার বলিয়া আসিতেছি। কিম্বদন্তী যেমন লোকমুখে ক্রমিকই বাড়িয়া যায়, আমাদের দেশে দেবতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অবতারাদিকৃত ঘটনা সেইরূপ শাস্ত্র-পরম্পরায় ক্রমিকই অতিরঞ্জিত বিবর্দ্ধিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে নিতান্তই দুর্ব্বল বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়া ধর্ম্মরাজ্যে আমাদের জ্ঞানের ও বুদ্ধির স্বাভাবিক ও সতেজ বৃদ্ধির পক্ষে প্রবল অন্তরায় খাড়া করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

আর একটি কথা। বাল্মীকিরামায়ণ হইতে অধ্যাত্মরামায়ণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া উত্তর কালে অবতারবাদই ঘোষণা করিল, হরিবংশাদি হইতে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়া ঐ অবতারবাদ প্রচার করিল, কিন্তু তখনও মূর্ত্তিপূজার বায়ু এদেশে বহমান হইতে আরম্ভ হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে রচিত উৎকলখণ্ড দেখুন এখানে ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে আনিবার জন্য, তাঁহার কলেবর নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তাঁহাকে মনুষ্যোচিত সেবা করিবার জন্য, যেন একটা বিশেষ উৎসাহ পড়িয়া গিয়াছে। জগন্নাথাদি কৃষ্ণের পরবর্ত্তী সংস্করণ। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে দেখিবেন নরাকৃতি জীবিত কৃষ্ণের সমক্ষে সকলে স্তবস্তুতি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোপীদিগের সহিত বিহারাদি করিতেছেন, যাহা কিছু করিতেছেন নিজ দৈহিক চেষ্টায়—অন্যের বিনা সাহায্যে। উৎকলখণ্ড খুলিয়া দেখুন স্নানযাত্রায় তাঁহাকে স্নান করান হইতেছে, রথযাত্রায় তাঁহাকে রাজপথে ভ্রমণ করাইয়া আনা হইতেছে, তাঁহাকে বেশভূষায় অলঙ্কৃত করা হইতেছে, তাঁহাকে শায়িত করা হইতেছে, পাছে তাঁহার পার্শ্ববেদনা হয় এজন্য তাঁহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করান হইতেছে, তাঁহাকে ভোজ্য পেয় প্রদান করা হইতেছে, তাঁহাকে দোলায় আন্দোলিত করা হইতেছে, তাঁহার গাত্রে ফল্গুমুষ্টি প্রক্ষেপ করা হইতেছে, বেদ ও উপনিষদুক্ত ধর্ম্মের এরূপ ভীষণ পরিণাম বুঝি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অধ্যাত্মব্যাখ্যাকারী তাঁহার যুক্তি তর্ক লইয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন। জেদ রক্ষা জন্য অকারণ বাক্য-ছটা বিন্যাস করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলি এতৎ সম্বন্ধে যতই অল্প বলা হয় ততই সকল পক্ষের [illegible] আদর্শচরিত্র মনুষ্য হইতে যে [illegible]রের সৃষ্টি, এবং অবতার হইতে [illegible] বহুল স্থলে মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি, এ ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনেক ধন্ধা কাটিয়া যাইবে ইহাই আমাদের স্থিরতর বিশ্বাস।

আমাদের দেশে যে সমস্ত নৈমিত্তিক পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি তান্ত্রিক মতের—যেমন দুর্গোৎসব কালীপূজা জগদ্ধাত্রীপূজা; অপরগুলি বৈষ্ণব মতের, যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা। সরস্বতী ও কার্ত্তিক পূজা তান্ত্রিক কি বিষ্ণুমতে তাহা ঠিক বলিয়া উঠা যায় না। কিন্তু স্নানযাত্রাদি সমস্ত যাত্রা যে একই সময়ে এদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করে, তাহা উহাদের "যাত্রা" নামেতেই বুঝা যায়। অধিকন্তু উৎকলখণ্ড আমাদের সহায় ও প্রমাণ। জগদ্ধাত্রীপূজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক বিগত শতাব্দীতে এদেশে নূতন-প্রবর্ত্তিত, এ বিষয়ে বড় মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কালীপূজার অস্তিত্ব পূর্ব্বে থাকিলেও উহার বহুল প্রচলন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে। এখনও নদিয়া জেলায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কালীপূজার অত্যধিক প্রচলন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ও বর্দ্ধমানরাজের বিত্তভোগী ও ব্রহ্মত্রভোগী ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিম্নবঙ্গে এতই অধিক, যে যাঁহারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ও বর্দ্ধমানরাজের ব্রহ্মত্রভোগী নহেন তাঁহারা চলিত কথায় উচ্চ অঙ্গের ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত হন না। এই কারণে যাঁহারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোগী তাঁহাদের কর্ত্তৃক কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজা দেশ বিদেশে আরও প্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্যও মহাত্মা গৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক এদেশে আরও বিঘোষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন "যাত্রাদি" এদেশে তাঁহারই কল্যাণে আরও দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

উপরে ত রথের কথা বলিলাম। এক্ষণে আমাদের মূল প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা আবশ্যক। আমরা এতই দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে ইহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাইতেছেন। গোপীরা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। তাহাদের হাহুতাশের ভিতর দিয়া আষাঢ়ের রথ অনুস্যূত। উহা ব্যবহার ত ঠিক হইলেও শাস্ত্রীয় ভাবে ঠিক নহে। উৎকলখণ্ডে গোপীকা নাই, তাহাদের নামগন্ধ নাই, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা তিনজনে রথে বিহার করিয়াছিলেন, সাত দিন পরে গুণ্ডিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এইমাত্র। এখানে অক্রূরও নাই গোপীদিগের হাহুতাশও নাই। সুভদ্রা স্বয়ং লক্ষ্মী তিনি প্রকৃতি, জগন্নাথ স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীরই সঙ্গে রথে চলিয়াছেন। সুভদ্রা জগন্নাথের ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার রাজ্ঞী ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু এদেশে রথযাত্রার সময় যে সঙ্কীর্ত্তন হয় তাহার একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি পাঠকগণ তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন

যে শাস্ত্রের সহিত সঙ্গীতের অর্থাৎ প্রচলিত সংস্কারের কত প্রভেদ।

দাঁড়াও বাঁকা হয়ে রথে, দীননাথ! একবার
হেরি হে নটবর।
গোকুলে ত্রিকুলে কেহ নাই গোপিকার।
যাদের কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণজ্ঞান কৃষ্ণমান কৃষ্ণ
প্রাণ শ্রী কৃষ্ণ কেন কর বংশীধর।
কি অপরাধ করেছি দয়াময়, ত্যাজে যাও
গোপীকায়, রথ রাখ কথা রাখ রাখ পদ ছায়।
যাবে নাকি মধুপুরী, জান তুমি কতই
চাতুরী, আহা লাজে মরি। তোমার এ ভাব
যে ছিল মনে তাহা আমরা জানিনে
আমরা ত্যজেছি কুল তোমারই জন্যে
তার প্রতিফল এখন দিলে হরি
দাঁড়ায়ে ঐ ব্রজেশ্বরী প্রেমময়ী রাই-
কিশোরী হে, যেন অনাথিনী প্রায়, সোনার
বরণ মলিন হে ইত্যাদি—

সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক মাধুর্য্য ও রচনা কৌশল আমরা অস্বীকার করি না, আমরা এইটুকু দেখাইতেছি উৎকলখণ্ডের রথের সহিত কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ সঙ্গীত ভাগবতের অনুরূপ নহে, কেন না ভাগবতে প্রেমময়ী রাধিকা নাই। উহা উৎকলখণ্ডের রথেরও উপযোগী নহে কেন না সুভদ্রা যিনি রাধিকার নামন্তর মাত্র তিনি ত কৃষ্ণরূপী জগন্নাথের সঙ্গে। আর একটি আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন হইলেও ভাগবতে অষ্টাহ বাদে তাঁহার পুনর্যাত্রা সম্ভব হয় না। সুতরাং রথ ভাগবতসম্মত হইতেই পারে না তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৮৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬০৩৶৯
সমষ্টি	...	১১৪১৶৯
ব্যয়	..	৫৯৮৶৩
স্থিত	...	৫৪২।৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৪২।৶৬
	৫৪২।৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১৫০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১০৲
	১৫০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৮৶০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত „ গোপালচন্দ্র দে, ঐ	২৲
„ রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর মেদিনীপুর	৬৸০
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী, পুঁটিয়া	৩।৶০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন সাহা, ভাণ্ডারিয়া	১৸৶০
„ „ শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, আন্দুল	৩৲
„ সহকারী সম্পাদক, পব্‌লিক্ লাইব্রেরি, কোন্নগর	।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়	॥০
	১৮৸৶০
পুস্তকালয় ...	১১৶০
যন্ত্রালয় ...	৩৫৫৸০
গচ্ছিত ...	১৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	॥০
সমষ্টি	৫৩৮৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪০৯৷৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২৸০
পুস্তকালয়	...	৩।৶৬
যন্ত্রালয়	...	১৫৮৷৶০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	১৪৷০
সমষ্টি		৫৯৮৸৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

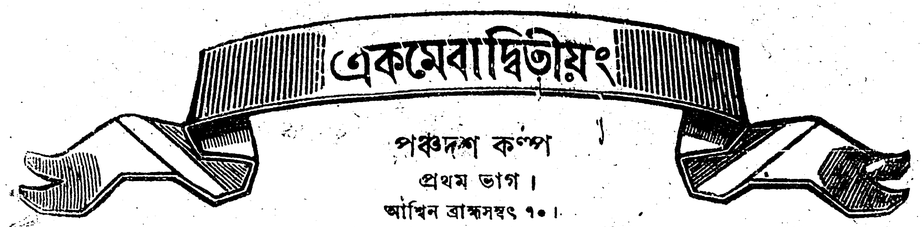

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০। ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
সংসার আশ্রম (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	... ...	৮৯
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৯১
শুভ-দর্শনে সঞ্চয় (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	... ...	৯৭
কৃষ্ণাবতার (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	... ...	৯৯
শ্রাদ্ধ	... ...	১০২
আর্য্য পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত	... ...	১০৩
পত্র	... ...	১০৩

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৩৬। কলিগতাব্দ ৫০০০। ১ আশ্বিন রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৭৪ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্য বোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২১ শক। ৩২ আষাঢ়, বুধবার।

সংসার আশ্রম।

নক্ষত্র নিচয়ের মধ্যে যেমন চন্দ্রমা, ফুলসমূহের মধ্যে যেমন গোলাব, নদী সমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, চতুরাশ্রমের মধ্যে তেমনি গৃহস্থাশ্রম। সংসার-মরুভূমি মধ্যে গৃহস্থাশ্রম এক সুন্দর উদ্যান। উদ্যানস্থ হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র কি রমণীয়! উন্নত পাদপ, প্রাণতোষিণী লতা, নয়নরঞ্জনকর কুসুম, হৃদয়প্রফুল্লকর পদ্ম ও হংস-শোভিত সরোবর, সুচারু প্রস্রবণ, কি অপরূপ রূপেই তথায় বিরাজ করে; সংসারাশ্রম-রূপ উদ্যানের শোভা আরো উৎকৃষ্টতর। গৃহস্থাশ্রমরূপ দর্পণেই ঈশ্বরের করুণা বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ পিতা মাতা, স্নেহাস্পদ ভাই ভগিনী প্রাণসমা প্রেয়সী, নিষ্পাপ বালক বালিকা, কি স্বর্গীয় শোভাই ধারণ করে! ইহারাই জীবনের সংকীর্ণপথে কুসুমরাশি বিকীর্ণ করে। জীবনের প্রত্যেক অংশকেই সুখিত করে। এখানে "স্নেহ প্রেম, দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ" ইহাতেই হৃদয়ের উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

সুখাধিক্য প্রযুক্ত সংসার-আশ্রমকে শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিতেছি না। এখানে সুখও যত, দুঃখও তত। এখানে যেমন জ্যোৎস্না তেমনি অন্ধকার। যেমন বীণার নিক্কণ, কোকিলের ধ্বনি, তেমনি হিংস্রক পশুর গর্জ্জন ও বজ্রনিনাদ। কিন্তু এখানকার সুখে দুঃখে কঠিন কঠোরাঘাতেও মনুষ্যের শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। ইহা প্রধান শিক্ষার স্থান। এই জন্যই সংসারাশ্রমকে সকল আশ্রম হইতে ঋষিরা শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়াছেন। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিকেও গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার দিকেই তাহার প্রকৃতিগত টান রহিয়াছে। মাতার নিকট হইতে যেমন সহজে মাতৃভাষা শিক্ষা হয়, সংসার-আশ্রম হইতে তেমনি আমরা সহজে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারি। কেমন করিয়া সে শিক্ষা হয়, তাহা আমি বলিতেছি। এক জন কবি বলিয়াছেন, মাতার ও প্রিয়ার চক্ষু হইতে যে স্নেহ ও প্রেমময় স্নিগ্ধ

জ্যোতি নির্গত হয়, সেই জ্যোতিতেই সংসার আলোকিত হয়। সেই জ্যোতিতেই আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার অপসারিত হয়। সেই জ্যোতি পাইয়াই, হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি ঊর্দ্ধগামিনী হয়। মাতার তুলনারহিত স্নেহ—পতিব্রতার মর্ম্মোত্থিত প্রীতি পাইয়া আমাদের ভক্তি ও প্রীতি পরিশেষে ঈশ্বরের দিকে উন্নত হয়। ভক্তিরূপ সূর্য্যকান্তমণি—প্রেমরূপ কোহিনুর-লাভের উপায় ঈশ্বর সংসারাশ্রমেই সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। মাতার স্নেহের কথা কে না জানেন? তবুও কথাপ্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। রাত্রি দ্বিপ্রহর, মাতা নিজের কক্ষে নিদ্রিতা, সন্তান অন্য কক্ষে তখনও জাগ্রত আছেন। এমন সময়ে, মাতার কক্ষ হইতে শব্দ হইল "উঃ"! সন্তান শ্রবণমাত্রেই আস্তে আস্তে মাতার অন্ধকারময় কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সব স্থির—কোন সাড়া নাই। পরে বলিলেন, "মা! তুমি শব্দ করিলে?" তিনি বলিলেন, "আমাকে কি কামড়ালে" আলো আনিয়া সন্তান দেখিলেন, হস্তের একটি অঙ্গুলিতে দংশনের চিহ্ন রহিয়াছে—সেই স্থানে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। দংশন অনুভব মাত্রেই আমাকে ডাকলে না কেন? তিনি বলিলেন, তোমার ঘুম ভাঙ্গাইব!! কি আশ্চর্য্য স্নেহ! এই স্নেহ কোথা হইতে আইল? এ কি সেই জগন্মাতার স্নেহের প্রতিরূপ নহে? এই স্নেহ দেখিয়া কি আমাদের মাতার প্রতি ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয় না? মাতাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করিয়া পরিশেষে আমরা পরম মাতাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করি। বট বৃক্ষের বীজের ভিতরেই বিশাল বট বৃক্ষ লুক্কাইত থাকে, সেই রূপ পার্থিব মাতার প্রতি ভক্তি হইতেই সেই পরম মাতার প্রতি ভক্তি অঙ্কুরিত হইয়া অনন্ত পথে উত্থিত হইতে থাকে। গভীর অন্ধকার! সাধক তন্মনা হইয়া নির্জ্জনে জগন্মাতার ধ্যানে মগ্ন, তাঁহার সম্বন্ধে এখন পৃথিবীও নাই—শরীরও নাই। এমন সময়ে তাঁহার অন্তরাকাশে দৈববাণী হইল, কি দিতে পারবে? সাধক বলিলেন, মা—প্রাণ। মা বলিলেন প্রাণ ত অবস্থাবিশেষে মানুষ অন্যের জন্য দেয়। আমি তাহা অপেক্ষাও বেশি চাই, "ভক্তি।" সাধক বলিলেন, মা! তাই দিব! তখন মা বলিলেন, আমি বাছা তোমারই রহিলাম। যখনই ডাকিবে, অন্তরে সাড়া পাইবে। এমন যে ভক্তি, গৃহস্থাশ্রমেই তাহার মূল নিহিত রহিয়াছে।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, এবং বিপদ ও পীড়ার সময় পতিপ্রাণার নিকট আমরা কি সাহায্যই না পাইয়া থাকি! তেমন সময়ে তাঁহার হৃদিস্থিত প্রেম চতুর্গুণ বল ধারণ করে। আবার বিপন্না স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামী স্বীয় প্রাণকে কেমন তুচ্ছ বোধ করেন—সেই বা কি আশ্চর্য্য প্রেম! এই রূপে সংসারেই প্রেমের বিনিময় হইয়া, দম্পতিহৃদয়ে প্রেম-পুষ্প বিকসিত হয়। সেই পুষ্পই পরে ঈশ্বরের চরণে অঞ্জলিস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। গুরুর নিকটে এখানে শিক্ষা পাইয়া, পরে সেই জগৎ-গুরুকে বুঝিতে পারি। এখানে দয়ার পাত্র শত শত রহিয়াছে। তাহাদের প্রতি দয়া করিলে—অতিথিসৎকার করিলে, মনে কি অপূর্ব্ব হর্ষোদয় হয়। শ্রদ্ধা সহকারে ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া ফিরিবার সময় দাতার মুখমণ্ডলে কি অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হয়! অতএব সংসারে—গৃহস্থাশ্রমে আমাদের সুন্দর মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। যদি এ বিষয়ে আমরা অনবহিত থাকি, জগৎ-গুরুর ইঙ্গিত ধরিয়া না চলি, তবে সে কাহার দোষ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনুকূল অবস্থার ন্যায়, সংসারে প্রতিকূল অবস্থাতেও শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। শেক্‌স্‌পিয়ার বলেন, সংকট সর্পবৎ, কিন্তু ইহার মস্তকে উজ্জ্বল মণি আছে। চতুর ব্যক্তিই তাহা লাভ করিয়া, পুনর্ব্বার সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকেন। আমরা বলি ঈশ্বরের নিকট হইতে মোহন মন্ত্র শিক্ষা করিলেই সে মণি লাভ করিতে মনুষ্য ক্ষমবান্ হয়। বিপদে কত লোকের চৈতন্য উদয় হইয়াছে। মোহঘোর কাটিয়াছে, বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে, ঈশ্বররূপ স্পর্শমণি লাভ হইয়াছে। এই জন্যই ঈশ্বর সুখ-দুঃখময় সংসার মনুষ্যের জন্যই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই তাহার উপযুক্ত শিক্ষার স্থান। তবে অবস্থা বিশেষে, সময় বিশেষে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ আদেশ হইতে পারে। তিনি তদনুসারে আশ্রম মনোনীত করিতে পারেন। ফল কথা এই যোগ-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সংসার আর অরণ্য একই কথা। সকল সময়, সকল অবস্থায়, সকল স্থানে তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ থাকে। ব্রহ্মানন্দই জীবনের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মানন্দই আত্মার সর্ব্বস্ব। হে দয়াময়! তুমি সংসারকে পবিত্র কর। যেন সংসার হইতে নিয়ত কল তোমার পূজা উত্থিত হয়। এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

দক্ষ-শব্দের অর্থ নিপুণ। নিপুণতাই বিদ্যার মূল উৎস। আগে, ভাষার সুবিহিত প্রয়োগে লোকের নিপুণতা জন্মে, তাহার পরে সেই নিপুণতা হইতে ব্যাকরণ-বিদ্যা আবির্ভূত হয়। পাণিনির ন্যায় একজন সুনিপুণ ভাষাবেত্তাই ব্যাকরণ-বিদ্যার আদি গুরু হইতে পারেন। আদিম পুরাকালে লোকহিতকর নিষ্কাম যজ্ঞের নির্ব্বাহকার্য্যে যাঁহাদের বিশিষ্টরূপ নিপুণতা জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের সেই নিপুণতা হইতেই লোকহিতকারী সদ্‌বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল। তার সাক্ষী—ইহা একটি সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য যে, যজ্ঞাদির কাল-নির্ণয়ের নৈপুণ্য হইতেই আমাদের দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল; যজ্ঞাদির বেদি-নির্ম্মাণের নৈপুণ্য হইতেই জ্যামিতি বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল; রোগ-প্রতীকারের নৈপুণ্য হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল; দেবার্চ্চনার নৈপুণ্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল। সদ্‌বিদ্যা নিপুণতারই কন্যা—সতী দক্ষেরই কন্যা। আমাদের এই প্রিয় ভারত ভূমিতেই সদ্‌বিদ্যা আগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর, আমরাই তাঁহাকে আগে হারাইলাম। যে দোষে আমরা তাঁহাকে হারাইলাম, সে দোষের জন্য আমাদের দেশ-কে-দেশ রাজ্য-কে-রাজ্য অধঃপাতে গিয়াছে এবং এখনো যাইতেছে, অথচ তাহার প্রতি আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে না; সে দোষ হ'চ্চে স্বার্থপরায়ণতা। আমি হাঁপানি রোগের একটা মাতব্বর ওষুধ জানি কিন্তু কাহাকেও আমি তাহা বলিব

না; আমি পারা ভস্ম করিতে জানি কিন্তু কাঁহারও নিকটে আমি আমার বিদ্যা ফাঁস করিব না; আবার, আমি কিছুই জানি না, অথচ যেন আমি সব জানি এইরূপ একটা ভড়ঙ্ করিয়া, গাত্রে ভস্ম লেপন, মাথায় জটাজূট ধারণ, এবং মুখে মৌন অবলম্বন, এই সকল মাকড়সার জাল ফাঁদিয়া লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী গাছতলায় বসিয়া ভন্‌ভন্‌কারী জন-মক্ষিকার সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছি। ব্যাপার যেখানে এইরূপ, সেখানে কে বিদ্যা কে অবিদ্যা তাহা চিনিতে পারা সুকঠিন। আদিম যুগ নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গিয়া যখন মধ্যম যুগ উপস্থিত হইল, তখন পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা লোক-হিতকর নিষ্কাম যজ্ঞের নির্ব্বাহ-কার্য্যে বিশিষ্টরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা অর্থের প্রয়াসী হইয়া রাজা-রাজড়াদিগকে নানাপ্রকার লোভ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন—যজ্ঞ করিলে পুত্র-লাভ হইবে, রাজ্য-লাভ হইবে, স্বর্গ-লাভ হইবে, এইরূপ করিয়া ক্রমাগত কাণে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিলেন। যে নৈপুণ্য আদিম যুগে মঙ্গলের পরম আত্মীয় ছিল, সেই নৈপুণ্য মধ্যম যুগে স্বার্থপরতার সঙ্গে হরিহরাত্মা হইয়া মঙ্গলের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিল—দক্ষ শিবের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিলেন; শিব-নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহার্তে আর কত ভাল হইবে? সদ্বিদ্যা সতী স্বার্থপরতা-দূষিত লোকালয় হইতে অন্তর্ধান করিয়া নিঃস্বার্থ সরল-প্রকৃতি কিরাতাদি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে গিয়া পার্ব্বতী হইলেন; এবং কৈলাসের বুড়া শিবকে অর্থাৎ নেপালাদি পার্ব্বত্য প্রদেশের আদি-বুদ্ধকে পতিত্বে বরণ করিয়া এবং তাহার পরে তাঁহাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া; তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইলেন অর্থাৎ নেপালাদি পার্ব্বত্য-প্রদেশের বৌদ্ধ বিদ্যা হইলেন।

সতীর তো এইরূপে জন্মান্তরে পতিলাভ হইল;—এ দিকে শিবের অনুচরেরা—গণেরা—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যজ্ঞভঙ্গে প্রবৃত্ত হইল। শিবের গণ বলিতে যদিচ ভূত প্রেত বুঝায়, কিন্তু গণ-শব্দের মৌলিক অর্থ হ'চ্চে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Multitude অর্থাৎ Common people। রাজা-রাজড়া'রা যখন মহা আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন তখন তাঁহাদের হইত প্রভূত যশঃস্ফূর্ত্তি; ব্রাহ্মণদিগের হইত প্রভূত উদরপূর্ত্তি; গণেদের হইত অস্থি-চর্ম্মসার কঙ্কাল-মূর্ত্তি। গণ-শব্দের তান্ত্রিক অর্থ ভূত প্রেত;—তা' তো হইবেই! যজ্ঞাদি কার্য্যের সাহায্যের জন্য গণেদের নিকট হইতে যখন প্রচুর পরিমাণে অর্থ শোষিত হইতে থাকে, তখন অন্নাভাবে তাহাদের মূর্ত্তি যেরূপ হয়; আর, অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা খেপিয়া উঠিলে তাহাদের কার্য্য যেরূপ হয়; তাহা দেখিলে তাহাদিগকে ভূত প্রেত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? গণেদের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। আদি-বুদ্ধ তাই গণেদের মা বাপ, আর, গণেরাও তাঁহার ভক্ত অনুচর; তার সাক্ষী—চড়ক পূজার বুড়া শিব (অর্থাৎ আদিবুদ্ধ) হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের বিশিষ্টরূপ কুলদেবতা।

বুদ্ধদেব নিজে যদিচ শান্তিরই উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে যখন তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বন্যার জলের ন্যায় হু হু করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন যে তাহা বিনা উপদ্রবে সহজে হইতে পারিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। ইংরাজিতে যাহাকে বলে Mob তাহারা ভূত প্রেতের অধম; তাহারা একবার খেপিলে রক্ষা নাই;—তখন তাহারা ক্ষিপ্ত হস্তীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মাহুতকেও মানে না, আরোহীকেও মানে না; তখন তাহারা যাহা সম্মুখে পায় তাহাই পদতলে দলন করে। এই প্রকার ক্ষিপ্ত হস্তীগণের যূথপতি হ'চ্চেন গণপতি গজানন! তিনি আর কেহ ন'ন—Napoleon বা Cromwell যাঁহার শুঁড়ের এক টোকায় বহুকালের পুরাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠাস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। গণ-দিগকে খেপাইয়া তুলিবার কর্ত্তা হ'চ্চেন বীরভদ্র—কিনা ভদ্রগোচের বীর। গণপতি Military বীর; বীরভদ্র Civil বীর! গণপতি Cromwell, বীরভদ্র Hamden ফলে, বুদ্ধদেবের তিরোধানের অনতিপরে গণেরা অর্থাৎ গুণ্ডারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো বীরভদ্র-কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অনেকানেক যজ্ঞ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা যে হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

যজ্ঞের মধ্য হইতে যখন সতী অর্থাৎ সদ্‌বিদ্যা অন্তর্ধান করিলেন তখন যজ্ঞের ভিতরে আর কোনো পদার্থ রহিল না; তখন যজ্ঞ ফল-কামনা দূষিত কাম্য কর্ম্ম হইয়া উঠিল; কাজেই, তখন দক্ষের স্কন্ধে কামের বা বিষয়-কামনার সাঙ্কেতিক চিহ্ন গজাইয়া উঠিল—ছাগমুণ্ড গজাইয়া উঠিল।

সাংখ্যদর্শন যেমন ছদ্মবেশী বৌদ্ধদর্শন, বুড়া শিবও তেমনি ছদ্মবেশী আদিবুদ্ধ! আদি বুদ্ধের হস্তে বজ্র রহিয়াছে কিন্তু শিবের হস্তে বজ্র নাই;—বজ্র যেমন নাই—তেমনি ত্রিশূল রহিয়াছে। আদি বুদ্ধের গলায় পৈতা নাই, কিন্তু শিবের গলায় পৈতা রহিয়াছে। ইহারই নাম ছদ্মবেশ। ব্রহ্মার গলায় বরং পৈতা দিলে শোভা পায়, কেন না ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদের এবং ব্রহ্মণ্যদেবের মূল উৎস; কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণোচিত শুদ্ধাচারের কোনো ধারই ধারেন না, যাঁহার কণ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার জন্য সর্পের অভাব নাই, তাঁহার গলায় যে, পৈতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল; ব্রহ্মার গলায় না, বিষ্ণুর গলায় না—বাছিয়া বাছিয়া শিবের গলায় যে, পৈতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, এ রহস্যটির ভিতরে অবশ্যই কোনো দুরভিসন্ধি আছে। দুইটি দুরভিসন্ধি আমরা খুজিয়া পাইয়াছি। প্রথম দুরভিসন্ধি এই যে, যিনি বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি আদিবুদ্ধ, তিনিই যে, ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য দেবতা শূলপাণি মহাদেব, এটা যেন কেহ জানিতে না পারে। আর কিছু না—খ্রীষ্টান পাদ্‌রী যেমন দীক্ষিত ব্যক্তির মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে দলে টানিয়া ল'ন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেরা আদিবুদ্ধের গলায় একটা যজ্ঞোপবীতের ফাঁস নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আপনাদের দলে টানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দুরভিসন্ধি এই যে, ব্রহ্মাকে কমাইয়া শিবকে বাড়াইতে হইবে। ব্রহ্মাই চারি বেদের এবং ব্রহ্মণ্যদেবের আদিম প্রতিষ্ঠাতা, অথচ তাঁহার গলায় পৈতা না দিয়া শিবের গলায় পৈতা দেওয়াতে, ভাবে গতিকে ব্রহ্মাকে পদচ্যুত করিয়া শিবকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হইল। শিব তো মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেনই, কিন্তু তাহা ছাড়া তিনি যে, মৃত্যুঞ্জয়, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া নূতন জীবন আনিয়া দিবার কর্ত্তা—এই বৃত্তান্তটি তাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

লেখা রহিয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্র এক প্রকার শাঁকের করাত; তাহাতে জন্মও বুঝায়; মৃত্যুও বুঝায়; সৃষ্টিও বুঝায়, প্রলয়ও বুঝায়; ক্ষয়ও বুঝায়, বৃদ্ধিও বুঝায়। কেন না, কৃষ্ণ পক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র যেমন কলা-ক্ষয়ের পরিজ্ঞাপক, শুক্ল পক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র তেমনি কলা-বৃদ্ধির পরিজ্ঞাপক। প্রকৃত কথা এই যে, জন্ম এবং মৃত্যু একেরই এ-পিট ও-পিট। মৃত্যুশয্যাশায়ী ব্যক্তির আত্মা যখন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরলোকে উত্থান করে, তখন তাহাও এক প্রকার জন্ম। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ঐহিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পারত্রিক জন্ম লাগিয়া আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, যিনি মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনিই জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মৃত্যুঞ্জয় শিব জন্ম এবং মৃত্যু দুয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কাজেই শিবের ভিতরে ব্রহ্মা প্রকারান্তরে সন্নিযুক্ত রহিয়াছেন। শিব ব্রহ্মাকে এইরূপ গিলিয়া ব'সাতে পুরাণাদিতে ব্রহ্মার পূজার জন্য কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। গৃহস্থের বধূ পুত্র-কামনা করিয়া শিবপূজা করে—ব্রহ্ম-পূজা করে না; যদিচ ব্রহ্মাই প্রজাপতি অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির প্রবাহ-কর্ত্তা। ফলে, শিবের সাঙ্কেতিক স্রষ্টা-মূর্ত্তি, তাঁহার ললাটের ক্ষয়বৃদ্ধিশীল অর্দ্ধচন্দ্র, এবং তাঁহার কণ্ঠের যজ্ঞোপবীত, তিনই এই সংবাদটি জগতে ঘোষণা করিতেছে যে, এখন হইতে প্রলয়কার্য্য এবং সৃষ্টিকার্য্য দুইই শিব একাকী নির্ব্বাহ করিবেন—ব্রহ্মাকে সৃষ্টি-কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু ব্রহ্মা চারিমুখ দিয়া চারি বেদ উৎসারণ করিয়াছেন;—শিবেরও তো সেইরূপ একটা কিছু করা চাই; তা তিনি করিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্রহ্মা যেমন বেদের আদি গুরু, শিব তেমনি তন্ত্রের আদি গুরু।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি নেপালে অবস্থিতিকালে পুরাতন পুথি অন্বেষণ করিতে করিতে কয়েক খানি বৌদ্ধ তন্ত্রের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত শিবোক্ত তন্ত্রের তিনি প্রভেদ দেখিলেন কেবল এই যে, শেষোক্ত তন্ত্রের যেস্থানে "শিব বলিতেছেন" বলিয়া কথা আরম্ভ করা হইয়া থাকে, বৌদ্ধতন্ত্রের সেই স্থানে শিবের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের নাম লিখিত রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, শিবের তন্ত্রও যা, বুদ্ধের তন্ত্রও তাই—একেরই এ পিট ওপিট। তা ছাড়া, বৌদ্ধশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক আঁক জোঁকের সহিত তন্ত্র শাস্ত্রের সাঙ্কেতিক আঁক জোঁকের এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ মিল রহিয়াছে যে, দুইকে পরস্পরের সহিত জোকা দিয়া মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের অভিন্নতা-বিষয়ে কাহারো মনে তিলমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডির ভিতরে কেমন করিয়া কি সূত্রে বিকট এবং বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিতে পারিল—ইতিহাস সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো কথা বলে না; না বলুক্—আমরা যুক্তির সাহায্যে ভাবিয়া দেখিলে তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃত বিবরণের কতকটা আভাস পাইতে পারি। এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ-যুক্তি অবলম্বন করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান করুন্ঃ—

বৌদ্ধধর্ম্ম ভজনের প্রতি একেবারেই পরাঙ্মুখ—বৌদ্ধধর্ম্ম চা'ন সাধন। বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের উপদেশ এই যে, আত্ম-প্রভাব-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে দ্বেষ-হিংসা কাম-ক্রোধ ভয়-লোভ মদ-মাৎসর্য্য হইতে বিনির্ম্মুক্ত কর—তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। কিন্তু আন্তরিক রিপুগণের উপরে প্রকৃষ্টরূপে জয়লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করা চাই। কালিদাস বলিয়াছেন

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ"

বিকারের হেতু উপস্থিত থাকিলেও যাঁহাদের মন বিচলিত না হয় তাঁহারাই ধীর। এইরূপ বিবেচনায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপ সিদ্ধি-কামী ছিলেন তাঁহারা বিকারের হেতু সম্মুখে আনয়ন করিয়া—কামের উত্তেজক সুন্দরী স্ত্রী, লোভের উত্তেজক মদ্য মাংস, দ্বেষের উত্তেজক মৃত দেহ এবং কঙ্কালাদি, ভয়ের উত্তেজক নিশীথের শ্মশান, এই সকল উপদ্রব ইচ্ছা পূর্ব্বক যাচিয়া আনিয়া—মনের উপরে আত্যন্তিক জয়লাভের অভিপ্রায়ে রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এটা তাঁহারা বুঝিলেন না যে, কেবল মাত্র আত্মপ্রভাবের কঠোরতায় ভর করিয়া ওরূপে রিপুজয় করিতে যাওয়াই ভুল। পর্ব্বতে আরোহণ করিব অথচ এক পায়ে চলিব ইহা হইতেই পারে না, দুই পায়ে চলা চাই। ঈশ্বরারাধনা দ্বারা চিত্তের ভাবগতি এবং লক্ষ্য উপরের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া চাই; আর, সেই সঙ্গে আত্মপ্রভাব-রূপী প্রহরীকে দিয়া নিচের প্রবৃত্তি সকল প্রতিরোধ করা চাই; এই দুই উপায় এক সঙ্গে অবলম্বন করিয়া সাধুসেবিত পথে বিনীত ভাবে চলিতে থাকিলে তবেই রিপুগণের উপরে সাধকের ক্রমে ক্রমে বশীকার জন্মিতে পারে। অতএব শুধু কেবল আত্মপ্রভাবের কঠোরতা-বলে সম্মুখ-যুদ্ধে রিপুজয় করিতে গিয়া সাধক যে, পরাভূত হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঘটিলও তাই। যোদ্ধাগণের মধ্যে দুই চারি জন শেয়ানা লোক রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা রণে পরাজিত হইয়া রিপুগণের এরূপ পদানত দাস হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহারা আর সাধু-সজ্জনের সহবাসের উপযুক্ত রহিলেন না; কাজেই তখন তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ভ্রাতারা তাঁহাদিগকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে যখন তাঁহারা বহিষ্কৃত হইলেন, তখন তাঁহারা বহিষ্কর্ত্তাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপনাদের মধ্যে গোপনে নূতন-তর এক প্রকার সাধন-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, এবং তাহার নাম দিলেন—তন্ত্র। তন্ত্র আর কিছুই না—যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি-উপার্জ্জনের প্রণালী। যাঁহারা এইরূপ স্বল্প মূল্যে তপঃসিদ্ধি উপার্জ্জন করিবার নূতন ফন্দি বাহির করিলেন, তাঁহারা আপনাদের দুর্ব্বলতার দায় কলিকালের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "সত্য যুগের ঋষি তপস্বীরা শমদমাদি কঠোর তপঃসাধন দ্বারা রিপুজয় করিতেন বলিয়া তাঁহাদের দেখা-দেখি কলিকালে যাঁহারা সেইরূপ করিতে যা'ন —পরাজয় এবং পতন তাঁহাদের ললাটে লেখা রহিয়াছে; আর, তাহা না করিয়া যাঁহারা রিপুগণের সম্মুখ হইতে ভয়ে পলাইয়া গিয়া নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও, তাঁহারা অধম কাপুরুষ—তাঁহারা পশ্বাচারী। আ-

মরা বীরাচারী! আমরা প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া রিপুদমন করিব! আমরা সমস্ত কামনার বিষয়—পঞ্চ মকার—অতিমাত্র উপভোগ করিয়া তাহাদের প্রতি মনের বিতৃষ্ণা জন্মাইব; তাহা হইলে রিপুগণ আপনাআপনি পরাভূত হইয়া যাইবে।" দিব্য সহজ উপায়! এটা বুঝিলেন না যে,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কামনা সকল কদাপি উপভোগ-দ্বারা নিবৃত্তি মানে না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহারা করিলেন যে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি তাহা আর বলিবার নহে! তাঁহারা মোহকে রীতিমত পূজার্চ্চনা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে করিলেন—নৌকার মাঝি। আর, দুর্ব্বুদ্ধির দলবল যুটাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে করিলেন—নৌকার দাঁড়ি; আর, মনে করিলেন যে, "মাঝি পাইয়াছি, দাঁড়ি পাইয়াছি, তবে আর ভাবনা কি? এক্ষণে আমরা সংসার-পারাবার হেলায় তরিয়া যাইব!" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিলেন; আর, ফলও পাইলেন তেমনি! কিয়ৎ পথ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহারা ভৈরবী চক্রের পৈশাচিক আবর্ত্তে নৌকা ডুবি করিয়া পাতাল যে কতদূর তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেন।

এই সকল ব্যাপারের আদি অন্ত মধ্য ঠাহরিয়া দেখিয়া আমরা তিনটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে তিনটি সিদ্ধান্ত এইঃ—

(১) তন্ত্র-শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের একটা ভ্রষ্ট উপশাখা।

(২) বহিষ্কৃত বৌদ্ধ তপস্বীরা বহিষ্কর্ত্তাদিগের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তন্ত্র শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহার কিয়ৎ পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিপক্ষ দল যখন ঐ পতিত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী-দিগকে ক্রোড় পাতিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই-গতিকে তন্ত্র শাস্ত্র পুরাণাদির ন্যায় ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের একটা অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত হইল!

(৩) কালী দুর্গা প্রভৃতি তন্ত্রের উপাস্য দেবতা সাংখ্যের মতানুযায়ী নিরীশ্বরা প্রকৃতির রূপক-রচনা। সেশ্বরা না বলিয়া নিরীশ্বরা প্রকৃতি বলিতেছি কেন—তাহার কারণ আছে;—তাহার কারণ চারিটি ঃ—

প্রথম কারণ এই যে, ভগবতী মহাদেবের সহিত কন্দল করিয়া বাহির হইয়া গিয়া নানা মূর্ত্তিতে নানা স্থানের লোকদিগের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অতএব পূজা-গ্রহণের সময় তিনি মহেশ্বর হইতে পৃথক্‌ভূতা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কালীঘাট প্রভৃতি পীঠস্থানে লোকে যাঁহার প্রতিমা পূজা করে তিনি দেবীর মৃত শরীরের খণ্ডাংশ। তবেই হইতেছে যে তিনি আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূতা মৃতা প্রকৃতি বা জড়-প্রকৃতি। তৃতীয় কারণ এই যে বিষ্ণুর উপাসক এবং লক্ষ্মীর উপাসক বলিয়া দুই পৃথক্ ধর্ম্ম সম্প্রদায় আমাদের দেশে নাই; কিন্তু শিবের উপাসক শৈব, এবং শক্তির উপাসক শাক্ত, এ দুই সম্প্রদায় পরস্পর হইতে বিভিন্ন। শিব এবং শক্তি, এই দুই উপাস্য দেবতা যদি পরস্পর হইতে পৃথক্ না হইতেন তবে শৈব এবং শাক্ত এই দুই উপাসক-সম্প্রদায় পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে পারিত না। চতুর্থ কারণ এই যে, শিব প্রকৃতির স্বামী, সুতরাং প্রকৃতি শিবের

আজ্ঞাধীনা; এই জন্য যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া প্রকৃতিকে বশে আনিতে ইচ্ছা করেন—শিব বিশিষ্টরূপে তাঁহাদেরই ইষ্ট দেবতা; মৃত্যুঞ্জয় শিব সংযমী উদাসীনদিগেরই ইষ্ট দেবতা। কিন্তু তান্ত্রিকেরা সংযমের প্রতি নিতান্তই পরাঙ্মুখ—তাঁহারা যথেচ্ছাচার-ব্রতেই দীক্ষিত। তাঁহারা প্রকৃতি বশীভূত করিতে প্রয়াস পান না—তাঁহারা প্রকৃতির সেবাতেই অহোরাত্র নিযুক্ত থাকেন। এই জন্য শাক্তদিগের উপাস্য দেবতা যিনি শিবের বক্ষের উপরে নৃত্য করেন তিনি শিবাশিব-জ্ঞান-শূন্য প্রকৃতি—তিনি নিরীশ্বরা প্রকৃতি ইহাতে আর ভুল নাই। ক্রমশঃ।

শুভ-দর্শনে সঞ্চয়।

এবার কলিকাতায় গিয়া ৭ই ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ণে পুণ্যশ্লোক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের দর্শনার্থে গিয়াছিলাম। যখনই তাঁহার চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হই, তখনই আমরা তাঁহার বদনকমল হইতে সেই ত্রিভুবনপতি ভক্তচিত্তনন্দনের প্রেম-সঙ্গীত ও অনন্ত দয়ার সমাচার শুনিয়া ধন্য হই।

বেদের শীর্ষস্থানীয় উপনিষৎ নিত্য-যোগানন্দ মহর্ষিদেবের গভীর সাধনোপলব্ধ সত্যের সমাচারে পূর্ণ; এবং ভগবৎ-প্রেমের কবি হাপেজের প্রেম-কবিতা তাঁহার প্রাণের ভাষায় গ্রথিত; তজ্জন্যই প্রায় কথায় কথায় হয় উপনিষদের জ্ঞান প্রেমের চিরসিদ্ধ শ্লোক, নয় হাপেজের সুমধুর প্রেমকাব্য তদীয় দিব্য কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

সেদিন সেই বিশ্বপ্রেমিক বরণীয় মহাত্মা পরলোক ও মুক্তির বিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন—"তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি নিত্য জীবনও লাভ হয়, তবে সেই শূন্য জীবনে সুখ কি, লাভই বা কি? যদি সেই পূর্ণের সঙ্গে নিত্যসহবাস ঘটে, তবেই তো জীবন সফল হয় এবং সেই সফল জীবনই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। ঈশ্বরশূন্য নিত্য জীবন কখনও প্রার্থনীয় নহে!

সেই প্রেমময়ের সহিত অখণ্ড যোগ-সূত্রে আত্মা সন্নিবদ্ধ আছে বলিয়াই তো আছি! এখানে থাকিয়া পরলোকে স্পষ্টতর-রূপে তাঁহার অভয় অমৃত ক্রোড়ে স্থান পাইবার আশা ও আভাস পাইয়াই যখন এত আনন্দ, তখন না জানি সে অবস্থা কি অবর্ণনীয় প্রেমানন্দের আকর!

মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব মৃত্যুদর্শনে ভীত হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য ধর্ম্মের প্রথম সোপানে—পবিত্রতার ধাপে উঠিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় সোপানে না পৌঁছিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। অমৃত স্বরূপের সহবাস বা প্রেমরসাস্বাদনই দ্বিতীয় ধাপ্! সেখানে পৌঁছিলেই সাধকের নিকট মৃত্যু অমৃতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়! কেন না তখন স্পষ্টই দেখা যায়—

"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"

তিনি এই লোকভঙ্গনিবারণের জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

এপারে সংসার, ওপারে ব্রহ্মলোক—মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং সেতুস্বরূপ হইয়া উভয়-লোককে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; এ সত্য যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহার নিকটে মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজেই মৃত্যু তাহার ভয়ের কারণ নহে।

যাঁহার আশায় জীবিত আছি; যিনি এখানে আত্মার মধ্যে তাঁহার অমৃত জ্যোতি প্রকাশ করায় জীবন মধুময় সুখময় হইতেছে; যাঁহার অভাবে বিশ্ব-সংসার শূন্য অন্ধকার, এবং যাঁহার সত্তায় সকলই পূর্ণ—সকলই জ্যোতির্ম্ময়—আনন্দময়; যাঁহাকে পাইয়া সমস্ত ভুলিতে পারি, কিন্তু আর কিছুতেই যাঁহাকে কখনও ভোলা যায় না; তাঁহার সহিত যোগ যদি অক্ষুণ্ণ—অব্যাহত থাকে, বরং আরো ঘনিষ্টতর উজ্জ্বলতর রূপেই প্রতিভাত হয় এবং তাহা নিত্যকাল সম্ভোগ করা যায়; তবে এদেহ ছাড়িতে ভয় কি? দুঃখই বা কিসের?

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,

পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কখনও ভয় পান না।

অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপম্
চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য।
ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি॥

শ্বেত অশ্ব যেমন কৃষ্ণবর্ণ রোম পরিত্যাগ করে সেইরূপ পাপ পরিত্যাগ করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হয় সেইরূপ দেহাভিমান হইতে মুক্ত ও কৃতাত্মা হইয়া আমি ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিতেছি।

প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। তাঁহাকে যথার্থরূপে চাহিলে নিশ্চয়ই তিনি ধরা দেন।

যাহার পিপাসা নাই তাহার নিকট জলের মর্য্যাদা নাই। যথার্থ পিপাসু আত্মায় তিনি তাঁহার প্রেমামৃত—প্রসাদ-বারি বর্ষণ করেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাং॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধার দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধক তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইয়া ধন্য কৃতকৃত্য হয়। তাঁহার সহিত—পরব্রহ্মের সহিত নিত্য সহবাসই মুক্তি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে দিন আমাদের হৃদয় পরলোকগত কোন শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদের শোকে সমাকুল ছিল, শ্রীমন্মহর্ষিদেবকে তাহা ঘুণাক্ষরেও বলা হয় নাই; অথচ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠিক্ সেই বিষয়েরই উপদেশ করিলেন। আরও অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়াই একথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা বিনা চিন্তায় ও বিনা প্রার্থনায় সাধুসঙ্গে পাওয়া যায়। আমরা শাস্ত্রে যে সকল সত্যের বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করি, সিদ্ধ সাধকের নিকট তাহা প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হই, সেজন্যই শাস্ত্র পাঠ অপেক্ষা সাধুসঙ্গের সমধিক মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

'সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং
তীর্থভূতা হি সাধবঃ।'

যদিও নানা কারণে প্রার্থনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দর্শন সকল সময়ে ঘটে না, কিন্তু কিন্তু যখনই সে সৌভাগ্য উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ণ সুধা-ভাণ্ডের অমৃতধারার ন্যায় তাঁহার চিরানুভূত সরল সত্য উপদেশ আমাদের চিত্তচকোরকে পরিতৃপ্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য একান্ত তৃষ্ণার্ত্ত লালায়িত করে।

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

কৃষ্ণাবতার।

১১শ প্রস্তাব।

চীন-পরিব্রাজক সর্ব্বপ্রথম যখন ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তিনি পুরুষোত্তমে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত রথ যোগে টানা হইত দেখিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রথযাত্রা ঐ দন্তোৎসবের হিন্দুয়ানি সংস্করণ কি না তাহার আলোচনা বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। তবে জগন্নাথের মূর্ত্তিবৈচিত্র্য জাতিভেদের অভাব প্রভৃতি যাহা শ্রীক্ষেত্রে রহিয়াছে, তাহার কারণ ও উৎপত্তি ভাবিবার বিষয়। অনেকে ওঁঙ্কারের সহিত জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখিয়া জগন্নাথদেবকে ওঁঙ্কার বা প্রণবমূর্ত্তি বলিতে চাহেন। তবে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি যে ঈশ্বরের ত্রিত্বভাবের বিকাশক নহে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ উৎকল-খণ্ডে ভগবানের চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিই প্রতিপাদ্য। আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে স্নানযাত্রা রথযাত্রা পার্শ্বপরিবর্ত্তনযাত্রা হিন্দোলযাত্রা প্রভৃতি বিবিধ যাত্রার যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে আত্মবৎ সেবা ক্রমে ক্রমে আধ্যাত্মিক উপাসনার স্থান অধিকার করিয়া লইল। অবতারবাদের সহিত মূর্ত্তিপূজার ঘনিষ্টতম যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র যতদিন জীবিত ততদিন তাঁহারা সাধারণের নিকট শ্রদ্ধাভক্তি পাইয়া থাকিবেন, তবে তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ অতিরঞ্জিত করিয়া যখন বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত অধ্যাত্মরামায়ণাদি বিরচিত হইল, যখন তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতার বলিয়া ঘোষিত হইতে লাগিলেন, তখন রামভার্য্যা সীতা প্রকৃতি বলিয়া চিত্রিতা হইলেন, অশ্রুতপূর্ব্বা রাধিকা প্রকৃতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে ইতিহাস উপেক্ষিত হইতে লাগিল, কল্পনা তাহার স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন ঐ সময়কে এদেশের পক্ষে অবতারের যুগ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু অবতারবাদ ঠিক এইখানে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। ক্রমে অবতারে আরোপিত লীলাসমূহ চিত্র ও গঠনবিদ্যার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইল। ঐসমস্ত লীলার কালাকাল নিরূপণ করিয়া স্থূল ভাবে তাহাদিগকে সাধারণের দৃষ্টিপথে আনিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। এসমস্ত আয়াস যে মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ক্রমে মৃত্তিকা বা ধাতুগঠিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির হস্তে মুরলী দিয়া রাধিকাকে তাঁহার বামে স্থান হইল। মৃত্তিকাগঠিত গোপীগণকে তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সমবেত করা হইল। তখন নির্ম্মাণকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী, বিচিত্র বসনের অন্তরালে গোপীদিগের পরিস্ফুট যৌবন—বিলাসবিভ্রম ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কখন বা যন্ত্রকৌশলে ব্রজাঙ্গনাদিগকে কৃষ্ণের চারিধারে ভ্রামিত করা হইল। অনুরূপ সঙ্গীত ও স্তবস্তুতি গীত ও নিনাদিত হইয়া উহাতে আরও সজীবতা আনিয়া দিল। বলিতে কি পুস্তকের বর্ণনা তখন আর পুস্তকের ভিতরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া কাব্য বা নাটকের অভিনয়ের ন্যায় স্থূলভাবে প্রদর্শিত ও পর্য্যালোচিত হইতে আরম্ভ হইল। ইতর সাধারণ সকলেই ভক্তিভরে শ্রদ্ধানিমীলিত-নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থূলমূর্ত্তিতে সোৎকণ্ঠে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামের আবির্ভাব সম্বন্ধে

বিশ্বাস ও ধারণা দৃঢ় হইয়া আসিল, মূর্ত্তিগঠনের দিকে লোকের অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহাদিগকে আপনাদের ন্যায় শরীরী জানিয়া তাঁহাদের নিত্য সেবা ভোগাদি ও পূজার ব্যবস্থা সংরচিত হইতে আরম্ভ হইল। এই ভাবেই অবতার হইতে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন এ দেশে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অধিকাংশস্থলে মূর্ত্তিপূজা এই ভাবেই যে আসিয়াছে তাহার সবিশেষ আলোচনা ভবিষ্যতে করিতে ইচ্ছা রহিল।

ধর্ম্মগ্রন্থের অংশবিশেষ লইয়া অভিনয়, কিম্বা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত, মূর্ত্তিনির্ম্মাণে তাঁহার পূজা, অথবা তাঁহার মূর্ত্তির অত্যধিক প্রচলন কিছু অন্য ধর্ম্মের মধ্যেও বিরল নহে। অতি প্রাচীন কালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজকগণ বাইবেলের কোন কোন অংশ লইয়া সাধারণের সমক্ষে তাহার অভিনয় করিতেন, রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশা ও মেরীর পূজা ও তাঁহাদের মূর্ত্তির প্রচলন সর্ব্বজনবিদিত; বৌদ্ধেরা নাস্তিক হইলেও বুদ্ধমূর্ত্তি তাঁহাদের নিকট হইতে দেবোচিত সেবা ও পূজা লাভ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার থাকিলেও বর্ত্তমান প্রস্তাবের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ-দূরত্ব নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কংস কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলেন। কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়া উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, গর্গের নিকট উভয় ভ্রাতার উপনয়ন সংস্কার হইল। পরে তাঁহারা কাশীতে গিয়া সন্দীপনি মুনির নিকট বেদ বেদাঙ্গ কলাবিদ্যা ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন এবং গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সন্দীপনির মৃত-পুত্রকে জলাসুর দিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া দিলেন, এবং গুরুর নিকট বিদায়গ্রহণান্তে মথুরায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দিবস মথুরায় অবস্থান করিলে তাঁহার দেহ যৌবনশ্রী লাভ করিল। তিনি সুখে চারিদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ রাজা জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংশের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯০ অধ্যায়) রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে রণে অবতীর্ণ হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলরামের সহিত জরাসন্ধের ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে এমন সময়ে দৈববাণী হইল, "রাম! মগধরাজ জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে, দুঃখ করিও না, ক্ষান্ত হও, আমি ইহার মৃত্যুর যে বিধান করিয়াছি জরাসন্ধ অচিরকাল মধ্যেই তাহা হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।" জরাসন্ধ এতাদৃশী দৈববাণী শ্রবণে বিমনা হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলেন এবং স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু একেবারে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি বারংবার যাদবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। হরিবংশের ৯৯ অধ্যায়ে করবীরপুরের বাসুদেবশৃগাল নামক জনৈক রাজার উল্লেখ আছে। তিনি আপনাকে বাসুদেব বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিলেন আইস আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তুমি নিহত হইলে আমি লোকমধ্যে অদ্বিতীয় বাসুদেব হইব অথবা আমি নিহত হইলে তুমিই একমাত্র বাসুদেব হইবে। ফলতঃ শৃগাল বাসুদেব রণে বিনষ্ট হইলেন। পুরাকালেও জাল (pretender) রাজারও অস্তিত্ব

ছিল ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই বৃত্তান্তটি হরিবংশে পাওয়া যায়, বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতে নাই।

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে কালযবনের উল্লেখ আছে। কালযবন (ভাগবতের মতে) তিন কোটি সৈন্য লইয়া মথুরা অবরোধ করে (১০ ম স্কন্ধ ৫০ অধ্যায়)। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন কালযবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি জরাসন্ধ আসিয়া যোগ দেয় তবে আমাদের বিনাশ নিশ্চিত। এই ভাবিয়া তিনি সমুদ্রকূলে দ্বারকায় দ্বাদশ যোজন-ব্যাপী এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাণ্ড দুর্জ্জয় দুর্গ সন্নিবেশে তাহা সুরক্ষিত করিলেন ও মথুরাবাসী সমস্ত লোককে দ্বারকায় আনিয়া বাস করাইলেন, এবং স্বয়ং কালযবনের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কালযবন কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিবার মানসে ধাবমান হইল, কৃষ্ণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এক গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে কালযবনও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কে যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন সে তাঁহাকে কৃষ্ণ ভাবিয়া পদাঘাত করিল। কিন্তু তিনি কৃষ্ণ নহেন মুচুকুন্দ। মুকুকুন্দ জাগ্রত হইয়া দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার ক্রোধে জ্বলিত অগ্নি দ্বারা যবনরাজ অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তৎপরে মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এইখান হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। কেন না মুচুকুন্দ গুহা হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন মনুষ্যের আকার ক্ষুদ্র। অতঃপর মুচুকুন্দ তপস্যা মানসে নরনারায়ণের আবাসস্থান গন্ধমাদনে প্রস্থান করিলেন। মূলে আছে—

"গুহামুখাদ্বিনিক্রান্তো দদৃশে সোঽল্পকান নরান্
ততঃ কলিযুগং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং তপ্তুং নৃপস্তপঃ
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্।
বিষ্ণুপুরাণ। ৫ অংশ। ২৪ অধ্যায়। ৫ শ্লোক।

কৌশলক্রমে এইরূপে কালযবনের বিনাশে এবং জরাসন্ধের বারংবার পরাজয়ে শান্তি স্থাপিত হইলে বলদেব গোকুলে নন্দালয়ে গমন করিলেন এবং পাত্রবিশেষে গোপগোপীদিগের মধ্যে কাহাকে বা প্রণাম কাহার সহিত পরিহাস করিলেন। কতকগুলি গোপী প্রথমে কুপিতা হইয়া ঈর্ষাযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। কেহ বা বলিল চঞ্চলপ্রেম নগরবাসিনী রমণীদিগের প্রিয় কৃষ্ণ, ত সুখে আছেন। আমরা যে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মধুর সঙ্গীত করিয়াছিলাম তাহা কি তাঁহার মনে আছে। অথবা কৃষ্ণের কথায় আবশ্যক নাই, অন্য কথা কহা যাউক—

তস্যাস্মাভির্ব্বিনা তেন বিনাস্মাকং ভবিষ্যতি

আমাদের ছাড়িয়া কৃষ্ণের চলিতেছে, সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদেরও দিন যাইবে। রাসলীলায় বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় এখানেও গোপীদিগের প্রেমে আবিলতা অনুমানের কারণ দেখা যায় না। কৃষ্ণপ্রেমে আবিলতা থাকিলে তাহা বলরামের সম্মুখে গোপীরা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের ২৪। ২৫ অধ্যায়ে ভাষায় দূষণীয়তা অনুসূচিত হয় না। ঐ ২৪ অধ্যায়ের শেষে আছে যে বলরাম গোপীদিগের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ২৫ অধ্যায়ে বলরাম মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া যমুনাকে ক্রোধে ব্রজভূমিতে আকর্ষণ করেন। বলরাম দুই মাস

বৃন্দাবনে থাকিয়া দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্ত হয়েন এবং রৈবতরাজকন্যা রেবতীর পাণিগ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রাদ্ধ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা।

হে পরম পিতা অখিল মাতা, দশরাত্র গত হইল আমার ভক্তিভাজন পিতৃব্য তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় যুবা বয়সেই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। আমরা আর তাঁহার সেই সৌম্য সুন্দর বিনয়নম্র প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তিনি এই অল্পকাল পৃথিবীতে থাকিয়া অমায়িক সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংসারের কোন প্রতিকূলতায় কোন কঠোর সংঘাতে কেহ তাঁহাকে কখনো সহিষ্ণুতা পরিহার করিতে দেখে নাই। তিনি সকল অবস্থাতেই আপন অপরাজিত স্নিগ্ধমধুর ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। পরিবারের গৌরব, মঙ্গল ও শ্রীসংসাধনে তাঁহার আন্তরিক যত্ন সর্ব্বদা তাঁহাকে সতর্ক সচেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। গুরুজনের প্রতি সেই স্বজনবৎসল মহাত্মার অকুণ্ঠিত ভক্তি ছিল; এই বিপুল পরিবারের মধ্যে তাঁহার মান্য ব্যক্তি এমন কেহ নাই যিনি কোন দিন তাঁহার নিকট হইতে কোন রূঢ় বাক্য বা অশিষ্ট আচরণের আভাস মাত্র সহ্য করিয়াছেন। গুরু ব্যক্তির আদেশ পালনে, স্নেহাস্পদদিগের কল্যাণসাধনে এবং বয়স্যবর্গের সর্ব্বপ্রকার সহায়তায় তিনি সর্ব্বদাই অশ্রান্তচিত্তে প্রসন্নবদনে প্রস্তুত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বলক্ষয়কর রোগে তাঁহার সুকুমার শরীর ক্লিষ্ট হইয়া ছিল, কিন্তু স্বদেশের মঙ্গলজনক বিবিধ সাধু অনুষ্ঠানে তাঁহার উৎসাহ কখন ম্লান হয় নাই। আমাদের বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতন পবিত্র কল্যাণভাব আনয়নের জন্য তিনি আপন ক্ষীণ দেহকে উপেক্ষা করিয়া নানা প্রকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—আমাদের বিচ্ছিন্ন বিভক্ত মাতৃভূমিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ঐক্যবন্ধনে সংযত করিবার দুরূহ সাধনায় তিনি আপন দেহপাত করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই দুর্ব্বল শরীর তাঁহার সদা-সচেষ্ট উদার হৃদয়ের ভার বহন করিতে পারিল না, তাঁহার চিরলালিত সাধু সংকল্প, তাঁহার যত্নারব্ধ প্রিয় অনুষ্ঠানগুলি অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

হে বিশ্বপিতা, তাঁহার যাহা কিছু নশ্বর তাহা লোপ পাইয়াছে কিন্তু তাঁহার সেই সুমধুর সৌজন্য, প্রশান্ত সহিষ্ণুতা, অদম্য অধ্যবসায়, স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে অক্লান্ত উৎসাহ আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অক্ষয় জীবন ধারণ করিয়া যেন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। হে সিদ্ধিদাতা, তাঁহার সাধু সংকল্প তাঁহার দেহের সহিত অবসান না হৌক! অদ্য তাঁহার বাধা বিঘ্ন দুর্ব্বলতা দূর হইয়া তোমার বিশ্বব্যাপী অপরিমেয় মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার সকল ইচ্ছা সকল প্রয়াস পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করুক! তিনি সেই নিদারুণ রোগতাপের অন্তিম-রজনী-অবসানে যে

নূতন উষালোকে নিরাময় আনন্দধামে নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন সেখানে তোমার প্রসাদ-সমীরণে অক্ষয় বল লাভ করিয়া তিনি তোমার বিশ্বহিতব্রতে অনন্ত কাল নিযুক্ত থাকুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্য পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

THE LATE BABU BALENDRA NATH TAGORE.

Our readers will be struck at the very sight of the above heading. Babu Balendra Nath Tagore., the grandson of Maharishi Debendra Nath Tagore, is no more. He died about a week ago in Calcutta. The melancholy news comes as a sudden and unexpected surprise upon the Punjab people. We were simply shocked to read the obituary notice in the Calcutta papers, and we must confess that for a minute or so we were almost stunned. Babu Balendra Nath paid two visits to this Province. The last time he visited Lahore was in March 1899. Those who have had the privilege of being acquainted with him will feel extremely sad on hearing of his untimely death. He was a man of affable temper, highly civil, courteous and gentle. There was an amount of vivacity in his conversation that could not fail to have a very cheering effect on those that came in contact with him. Possessing a highly devotional turn of mind, he took a genuine interest in all matters pertaining to the spiritual advancement of the people. He had a fair knowledge of Sanskrit language and could recite with due accents the Upnishat texts. His labours in connection with bringing about a happy alliance between the Adi Brahmo Samaj and Arya Samaj will long be remembered with gratitude by those interested in this work. He had his own scheme of work and the last time we spoke to him on his noble missi on he told us that he did not believe in fuss but would silently give effect to his scheme which he did not want to put into print or communicate to any body. Alas that scheme will now remain unrealized. We were contemplating to write to him when all of a sudden the sad news burst upon us. The death of Babu Balendra Nath removes a very noble and useful man from the Brahmo Society, To the Bengali public his loss is also irreparable since he was a writer of note in the Bengali tongue. He was quite a youngman, hardly over thirty years. His death is a great blow to the venerable Devendra Nath Tagore in his old age. We offer our sincere condolence to the berieved family. May the Almighty Father grant them peace of mind.

পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকান্তর প্রাপ্তি সংবাদে পঞ্জাব আর্য্য-প্রতিনিধি সভা হইতে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের নিকট যে শোকসূচক পত্র আইসে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

"শোক! শোক! মহা শোক!!!

শ্রীমতী আর্য্য প্রতিনিধি সভা পঞ্জাবনে অত্যন্ত শোকদায়ক সমাচার, শ্রীমান বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকী অকাল মৃত্যুকা শুনা হৈ, বাবু বলেন্দ্রনাথ জী আদি ব্রহ্মসমাজকে ভূষণ থে, উনকা মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জী মহারাজকে গ্রন্থোকা পঠন, উনকা পরেম ভাব, উনকা লাহোরকে আকর আদি-ব্রহ্মসমাজ ঔর আর্য্য সমাজ পরস্পর পরেম করনে কী শিক্ষা দেনা ঐ সে উত্তম কাম হৈং জো সদা কে লিয়ে উনকে নাম কো প্রখ্যাত রখেঙ্গে ঐ সে সজ্জন কী মৃত্যুকা শোক সমাচার শুন কর যাঁহা সজ্জনোকে হৃদয় ফট রহে হৈং, ঔর ইস শোক সময়মে সভা শ্রীমান্ বাবু বলেন্দ্রনাথ কে সর্ব্ব পরিবারকে সাথ অত্যন্ত সহানুভূতি প্রগট করতী হুই, ঈশ্বর সে প্রার্থী হৈ কি বহ আপ সবকে দগ্ধ হৃদয়কো শান্তি প্রদান করেং॥

আপকা শুভ চিন্তক
আত্মারাম
স্থানাপন্ন মন্ত্রী।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৯৮৶৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৪২।৶৬
সমষ্টি	...	৮৪১। ৯
ব্যয়	..	২৬৫॥ ৩
স্থিত	...	৫৭৫৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৭৫৶৬
	৫৭৫৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১৪৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪০৲
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর	৩৲
	১৪৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২০।৶০
বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত „ শ্রীগোপাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
„ „ দ্বারকানাথ রায়,	ঐ	৩৲
„ „ বনমালী চন্দ্র,	ঐ	৩৲
„ „ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস,	ঐ	৩৲
„ „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	১৲
„ রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর,	ঐ	৩৲
„ বাবু মদনলাল সেট,	বর্দ্ধমান	৩।৶০
		২০।৶০
পুস্তকালয়	...	৪৮৶৬
যন্ত্রালয়	...	১২৯॥৯
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৲
সমষ্টি		২৯৮।৶৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৭৬৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২৮৶০
পুস্তকালয়	...	৵০
যন্ত্রালয়	...	৭৬।৶৩
সমষ্টি		২৬৫॥৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭এ সেপ্টেম্বর (১১ই আশ্বিন) বুধবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় সিটী কলেজ ভবনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬৬ বার্ষিক সভা হইবে। সর্ব্ব সাধারণকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৮৯৯। ১৫ই সেপ্টম্বর। } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত। স্মরণার্থ সভা সম্পাদক।

আগামী ৩ রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইবে। ভক্ত সাধু সকল যথা সময়ে উৎসবক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

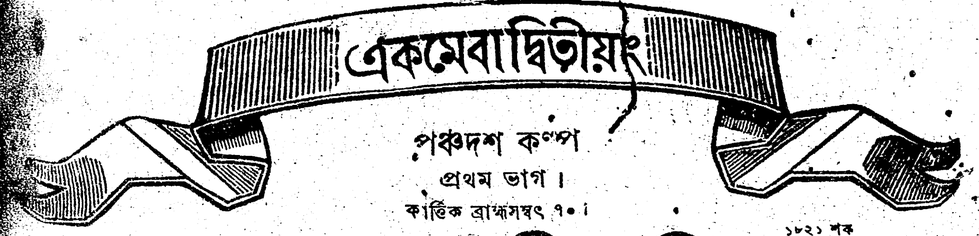

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০। ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়			পৃষ্ঠা
শুভ-দর্শনে সঞ্চয় (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	...	১০৫
উৎসব ও ব্রহ্মোৎসব (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	...	...	১০৭
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)		১০৯
মোক্ষমূলারের পত্র	...	....	১১২
প্রেরিত	...	...	১১৩
কৃষ্ণাবতার (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১১৫
সংবাদ (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১১৮

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৬। কলিগতাব্দ ৫০০০। ১ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০। ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয় জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয়মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা বড় বাধিত পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬০৫ সংখ্যা ১৭২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শুভ-দর্শনে সঞ্চয়।

এবার কলিকাতায় গিয়া ৭ই ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ণে পুণ্যশ্লোক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের দর্শনার্থে গিয়াছিলাম। যখনই তাঁহার চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হই, তখনই আমরা তাঁহার বদনকমল হইতে সেই ত্রিভুবনপতি ভক্তচিত্তনন্দনের প্রেম-সঙ্গীত ও অনন্ত দয়ার সমাচার শুনিয়া ধন্য হই।

বেদের শীর্ষস্থানীয় উপনিষৎ নিত্য-যোগানন্দ মহর্ষিদেবের গভীর সাধনোপলব্ধ সত্যের সমাচারে পূর্ণ; এবং ভগবৎ-প্রেমের কবি হাপেজের প্রেম-কবিতা তাঁহার প্রাণের ভাষায় গ্রথিত; তজ্জন্যই প্রায় কথায় কথায় হয় উপনিষদের জ্ঞান প্রেমের চিরসিদ্ধ শ্লোক, নয় হাপেজের সুমধুর প্রেমকাব্য তদীয় দিব্য কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

সেদিন সেই বিশ্বপ্রেমিক বরণীয় মহাত্মা পরলোক ও মুক্তির বিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন—"তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি নিত্য জীবনও লাভ হয়, তবে সেই শূন্য জীবনে সুখ কি, লাভই বা কি? আর যদি সেই পূর্ণের সঙ্গে নিত্য সহবাস ঘটে, তবেই তো জীবন সফল হয় এবং সেই সফল জীবনই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। ঈশ্বরশূন্য নিত্য জীবন কখনও প্রার্থনীয় নহে।

সেই প্রেমময়ের সহিত অখণ্ড যোগ-সূত্রে আত্মা সন্নিবদ্ধ আছে বলিয়াই তো আছি! এখানে থাকিয়া পরলোকে স্পষ্টতররূপে তাঁহার অভয় অমৃত ক্রোড়ে স্থান পাইবার আশা ও আভাস পাইয়াই যখন এত আনন্দ, তখন না জানি সে অবস্থা কি অবর্ণনীয় প্রেমানন্দের আকর।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব মৃত্যুদর্শনে ভীত হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য ধর্ম্মের প্রথম সোপানে পবিত্রতার ধাপে উঠিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় সোপানে না পৌঁছিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। অমৃতস্বরূপের সহবাস বা প্রেমরসাস্বাদনই দ্বিতীয় ধাপ্! সেখানে পৌঁছিলেই সাধকের নিকট মৃত্যু অমৃতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়! কেন না তখন স্পষ্টই দেখা যায়—

"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"

তিনি এই লোকভঙ্গনিবারণের জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

এপারে সংসার, ওপারে ব্রহ্মলোক—মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং সেতুস্বরূপ হইয়া উভয় লোককে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; এ সত্য যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহার নিকটে মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজেই মৃত্যু তাহার ভয়ের কারণ নহে।

যাঁহার আশায় জীবিত আছি; যিনি এখানে আত্মার মধ্যে তাঁহার অমৃত জ্যোতি প্রকাশ করায় জীবন মধুময় সুখময় হইতেছে; যাঁহার অভাবে বিশ্ব-সংসার শূন্য অন্ধকার, এবং যাঁহার সত্তায় সকলই পূর্ণ—সকলই জ্যোতির্ম্ময়—আনন্দময়; যাঁহাকে পাইয়া সমস্ত ভুলিতে পারি, কিন্তু আর কিছুতেই তাঁহাকে কখনও ভোলা যায় না; তাঁহার সহিত যোগ যদি অক্ষুণ্ণ—অব্যাহত থাকে, বরং আরো ঘনিষ্টতর উজ্জ্বলতর রূপেই প্রতিভাত হয় এবং তাহা নিত্যকাল সম্ভোগ করা যায়; তবে এদেহ ছাড়িতে ভয় কি? দুঃখই বা কিসের?

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,

পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কখনও ভয় পান না।

অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপম্
চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য।
ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি॥

শ্বেত অশ্ব যেমন কৃষ্ণবর্ণ রোম পরিত্যাগ করে সেইরূপ পাপ পরিত্যাগ করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হয় সেইরূপ দেহাভিমান হইতে মুক্ত ও কৃতাত্মা হইয়া আমি শাশ্বত ব্রহ্মলোককে অনুভব করিতেছি।

প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। তাঁহাকে যথার্থরূপে চাহিলে নিশ্চয়ই তিনি ধরা দেন।

যাহার পিপাসা নাই তাহার নিকট জলের মর্য্যাদা নাই। যথার্থ পিপাসু আত্মায় তিনি তাঁহার প্রেমামৃত—প্রসাদ-বারি বর্ষণ করেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাং॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধার দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধক তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইয়া ধন্য কৃতকৃত্য হয়। তাঁহার সহিত—পরব্রহ্মের সহিত নিত্য সহবাসই মুক্তি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে দিন আমাদের হৃদয় পরলোকগত কোন শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদের শোকে সমাকুল ছিল শ্রীমন্মহর্ষিদেবকে তাহা ঘুণাক্ষরেও বলা হয় নাই; অথচ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠিক্ সেই বিষয়েরই উপদেশ করিলেন। আরও অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়াই একথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা বিনা চিন্তায় ও বিনা প্রার্থনায় সাধুসঙ্গে পাওয়া যায়। আমরা শাস্ত্রে যে সকল সত্যের বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করি, সিদ্ধ সাধকের নিকট তাহা প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হই, সেজন্যই শাস্ত্র পাঠ অপেক্ষা সাধুসঙ্গের সমধিক মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

'সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং
তীর্থভূতা হি সাধবঃ।'

যদিও নানা কারণে প্রার্থনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দর্শন সকল সময়ে ঘটে না, কিন্তু যখনই সে সৌভাগ্য উপস্থিত হয়, তখনই পূর্ণ সুধা-ভাণ্ডের অমৃতধারার ন্যায় তাঁহার চিরানুভূত সরল সত্য উপদেশ আমাদের চিত্তচকোরকে পরিতৃপ্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য একান্ত তৃষ্ণার্ত্ত লালায়িত করে।

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২১ শক। ১১ আশ্বিন, বুধবার।

উৎসব ও ব্রহ্মোৎসব।

মনুষ্যের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখ, উৎসরের দিকেই তাহার আন্তরিক টান। মনুষ্য বড় দুঃখী। রোগে শোকে, নানাবিধ ক্লেশ কষ্টে, সে দিনপাত করে। তাহার মলিন মুখ প্রায় অনেক সময়েই বিষণ্ণ থাকে। এই বিষাদময়ী পৃথিবীতে সে আনন্দ করিবার অবসর অতি অল্পই পাইয়া থাকে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে উৎসবের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে উৎসাহ সহকারে সঞ্চরণ করিয়া আপন নির্জ্জীব দেহে প্রাণ সঞ্চয় করে। এই বিশাল পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া দেখ, ইহার সর্ব্বত্রই উৎসবের সৃষ্টি। পুরাতন গ্রীক, রোম, ইজিপ্ত, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে, কত প্রকার বিজয়োৎসব ও ধর্ম্মোৎসব হইত। এই আধুনিক কালেও সেই উৎসবের স্রোত চলিয়া আসিতেছে। মৃতপ্রায় এই বঙ্গভূমিতে অদ্যাপিও উৎসবের প্রাণ সঞ্চারিত আছে। যদিও সকল উৎসবের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই, তথাপি দুঃখার্ত্ত মনুষ্যকে, ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্ল দেখিলে, কেন না হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হইবে?

কত লোক উদরান্নের জন্য প্রবাসে অবস্থিতি করে, উৎসবের সময়—বিশেষতঃ দেশব্যাপী উৎসবের সময়, তাহারা স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া থাকে। শরাসনে উদ্যত শরের ন্যায় তাহাদের মন তখন নিজ গৃহের দিকে উন্মুখ থাকে। গৃহে স্নেহের প্রতিমা জননী, প্রেমের ছবি প্রিয়া, প্রাণাধিক সন্তান সন্ততি, পুত্র, স্বামী, পিতা ও আত্মীয় স্বজনের আগমন প্রতীক্ষায় কেমন চাতকবৎ সতৃষ্ণ হইয়া থাকে! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, যেমন অরুণোদয়ের শোভা, উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাদের হৃদয়, ঠিক তেমনি অনুরাগ-রাগে রঞ্জিত। এই সময়ে মন্দিরের ঐক ঘোর ঘটা পড়িয়া যায়। জলে স্থলে লোকে সজোরে পদবিক্ষেপ করিয়া উৎসাহভরে, একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইয়া থাকে। জলে নৌকার দাঁড় ত্বরিত বেগে পড়িতে থাকে। দাঁড়ী মাঝিরাও আহ্লাদে গদ গদ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করে। যে যত দুঃখী হউক না কেন, উৎসবের সময়, সকল দেশের সকল লোক, নব বস্ত্র পরিধান করে। যে দেশে যে বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহৃত, সেই দেশে সেই সেই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠে। অবস্থাপন্ন লোকেরা কেবল নিজে নিজে ভাল খাইয়া ভাল পরিয়া তৃপ্ত হয় না। দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়া মনুষ্য-জীবনের সার্থক্য সাধন করে। "দানাৎ পরোনাস্তি" এই বাক্যের সার্থক্য তাহারা উৎসবের সময়েই বিশেষরূপেই করিয়া থাকে। মনুষ্যের কার্য্যকলাপরূপ স্বর্ণ-হারের স্বর্ণফুলের মধ্যে উৎসবই সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে। কে এ উৎসবের অনাদর করিবে?

শরৎকালই উৎসবের অনুকূল সময়। সেই কাল এখন সমাগত হইয়াছে। প্রকৃতি স্বয়ং এখন পরমেশ্বরকে পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত। অরুণ শোভিত এখনকার উষা কালের কি রমণীয় ভাব! নক্ষত্রখচিত চন্দ্রমাশোভিত নির্ম্মল নীলাকাশের কি অপরূপ শোভাই দৃষ্ট হইতেছে। নিশাকালে চন্দ্রমাকে দেখিলে একবার মনে হয়, নীলাকাশ-রূপ নীল সমুদ্রে সোণার তরী ভাসিয়া যাইতেছে। আবার মনে হয়, বড় বড় নক্ষত্র সকল যেন ছোট ছোট নক্ষত্রনিচয়ের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া স্বর্গস্থ প্রবীণ দেবতাদিগের ন্যায়, ছোট ছোট দেব-শিশুর কানে কানে ঈশ্বরের মহিমা-গান শিক্ষা দিতেছে। যেন তাঁহারা তালে তালে নৃত্য করিয়া গগনাঙ্গনে এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। গগনস্থ শোভারাশি সমুদ্র নদী হ্রদ ও সরোবরের স্বচ্ছ সুলিলে পতিত হওয়াতে, মনে হইতেছে, যেন জলে কত আলো জ্বলিতেছে। পাহাড় পর্ব্বত উন্নত পাদপ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সকল চারিদিকের জলরাশিরূপ মুকুরে স্বীয় স্বীয় সুন্দর দেহকান্তি দর্শন করিয়া আহ্লাদে প্রেমভরে কি এক মধুর হাসি হাসিতেছে।

"সম শোভা জলে স্থলে।
তরুরাজি নবদলে।"

ঐ দেখ শরতের গৌরবস্থল শতদল পদ্ম দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে প্রফুল্ল হইয়া জল আলো করিতেছে। ইহ লোকের তৃপ্তিকর ভোগের সামগ্রী মধ্যে সুধাময় জ্যোৎস্না গঙ্গাবক্ষে ও হরিৎবর্ণ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া বর্ণনাতীত শোভা বিস্তার করিতেছে এবং জগৎকে শ্বেতবর্ণ দ্বীপের ন্যায় রূপ ধারণ করাইতেছে। কুমুদ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীকে কৌমুদীময় করিতেছে। রক্তজবা সেফালিকা, চম্পক, নাগকেশর প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। "হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্র দৃষ্টি মাত্র সুখী নেত্র" যদি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে ঐ ধান্যমঞ্জরীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যখন বায়ুভরে ঐ সকল ধান্যমঞ্জরী তরঙ্গায়িত হয়, তখন মনে হয়, ঈশ্বরেরই করুণা বুঝি পৃথিবীতে তরঙ্গায়িত হইতেছে। ঐ দেখ কত শত কপোত ও বিহঙ্গ ক্ষেত্রমধ্যে সূর্য্যকিরণে প্রফুল্ল হইয়া শস্য সকল খুটিয়া খুটিয়া খাইতেছে। শুক প্রভৃতি পক্ষীরা ধান্যমঞ্জরী মুখে করিয়া গগনমার্গে কেমন উড্ডীন হইতেছে। শোভার আকর পরমেশ্বর এই সকল শোভা যে এখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিলেন তাহা কি ব্যর্থ যাইবে। এই সকল শোভা ভেদ করিয়া এখন কি আমরা শিব সুন্দর পরমেশ্বরকে দেখিব না? তাঁহার চরণে অবনত হইব না? শরৎকালই প্রকৃত ব্রহ্মোৎসবের কাল। "সুকাল শরৎকাল সুপ্রেমের তিথি" দেখ এখন মেঘমুক্ত আকাশকে কেমন প্রশস্ত দেখাইতেছে, এমন কালে আমাদের হৃদয়-আকাশই কি কেবল সঙ্কুচিত থাকিবে? পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার চরণে গন্ধদান করিতেছে, আমাদের হৃৎপদ্মই কি কেবল মুদিত থাকিবে? আমরা মনুষ্য হইয়া কি তাঁহাকে হৃদয়ের ফুলে এখন পূজা করিতে পারিব না?

নদী সকল পূর্ণ হইয়াছে, আমাদেরই প্রেমনদী কি এখন শুষ্ক হইয়া রহিবে? তাহারা কল কল ধ্বনি করিয়া তাঁর গুণ গান করিতেছে, আমাদের রসনাই কি কেবল এ সময়ে নীরব থাকিবে? আমরা

জ্ঞানের গরিমা করি, কিন্তু এমন পবিত্র কালে আমরা কি সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞান-নয়নে—ভক্তি-নয়নে দর্শন করিব না? গঙ্গাতীরে বা প্রশস্ত হরিৎবর্ণ ক্ষেত্রে বসিয়া এখন কি শোভাময় ঈশ্বরে আত্মসমাধান করিব না? এইরূপ উপাসনাই কি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নয়? এই কি প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব নয়? যদিও যে তাঁহাকে যে ভাবে ডাকে, যে তাঁহাকে পুষ্প দিয়া পূজা করে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন, তথাপি অন্তরেই প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব। অন্তরে তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাঁহারা তাঁর পূজা করেন তাঁহারাই বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করেন। তাঁহারাই নির্দ্দোষ উৎসব উপভোগ করেন। তাঁহারাই ব্রহ্মোৎসব করেন। উঠ ব্রহ্মোপাসকগণ উঠ। জড়তা ও দীর্ঘসূত্রতা ছাড়। দাও বাজাইয়া, হৃদয়-তন্ত্রীতে সেই ব্রহ্ম-নাম বাজাইয়া দাও। হও মগ্ন ব্রহ্মরসে হও মগ্ন,—হবে দুঃখ ক্লেশ ভগ্ন। "শাঁক ঘণ্টা কাঁসর আদি সব দাও ফেলে। তাঁহাকে আরতি কর জ্ঞানদীপ জ্বেলে॥" দাও বলি তাঁর চরণে—ষড় ঋপু—দাও বলি-দান। ডাক তাঁরে ডাক "ব্রহ্ম নাম অনল উঠুক মুখ ফুড়ে। পাপরূপ তৃণ রাশি ছাই হউক পুড়ে।"

হে দেব! এই পবিত্র শরৎকালে তুমি আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে প্রকাশিত হও। আমরা তোমার ধ্যানে মগ্ন হই। অরূপ-রূপ-সাগরে ডুবিয়া যাই। পরমানন্দে আপ্লাবিত হই। এই আমাদের উৎসব—এই আমাদের শরদোৎসব—এই আমাদের ব্রহ্মোৎসব! তুমি কৃপা করিয়া এই প্রকার উৎসব হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেরণ কর; পৃথিবীময় বিস্তার কর। এই প্রার্থনা—এই ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

প্রকৃত কথা এই যে, শাক্তধর্ম্ম এবং শৈবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের এক প্রকার রাজসিক এবং তামসিক অপভ্রংশ। তার সাক্ষী—

(১) বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঈশ্বরবিহীন জগৎ (২) সাংখ্য দর্শনের ঈশ্বরহীনা প্রকৃতি (৩) শাক্তধর্ম্মের দিক্‌বিদিক্ শূন্যা কালী, এ তিনটিকে বাম পার্শ্বে রাখা হো'ক্; আর, (১) বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ (২) বেদান্তদর্শনের তুরীয় অবস্থাপন্ন পুরুষ (৩) শৈবধর্ম্মের উদাসীন ভোলা মহেশ্বর, এ তিনটিকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখা হো'ক্। এখন,—বাম পার্শ্বের তিনটিকেই দেখি, আর, দক্ষিণ পার্শ্বের তিনটিকেই দেখি, যে পার্শ্বের তিনটিকেই দেখি না কেন, দেখিলেই মনে হয়—যেন উহা একই শ্লোকের তিনটি ঈষৎ বিভিন্ন পাঠান্তর, অথবা একই আদর্শ লিপির তিনটি ঈষৎ বিভিন্ন প্রতিলিপি। তা ছাড়া—এটা যদি সত্য হয় যে, দর্শন পুরাণ উপপুরাণ এবং তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি, তাহা হইলে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, তিনের প্রথমটিই (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের বচনটিই) মূল শ্লোকের অথবা আদর্শ-লিপির পদবীতে অধিকার পাইতে পারে; অপর দুইটি তাহার পাঠান্তর অথবা প্রতিলিপি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

শৈবধর্ম্ম এবং শাক্তধর্ম্ম পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা; অথচ দুই ভ্রাতার স্বভাব-চরিত্র এত বিভিন্ন যে, দোঁহার মধ্যে পৃথিবীর এ মুড়া ও মুড়া ব্যবধান। তার সাক্ষী—

কালী-মায়ের প্রিয় পানীয় হ'চ্চে সুরা; মহাদেবের প্রিয় পানীয় হ'চ্চে ভাঙ।

কালী মা রণোন্মত্তা এবং তাঁহার চক্ষু জবা-ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ; মহাদেব বোম্‌ভোলা এবং তাঁহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু। শাক্তধর্ম্ম উন্মত্ততা প্রিয়, শৈবধর্ম্ম নিশ্চেষ্টতা-প্রিয়। শাক্তধর্ম্ম রজোগুণ-প্রধান, শৈবধর্ম্ম তমোগুণ প্রধান।

পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্মের ন্যায় রজোগুণ-প্রধানও নহে, শৈবধর্ম্মের ন্যায় তমোগুণ-প্রধানও নহে;—বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে সত্ত্বগুণ-প্রধান। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ম্মলতম সাত্ত্বিক অংশ—অহিংসা দয়া প্রেম ভক্তি শুদ্ধাচার বিনয় নম্রতা—সমুদায়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সবই ভাল—কেবল একটি দোষ; সেটি হ'চ্চে ভক্তি হইতে জ্ঞানের বহিষ্করণ। জ্ঞানবর্জ্জিত ভক্তির আরেক নাম অন্ধ ভক্তি। তাহাকে অন্ধ ভক্তি না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে, যাহার চক্ষে বেদোপনিষদের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হরি, বৃন্দাবনের শ্যাম হরি এবং নবদ্বীপের গৌর হরি, একই অভিন্ন পুরুষ!

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক দিকে যেমন ঐক্য দেখিতে পাওয়া গেল, আর এক দিকে তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনেরই ধর্ম্ম; তাহাতে ভজনের কোনো প্রকার বিধি-ব্যবস্থা নাই। পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা যখন সাধন এবং ভজন দুয়ের মাঝামাঝি একটা ধাপে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধকেই সাধনের দেবতা করিয়া—আদি বুদ্ধ করিয়া—গড়িয়া লইলেন; আর, যোগী-তপস্বীরা তাঁহাকেই শিব করিয়া গড়িয়া লইলেন। বৈষ্ণবেরা ভজনের দেবতা চাহিলেন;—বৌদ্ধশাস্ত্র তাহা তাঁহাদিগকে দিতে পারিল না। বৈষ্ণবেরা দেখিলেন যে, বৌদ্ধেরা আদি বুদ্ধকে বজ্রধর নাম দিয়া ইন্দ্রের সিংহাসনে বসাইয়াছে; ইহা দেখিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপেন্দ্র নাম দিয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও বড় দেবতা করিয়া গড়িয়া লইলেন—ভজনের দেবতা করিয়া গড়িয়া লইলেন! বিষ্ণুর যতগুলি অবতার কল্পিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রধান—বিশেষতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশে! অবতারবাদের গোড়ার কথা আমার বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় তাহা এই;—

বুদ্ধদেবের তিরোধানের কিয়ৎ শতাব্দী পরে যখন বৌদ্ধেরা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণকে বিদূরিত করিয়া ইন্দ্রের পরিত্যক্ত সিংহাসন বজ্রধর আদি বুদ্ধকে দিয়া অধিকার করাইল, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন "সর্ব্বনাশ! এইরূপ করিয়া যদি বৌদ্ধেরা নিজ সম্প্রদায়ের অবতারগণকে দিয়া ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা-গণের পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করাইয়া লইতে থাকে, তাহা হইলে যাগ যজ্ঞের একটু আধটু গলি ঘুচি ফাঁক যাহা এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, তাহাও জন্মের মতো অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে!" এই সময়ে তাই পুরাবৃত্ত এবং জনশ্রুতির বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যে বুদ্ধের যশোভানুকে রাহুগ্রস্ত করিতে পারে এরূপ অসামান্য প্রভাবশালী মহাপুরুষদিগের খোঁজ পড়িল। ব্রাহ্মণেরা ইংরাজি প্রবাদানুযায়ী এক বাণে দুই পক্ষী বিদ্ধ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন; সে দুই পক্ষী হ'চ্চে (১) দ্যুদেবগণের পরিত্যক্ত সিংহাসনে অবতার প্রতিষ্ঠা এবং (২) ভূদেবগণের পূর্ব্বতন মহিমার মৃত শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এইরূপ, এক উদ্যমে দুই কার্য্য সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা খুব একটি পাকা চাল্ চালিলেন। করিলেন কি? না পূর্ব্বতন কালে যে তিন অসাধারণ যশস্বী পুরুষ ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ ছিলেন—বাছিয়া বাছিয়া সেই তিন মহাপুরুষকেই অবতারের পদবীতে সমুত্থাপিত করিলেন। সে তিন মহাপুরুষ আর কেহ ন'ন—ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা পরশুরাম, ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিস্তারকর্ত্তা রাক্ষসনিধনকারী রামচন্দ্র, এবং ব্রাহ্মণাধিপত্যের মুখোজ্জ্বলকর্ত্তা ভৃগুপদ-চিহ্ন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ! আর, ঐ তিন মনুষ্যাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবকাল আলোচ্যমান সময়ের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব-মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রমে লোকের মন অধিকার করিয়া আসিতেছে।

পুরাণের মতানুসারে মহাদেবের মাথা হইতে যেমন ভাগীরথী উথলিয়া উঠিতেছে, তেমনি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধদিগের মাথা হইতে অবতারবাদ সর্ব্বপ্রথমে উথলিয়া উঠিয়াছিল; আর ভগীরথ যেমন ভাগীরথীকে তাঁহার গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইয়া আপনার অভিপ্রেত পথে চালাইয়া দিলেন, পুরাণকর্ত্তারা তেমনি অবতার-বাদের প্রবাহ বৌদ্ধধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রাজ্যাভ্যন্তরে চালাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র শৌর্য্যবীর্য্য পিতৃভক্তি ঋষিভক্তি এবং সত্য-পরায়ণতার অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন, আর, শ্রীকৃষ্ণ লোকহিতৈষিতা, বন্ধু-প্রীতি, বুদ্ধি-চাতুর্য্য, এবং নীতি-কৌশলের অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন—ইহাই রামায়ণ মহাভারতের মুখ্য-মন্তব্য কথা; তা বই, তাঁহারা যে ঈশ্বরের অবতার ছিলেন—রামায়ণ মহাভারতের মুখ্য অবয়বের মধ্যে তাহার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ কোনো স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ছবে ভূমিকা এবং আশ পাশের দুই একটি আখ্যায়িকাতে, আর, ধ্যান ভানিতে শিবের গীত রকমের গোটাকত খাপছাড়া শ্লোকে, অবতার-বাদের ছিটা ফোঁটা একটু আধটু যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রক্ষিপ্তের কোটায় স্থান পাইবারই যোগ্য। দেখিতে দেখিতে পুঁথি বাড়িয়া উঠিল মন্দ না! ইহার উপরে ইতিহাস চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া আর অধিক পুঁথি বাড়ানো আমি কিছুতেই শ্রেয় বিবেচনা করি না—নহিলে আমি দেখাইতে পারিতাম যে, রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিশিষ্টরূপ অবতার করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পরবর্ত্তী কালের উপপুরাণ-কর্ত্তাদিগের বৌদ্ধ দমনে আগ্রহাতিশয্যের, এবং তদপেক্ষা আরো আধুনিক বাঙ্গালি এবং হিন্দুস্থানী গ্রন্থকারদিগের অসঙ্গত ভক্তির অনিবার্য্য বেগের, অবশ্যম্ভাবী ফল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রাদুর্ভাব-কালে দেবপ্রসাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মপ্রভাবের উপরে অতিমাত্র ঝোঁক দেওয়া হইল। কিছুকাল পরে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। মনুষ্যের মহাপৈতৃক সংস্কার যে, ঈশ্বরদত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহার উপরে লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইল, আর, সেই সঙ্গে মনুষ্যের হস্তবিরচিত এবং মনঃকল্পিত কারীকরি'র প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির বেগাতিশয্য হইল। ব্রহ্মাবর্ত্তের আদিম ঋষিরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরমাত্মার মহিমাকে আদর্শ করিয়াছিলেন; তাহার পরে সেই পরিষ্কার আদর্শের উপরে কারীকরীর উপর কারিকরী চলিতে থাকিল।

এক একটি ক্ষুদ্র তারকা শত কোটি পৃথিবী অপেক্ষাও বড়—এমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি বিনা রজ্জুতে শূন্যের

উপরে দীপমালা করিয়া লট্‌কাইয়া দিয়াছেন; যিনি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থ আবির্ভূত করিতেছেন; যিনি মাতৃগর্ভস্থিত জড়পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, প্রাণের অভ্যন্তরে মন নিঃশ্বসিত করিতেছেন, মনের অভ্যন্তরে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মৌদার্য্য-সমন্বিত আত্মা উদ্দীপন করিতেছেন; তাঁহার অদ্ভুত কৌশল এবং মহীয়সী শক্তির উপরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ধারণ করা প্রভৃতি ভেল্‌কি বাজি আরোপ করিলে কি তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্য বাড়ানো হয়? যিনি বিনা চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দেখিতেছেন—বিনা অবলম্বনে অসীম আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে ত্রিনয়নমূর্ত্তি করিয়া বৃষের উপর বসাইলে লোকের কি তাহাতে ভক্তি আকৃষ্ট হয়? ওরূপ অসঙ্গত নকল দেখিলে লোকের মনে প্রথম প্রথম ভয় ও বিস্ময় আবির্ভূত হয়, আর, ক্রমে ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে হাস্যরসের আবির্ভাবে ভক্তির জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা তাঁহাদের প্রাণের উপাস্য দেবতার উপরে ওরূপ কারিকরী খেলিতে যা'ন নাই। তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে, জলে স্থলে অনলে অনিলে, পরমেশ্বরের মহতী শক্তি এবং চিত্ত-চমৎকারী মহিমা যাহা চক্ষের সম্মুখে এবং আত্মার হিরণ্ময় কোষে বিরাজমান দেখিতেন, তাহারই দ্বার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন; তাঁহারা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, আত্মাতে এবং সূর্য্যমণ্ডলে, অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই পরমাত্মাকে দেদীপ্যমান দেখিয়া গায়ত্রী ধ্যান করিতেন। তাঁহাদের সন্তান হইয়া আমরা কি গায়ত্রী ছাড়িয়া "রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং" ধ্যান করিব? মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র কি বলিতেছেন—শ্রবণ করুন ঃ—

To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper light
To seek the beauteous eye of heaven to garnisn
Is wasteful and ridsculous excess.

কাঞ্চনে সোণালি কাজ শ্বেতপদ্মে চুনকাম করা,
গন্ধ ছিটাইয়া দেওয়া বিকসিত গন্ধরাজ ফুলে,
হিমশিলা পেশল করিতে যাওয়া মাজিয়া ঘসিয়া,
ইন্দ্র ধনুকের গায়ে নূতন রঞ্জন বিলেপন,
অথবা সুন্দর আঁখি দ্যুলোকের, নব দিবাকর,
মসালের আলো দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস,
অপব্যয়-সার হেন অত্যাচার উপহাসাস্পদ।

তেমনি, বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশিত আত্মার অন্তরতম আত্মাতে, পরমাত্মাতে, রজতগিরিসম শরীর এবং চারুচন্দ্রবিভূষিত ললাট আরোপ করা নিতান্তই উপহাসাস্পদ; ইংরাজীতে যাহাকে বলে Caricature তাহারও অধম!

ক্রমশঃ।

মোক্ষমুলারের পত্র।

সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উভয়েই বাইবেলের বিশেষ অনুরাগী। ফলতঃ তাঁহারা যে ঈশার শিষ্য এবং বাইবেল যে তাঁহাদের প্রামাণ্য, একথা তাঁহাদের উক্তি ও বক্তৃতার ভিতর হইতে বাহির করিয়া পণ্ডিত মোক্ষমুলার, প্রতাপ বাবু ও তাঁহার দলস্থ সকলকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনুরোধ করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রখানি প্রতাপ বাবুর নামীয় হইলেও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবরের ধারণা যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এতদিন ধরিয়া খৃষ্টধর্ম্মকে এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সময় উপস্থিত। মোক্ষমুলারের এরূপ অমূলক ধারণা হইবার কতকটা হেতুও আছে। কেশব বাবুর কথা * ছাড়িয়া দিলেও প্রতাপ বাবু সে দিন বলিয়াছেন আমরা প্রকৃত পক্ষে ঈশার শিষ্য হইলেও আপনাদিগকে খৃষ্টিয়ান বলিয়া পরিচয় দিতে চাহি না, কেন না ইহাতে খৃষ্ট-সমাজ যে অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত তাহার উপর আর একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি হইবে। † আমরা প্রতাপ বাবুর সঙ্কোচ ভাবের প্রতিপোষক যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না। সম্প্রদায়-বৃদ্ধি-ভয় অপেক্ষা সত্যের আকর্ষণই যে প্রবলতর, ইহা বোধ হয় প্রতাপ বাবু অস্বীকার করিবেন না। মোক্ষমুলার প্রতাপ বাবুকে খৃষ্টীয় কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে না বলিয়া দেশীয় আকারে দীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং স্বাধীন ভাবে যাজকমণ্ডলী গঠন করিয়া প্রকাশ্যভাবে দলবল সহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে পরামর্শ দিয়াছেন! প্রতাপ বাবুর মনোগত ভাব কি জানি না। আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন কালেই বাইবেল শাস্ত্র ঈশা বা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর অযথা নির্ভর স্থাপন করেন নাই, অধিকন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে খৃষ্ট-বিভীষিকা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে প্রতাপ বাবুর অযথা উক্তি এবং মোক্ষমুলারের অন্যায় ধারণা সম্বন্ধে প্রতিবাদ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে Indian Messenger এ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে সর্ব্ববিধ জটিলতা এবং সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধিতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

* Prof. Max-Muller writes "Kasbub Chundra Sen in intimate conversation told me that to all intents and purposes he was a disciple of Christ."

† Disciples of Christ we certainly are, but we would not, call ourselves Chistians because we decline to add another petty sect to the innumerable petty sects which Christians have split themselves into.

প্রেরিত।

গত ২ আশ্বিন তারিখে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের কটক জেলার অন্তর্গত তালুক পাণ্ডুয়ার শুভ পুণ্যাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরের ন্যায় শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে কাছারী বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিবার জন্য বিস্তর লোক সমাগত হইয়াছিল।

এখানকার পুণ্যাহ অতি সমারোহ ব্যাপার। এই উপলক্ষে সমস্ত দিন ধরিয়া নানা প্রকার আনন্দ ও উৎসব হইয়াছিল। কাছারী বাড়ী নানা প্রকার পল্লবে ও পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির পর উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হয়। দর্শকমণ্ডলী সভাস্থলে স্থির ভাবে উপবেশন করত আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিল। উপাসনার পর কৃষকশ্রেণীর লোকদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য সরল উৎকল ভাষায় যে প্রার্থনা ও উপদেশ হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম প্রেরণ করিলাম।

অদ্য নব বর্ষের দিনে অদ্য শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র নাম এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইলাম। তিনি আমাদের পিতা, পাতা, এবং সর্ব্বসুখদাতা। তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। তিনি শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ অদ্বিতীয়। যাঁহার আদেশে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি জ্যোতি প্রদান করিতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে তৃষিত ধরা বৃষ্টি লাভ করিয়া শীতল হইতেছে, বৃক্ষ সকল বর্দ্ধিত ও ফল ফুলে শোভিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, যাঁহার ইচ্ছাতে সমস্ত জগৎ সংসার চলিতেছে, যাঁহার ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমান হইতেছে, যিনি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া নানা প্রকার অর্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন, ধন-ধান্যে ফল-ফুলে ধরিত্রীকে শোভাময়ী করিয়াছেন, আমাদের রোগ শান্তির জন্য যিনি নানা প্রকার ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অন্ন দিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের সৎকামনা সকল নিয়ত পূর্ণ করিতেছেন, যিনি অমৃত বারি সিঞ্চন দ্বারা আমাদের সকলের আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন, তাঁহার অপার স্নেহ ও করুণা স্মরণ করিয়া, আইস আজ আমরা এই শুভ দিনে ও শুভক্ষণে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া, তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করি। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া শত কণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করি। এই শুভ কার্য্যের প্রথমে আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম, সুতরাং সেই মঙ্গলময়ের কল্যাণে আমরা বর্ত্তমান বৎসর সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিতে পারিব; জরা মরণ, ব্যাধিভয়, বিপত্তি বিষাদ, এবং শোক দুঃখে আর আমরা বিচলিত হইব না।

হে প্রজাপতি! তুমি প্রজাগণের মঙ্গলকর, তুমি দয়া কর, তোমার আদেশে মেঘ যথাকালে বারি বর্ষণ, সূর্য্য উপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপদান করুক, ধরিত্রী শস্যশালিনী, গাভী সকল দুগ্ধবতী, প্রজা সকল নীরোগ হউক। তাহাদের ভাণ্ডার ধনে ধান্যে পূর্ণ হউক। এবং এই দীন হীন মলিন লোকদিগের ধর্ম্মে মতি দাও। হে পরমাত্মন্! তুমি দয়া করিয়া, প্রচুর অমৃতবারি বর্ষণ করত ইহাদিগের শুষ্ক-হৃদয়-পদ্মকে বিকসিত কর।

হে সমাগত প্রজাবর্গ! তোমরা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলকে উন্নত কর। ধর্ম্মাচরণ কর। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত কর। গুরুজনকে ভক্তি কর। মিথ্যা কথা কহিও না। পরশ্রীতে কাতর হইও না। সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। বিষয় কোলাহল ও উৎসবের মধ্যে থাকিয়া, সেই চিরসখাকে ভুলিয়া থাকিও না। সম্যকরূপে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে পাপ তাপ, মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে। তোমরা যে সত্যনিষ্ঠ, দয়াবান ধার্ম্মিক রাজার আশ্রয়ে আছ, তিনি প্রতিনিয়ত পুত্রের ন্যায় তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তিনি তোমাদের হিতের জন্য যখন যাহা আবশ্যক তাহার বিধান করিতেছেন। তোমরা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সর্ব্ব প্রকারেই সুখ ও শান্তি ভোগ করিতেছ। তোমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি কর, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ দাও। তাহা হইলে ঈশ্বরও তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন, এবং তোমাদের সুখ শান্তি আরো বর্দ্ধিত হইবে।

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদিগকে অজ্ঞান ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা কর। পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। তোমার সৎস্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। সংসারের মোহ-অন্ধকার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া, তোমার দিকে লইয়া যাও। তুমি আমাদের সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি প্রেরণ কর। আমাদের সকল দুর্গতি ও দুর্দ্দশা দূর কর। তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃত পথে লইয়া যাও।

হে প্রজাপতি! তুমি প্রজাগণকে রক্ষা কর। আমাদের প্রজাবৎসল রাজার মঙ্গল কর। এখানকার কর্ম্মচারীগণকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কৃষ্ণাবতার।

১২শ প্রস্তাব।

হরিবংশের ১০২ অধ্যায়ে বলরামের ব্রজভূমিদর্শনের বর্ণনা নিতান্ত অল্প ও বিশেষ সংযত। উহাতে এই মাত্র আছে বলরাম গোপদিগের সহিত অনেক সুমধুর কথোপকথন করেন এবং বনমধ্যে যাইয়া গোপীগণের সহিত বিহারনিরত হয়েন এবং গোপগণ তাঁহার নিকট বারুণী মদ্য আনয়ন করিলে বান্ধবগণের সহিত তাহা পান করেন। হরিবংশের এই

অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীগণ কিছুমাত্র অভিমান বা প্রণয়-কোপ প্রকাশ করে নাই। বলরাম প্রতিনিবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ ব্রজবান্ধব ও গো সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহার সঙ্গে ভাগবতের কতকটা অনৈক্য আছে। সন্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষান্তে মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন গোপীরা মদ্গতপ্রাণা, বুঝি আমার বিরহে তাহাদের দেহান্ত হয়, তুমি শীঘ্র তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আইস। উদ্ধব ব্রজে গমন করিয়া (৪৬ অধ্যায়) গোপীগণকে আশ্বস্ত করিলেন, নন্দ ও যশোদাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অচিরাৎ আপনাদিগকে দেখিতে আসিবেন। এই কথা বলিয়া কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাবের কথার অবতারণায় বলিলেন—কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নি আছে কৃষ্ণ তদ্রূপ ভূতগণের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থিতি করেন, তিনি সকলের প্রতিই সমান, তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তাঁহার মাতা পিতা ভার্য্যা নাই, তাঁহার জন্ম নাই, তিনি সকলের মাতা পিতা আত্মা ও সুহৃদ ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি যাহা কিছু বলিলেন তাহা যে নিরবচ্ছিন্ন উপনিষদ বাক্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ভাগবতের ঐ ৪৭ অধ্যায়ে গোপীদিগের বিলাপে স্থানে স্থানে নিরবচ্ছিন্ন অশ্রাব্য ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অধ্যায়ের শেষে উদ্ধব গোপীদিগের কাতরোক্তি শ্রবণে বলিতেছেন এই সকল কামিনী বনচরী ব্যভিচারদোষে দূষিতা, ইহারাই বা কোথায়, আর কৃষ্ণ-বিরহে জাত পরম প্রেমই বা

কোথা! অজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ভজনা করে, তথাপি ঈশ্বর সাক্ষাৎ তাহাকে কল্যাণ দান করেন; না জানিয়া অমৃত ভক্ষণ করিলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। (এইখানে উপনিষদের সহিত আবার বিরোধ) মূলে এই আছে,

কেমা স্ত্রিয়ো বনচরী র্বিভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে কচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।

নষ্টীশ্বরো তু ভজতো বিদুষোঽপি সাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ। ৫২ শ্লোক।

তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে ভাগবৎকার গোপীগণকে ব্যভিচার-দুষ্টা খাড়া করিতে চাহেন এবং উপপতিভাবে সেবা করিলেও মুক্তি আছে বুঝাইতে চাহেন। কিন্তু এভাব হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের বিরোধী।

ভাগবৎকারের লেখনী-চাঞ্চল্য শ্রীকৃষ্ণকে আবার রূপযৌবনসম্পন্না কুব্জার গৃহে লইয়া গেল। সেখানে যাহা ঘটিল তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। ভাগবৎ ধর্ম্মগ্রন্থের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও স্থানে স্থানে এরূপ অশ্রাব্য আদিরসসংঘটিত ব্যাপারের আলোচনায় কেন যে লিপ্ত তাহা তিনিই জানেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ ৪৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণের আদেশে অক্রূর পিতৃহারা পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনয়নার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ জানিবার জন্য হস্তিনাপুরে কয়েক মাস অবস্থিতি করিলেন, বালক-পাণ্ডবদিগের বিনাশ-বাসনায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে সমস্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন তাহারও পরিচয় পাইলেন এবং পাণ্ডবদিগের গুণগ্রাম অবগত হইতে লাগিলেন। অক্রূরকে দেখিয়া কুন্তী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রকে রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরাগী করিবার চেষ্টা পাইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। ভাগবতকার পাণ্ডবদিগের পরিচয় দিয়া এইখানে কৃষ্ণের সহিত সামান্য যোগ রক্ষা করিতে চাহেন কিন্তু হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে এখানে কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে কৃষ্ণ বাস্তবিকই পাণ্ডবসখা। তিনি পাণ্ডবদিগের সুখে দুঃখে সকল সময়েই যে তাঁহাদের নিতান্তই অনুকূল, সে ভাব হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতে ততটা পরিস্ফুট নহে। উল্লিখিত তিন গ্রন্থ এতৎসম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠকগণ আমাদের এ উক্তির সার্থকতা পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে হয় এবং পাঠকগণও অবশ্যই আমাদের সহিত একমত হইবেন যে হরিবংশাদি ঠিক ঐতিহাসিক ভাবে লিখিত হয় নাই। ঐতিহাসিক ভাবে লিখিত হইলে অন্ততঃ পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই স্থূল কথাটি ভাগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণে বিশেষ ভাবে স্থান পাইত। বিষ্ণুপুরাণ কৃষ্ণে অংশাবতারত্ব আরোপ করিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, ভাগবৎ ভক্তি-কথা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণের পূর্ণাবতারত্ব খাড়া করিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর। এরূপও হইতে পারে মহাভারত হইতে কৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে যথাযথ ঐতিহাসিক অংশ লইলে পাছে তাঁহার অবতারত্ব অমানুষিকত্ব খাড়া করিবার পক্ষে অন্তরায়ও জন্মে, একারণে পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ পূতনা কালীয় এবং বিবিধ দৈত্য বিনাশ-বিবরণ দিয়া তাঁহার বাল্য জীবনী গঠন করিলেন, কিশোর

দশায় গোপীগণকে আনিয়া তাঁহার জীবনের অপর অংশ চিত্রিত করিলেন, মধ্য-বয়স যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্রে সজ্জিত করিলেন।

বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ অসামান্য বীর্য্যের পরিচয় দিলেও যৌবনে জরাসন্ধের সহিত সংগ্রামে কালযবনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে তৎবিষয়ে কুণ্ঠিত দেখি। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়েই মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন, কালযবনকে অজেয় দেখিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইয়া মুচুকুন্দের দ্বারা কৌশলে তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। কেন এরূপ ঘটিল তাহা ভাবিবার বিষয় বলিতে হইবে।

বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রুক্মিণী নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা এবং রুক্মি নামে এক পুত্র ছিল। ভীষ্মক জরাসন্ধের আদেশে নিজ কন্যাকে শিশুপালহস্তে সমর্পণ করিতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে সংবাদ পাইয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেকানেক ভূপালের সমক্ষে রুক্মিণীকে হরণ করিলেন। সমাগত রাজগণের একত্রীভূত বীর্য্য কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিতে পারিল না। বিষ্ণুপুরাণের ২৬ অধ্যায়ে আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষস বিধান অনুসারে রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন নামে এক পুত্র জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ আর কয়েকটি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ সাতটি প্রধানা মহিষীর নাম কালিন্দী, মিত্রবিন্দা সত্যা, জাম্ববতী, রোহিণী, লক্ষণা, সত্যভামা। এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র অপর মহিষী ছিল। মূলে আছে

ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ।

বিষ্ণুপুরাণ। ৫ অংশ। ৭৮ অ। ৫ শ্লোক।

হরিবংশের বর্ণনার সহিত বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নাই। ভাগবতকার বোধ হয় রাক্ষস-মতে বিবাহ সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই, তাই তিনি কল্পনার সাহায্য লইয়া নিজে কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপও হইতে পারে ভাগবত রচনার সময় রাক্ষস-বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি দশম স্কন্ধের ৫২ অধ্যায়ে উল্লেখ রাখিয়াছেন, যে রুক্মিণী জনৈক ব্রাহ্মণহস্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেমপত্রিকা প্রেরণ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ পত্রে রুক্মিণীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রুক্মিণী-হরণ করিয়া আনেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও বঙ্কিম বাবু এখানে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ-পুরুষত্ব বজায় রাখিবার জন্য নিজ পুস্তকে একটু অধিক আয়াস পাইয়াছেন। আমরা অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের আদর্শত্ব রাখিবার জন্য ততটা লালায়িত নহি। বিশেষতঃ সকল স্থানে তাঁহার যুক্তির সহিত আমাদের মিলে না। তবে আমাদের মনে হয় অনুপম সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী হরণে যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল এমন নহে, জরাসন্ধাদি সকলে শিশুপালের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প বিফল করিয়া তাঁহাদের অবমাননা করাও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ছিল।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

আমাদের এবং সমস্ত বঙ্গদেশের পরম শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রীতিভাজন মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বিগত ২ আশ্বিন সোমবার তাঁহার প্রিয় বঙ্গভূমি অন্ধকার করিয়া—তাঁহার প্রাণের পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া এবং দেশবিদেশস্থ অগণ্য বন্ধুবর্গকে হাহুতাশের নিরাশায় আচ্ছন্ন করিয়া নিখিল জগতের জনকজননীর ক্রোড়ে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতধামে সমুত্থান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে আছে যে, "ঈশ্বরভক্তের হৃদয় কি মধুময়, কি কোমল; তাঁহার ধর্ম্মসাধন কি কঠোর" ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দুর্লভ; কিন্তু ঐ দিব্যধাম-প্রয়াত মহাত্মাতে আমরা তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন মন সার্থক করিয়াছি। তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি শীল সৌজন্য এবং লোকের মন-আকর্ষণের ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি উচ্চপদের রাজকর্ম্ম হাত বাড়াইলেই পাইতে পারিতেন; সাধারণ লোক সমাজে তিনি একজন প্রধান দলপতির সিংহাসন পাইতে পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তিনি যা'ন নাই; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকেই জীবনের সার করিয়াছিলেন। সংসার-সাগরে তাঁহার ক্ষুদ্র দেহতরী রোগে জর্জ্জরিত হইতেছে—শোকের তরঙ্গে অনবরত আহত হইতেছে—কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা বিকৃত হইতে দেখি নাই। যাহাকে তিনি পাইতেন তাহার প্রতিই তিনি সৌহার্দ্দপাশ বিস্তার করিতেন—শত্রুতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। যখনই আমরা তাঁহার নিকটে শীতল হইতে গিয়াছি তখন আমরা তাঁহার প্রসন্ন বদনে স্বর্গীয় হাস্য দেখিয়াছি—অথচ তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার চারিদিকে শোকের বায়ু বহিতেছে। তাঁহার রোগশোকাক্রান্ত মর্ত্ত্য শরীরের আড়াল হইতে কি যে এক অমূল্য স্বর্গীয় প্রেমময় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত তাহা সহস্র চেষ্টা করিলেও লেখনী দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। যিনি দুই মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সৎ সঙ্গের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন তিনি আজীবন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন—তাহা মুখে বলিয়া অন্যকে বুঝানো তাঁহার সাধ্যাতীত। অতএব নবপ্রয়াত মহাত্মার আশ্চর্য্য অমায়িক অকৃত্রিম হৃদয়ের গুণ সকল প্রকাশ করিয়া বলিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাঁহার ঘরাও ভাবের অগণন গুণ—প্রবীণ বাল্যতা সরলতা মাধুর্য্য শীলসৌজন্য প্রভৃতি অশেষ গুণ বর্ণনা করিতে যাওয়া লেখনীর কেবল পণ্ডশ্রমই সার। তাহাতে আমরা ক্ষান্ত হইয়া—তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই যাহা করিতে পারিত না, তাহাই এক্ষণে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে মনের ভার লাঘব করি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারে করুণাময় পরমেশ্বরের হস্ত জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সহসা আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম দিব্য ধীরে ধীরে জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে অনর্থক একটা তুমুল গোলমাল এবং বিবাদ বিসম্বাদ প্রবেশ করাইলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐরূপ গোলমাল বিবাদ বিসম্বাদ বর্ত্তমান কালের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমাদের এই ভারতবর্ষের উপরে ইংলণ্ডের প্রতাপ কার্য্য করিতেছে;—নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছে। বাহিরে কোনো গোলমাল নাই। বাহিরে যেমন গোলমাল নাই—ভিতরে তেমনি তুমুল গোলমাল চলিতেছে। এই গোলমালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঠিক্ ভাবটি প্রচারিত হওয়া সম্ভবপর নহে। গোলমালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের গোলমাল উত্থাপন করা আবশ্যক—দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের ধ্বনি নিনাদিত করা আবশ্যক। ব্রহ্মানন্দ যথোপযুক্ত সময়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়া স্বীয় অসামান্য প্রতিভা বলে সেই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা সেরূপ দক্ষতার সহিত সমাধা করিতে পারিত না। ব্রহ্মানন্দের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বর্ত্তমান কালের ঠিক উপযোগী। ব্রহ্মানন্দ যেমন কালোচিত তীব্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—নবপ্রয়াত মহাত্মা তেমনি দেশোচিত মধুরভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের প্রধান অস্ত্র কর্ম্মোদ্যম; নব-তিরোহিত মহাত্মার প্রধান অস্ত্র হৃদয়ের মাধুর্য্য এবং প্রেম। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বদেশের নামে গলিয়া যাইতেন; একাল এবং সেকাল নামক পুস্তক যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রাণের উচ্ছ্বাস। তাঁহার এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহা আমাদের দেশের ঠিক উপযোগী। আমাদের জীবিতাবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটি প্রধান স্তম্ভ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্তর্ধান করিলেন—উভয়েই পরম ভাগ্যবান্। ঈশ্বরের কার্য্যের আদি অন্ত কে বুঝিতে পারে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় এবং করুণাময় জগতের জননী এইটুকু যদি আমরা ভাল করিয়া প্রণিধান করিয়া বুঝি, তাহা হইলে আমাদের কিছুই বুঝিতে বাকি থাকে না।

ওঁ

From

The Secretary. Arya Samaj.
Abbottabad.

To Maharishi Shriman Debendra nath Tagore

Sir,

I beg to state that in a general meeting of the members of Arya Samaj, Abbottabad, the sad news of death of your beloved and worthy grandson Babu Bolendra nath Tagore was given out. The members felt a great sorrow at such early and untimely death of such a useful gentleman. I, on their behalf, ezpress sorrow and deeply and sincerely sympathise with you on the loss of such a worthy member of the family.

May God grant Shanti to the departed soul.

I beg to remain, Sir,
Your most Obedient Servant.
Sd। Bakhshi Gokal Chand
Secretary, Arya Samaj, Abbottabad
Punjab.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৮১৲
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৭৫৸৬
সমষ্টি	...	১১৫৬৸৬
ব্যয়	...	৫৮৯৷৶৩
স্থিত	...	৫৬৭ ৶৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৬৭৶৩
	৫৬৭৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৬৬৸৶৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর	১০৲

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৪৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲

এককালীন দান।

রাজা রামমোহন রায় ইনিষ্টিটিউটের অন্তর্গত পিতৃদেব ও মাতৃদেব ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৸৶৯
	১৬৬৸৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৩৷৷০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঐ	৩৲
„ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর, ঐ	৩৲
„ বাবু মণিলাল মল্লিক, ঐ	৩৲
„ „ রামচন্দ্র সিং, ঐ	৩৲
„ „ বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
„ „ মহেন্দ্রনাথ বসু, ঐ	৩৲
„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত, পাণ্ডুয়া	৩৷৶০
„ „ যোগেশচন্দ্র সরকার, বর্দ্ধমান	৫৲
„ „ শ্যামলাল মিত্র, লক্ষ্ণৌ	৩৶০
„ „ গোবর্দ্ধন শীল, চন্দননগর	২৷৶০
„ সম্পাদক—ব্রাহ্মসমাজ, শান্তিপুর	৷৶০
	৩৩৷৷০

পুস্তকালয় ...	৭৲৩
যন্ত্রালয় ...	১৭২৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৷০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ...	২০০৲
সমষ্টি	৫৮১৲

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	২৮৫ ৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৷৲৩
পুস্তকালয় ...	১১৸৯
যন্ত্রালয় ...	২৬১৲
গচ্ছিত ...	১০৷৯
সমষ্টি	৫৮৯৷৷৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়াহ্নে ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইবে। ভক্ত সাধু সকল যথা সময়ে উৎসবক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ৩০এ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

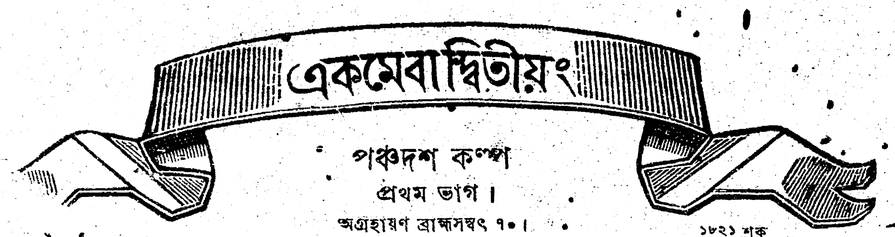

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्य वोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়		পৃষ্ঠা
দুঃখ দারিদ্র্য (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ী)	... ...	১২১
আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	১২৩
উদ্বোধন (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	... ...	১৩১
দীক্ষা (শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়)	... ...	১৩২

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৭৬। কলিগতাব্দ ৫০৭০। ১ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷৶০। ডাক মাশুল ৷৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্য প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চবিংশ কল্প
প্রথম ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

৬৫৬ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২১ শক। ২৩শে কার্ত্তিক বুধবার।

দুঃখ দারিদ্র্য।

এই বিশাল পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, ইহাতে ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ সকলই রহিয়াছে। মনুষ্য নিজেই কিন্তু আপনার দুঃখ আপনিই আনিয়াছে। দয়াময় পরমেশ্বর তাহাকে কৃপা করিয়া স্বাধীন করিলেন, আর সে যথেচ্ছাচার ও আলস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুঃখ তাপ আনয়ন করিল। পরমেশ্বর তাহার শরীর মন এমন ভাবে রচনা করিয়াছেন, যে তাহারা যথাযথ রূপে পরিচালিত হইলে সুখের আর সীমা থাকিত না। সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাই এই, যে মনুষ্য সৎপথ অবলম্বন করিয়া কার্য্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অপবিত্র ও অলস হইয়া এক দণ্ডও না থাকে। দেখ বদ্ধ স্রোতের জল কিছু দিন পরে পচিয়া উঠে। অব্যবহৃত চাবী তিন দিনে মরিচা-যুক্ত হয়। যে ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন আশ্চর্য্য জীবন দিয়াছেন, তিনি মনে করিলে কি তাহাকে অনায়াসলভ্য সুখ সামগ্রীতে পরিবৃত করিয়া রাখিতে পারিতেন না? আদৌ শ্রম করিতে হইত না, তিনি কি এমন ব্যবস্থা করিলে করিতে পারিতেন না? পশুদিগের ন্যায় মনের যন্ত্র একবারে কি বাঁধিয়া দিতে পারিতেন না? কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। যন্ত্রের ন্যায় তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন নাই—স্বাধীন করিয়াই তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছাই এই যে সে আপন কর্ম্ম-জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করুক। তথাপি তিনি তাহাকে একবারে অসহায় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেন নাই, তিনি সাহায্যের নিমিত্ত সতত তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন।

পৃথিবীতে আমরা ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যেই সংস্থাপিত রহিয়াছি। মন্দকে পরিত্যাগ বা পরাজয় করিতে হইবে, ভালর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে উপার্জ্জন ও ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং মনুষ্য যেরূপ অনায়াসলভ্য সুখোপকরণে পরিবৃত হইয়া থাকিতে চায়, ঈশ্বর, তাহাকে সে রূপে সৃষ্টি না করিয়া—যাহাতে সে কর্ম্মঠ ও চিন্তাশীল হয়, এই-

রূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জানেন এই রূপেই মনুষ্যের উন্নতি হইবে।

যে সকল দুঃখ দুর্ভাগ্য দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, বিচার করিলে তাহাদিগকে তিন শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বোধ হইবে। প্রাকৃতিক শারীরিক ও মানসিক। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার উপর আমাদের হাত নাই। আর অসাবধানতা হইতে মানসিক ও শারীরিক রোগ জন্মে। অসাবধানতা হইতেই নানা বিপদ উপস্থিত হয়। ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক দৈব দুর্ঘটনা-জনিত বিপদ ব্যতীত—সকল দুর্ভাগ্যই মন হইতে উৎপন্ন হয়। দুর্ভাগ্যের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদের পূর্ব্ব প্রকৃতি ও পূর্ব্ব জীবনের কার্য্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা জানিতে পারিব যে মানসোৎপন্ন অজ্ঞান ও ভ্রম হইতেই বিপদের সৃষ্টি। দুঃখের বিষয় এই যে, অজ্ঞান ও ভ্রমের স্রোত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সে সকল দুঃখ দুর্ভাগ্যও আমাদিগকে ভুগিতে হয়। রুগ্ন পিতা মাতার সন্তান রুগ্ন বই আর কি বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় হইবে? তাহাদের শরীরগর্ভ যান্ত্রিক রোগ পুত্রে কি বর্ত্তিবে না? তাহাদের পাপাসক্ত মতি গতি কি পুত্রের মনে অঙ্কিত হইবে না? পুত্র ত আর আকাশ হইতে পড়ে না। সেই জন্য বর্ত্তমান বংশীয়দিগের কর্ত্তব্য, ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের কল্যাণ কামনায় রুগ্ন দেহে দাম্পত্য সূত্রে যেন তাঁহারা আবদ্ধ না হন।

সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই, যাহাতে দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র থাকে। পবিত্র ভোগ দ্বারা সংযত হইয়া দেহ পবিত্র করিতে, সতর্কতা দ্বারা মনকে পাপস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে ও আত্মানুসন্ধান দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে।

দয়াময় পরমেশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীকে দুঃখের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইহাকে নন্দন-কানন করিলেন; আর আমরা ইহাকে অরণ্যে, শ্মশানে পরিণত করিতেছি। মনুষ্যই তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইহাকে দুঃখের আধার করিয়াছে। তাহাদেরই পাশব অত্যাচারে তাহাদের সুখ শান্তি নষ্ট হইয়াছে। সংযত হইয়া থাকিলে মনুষ্য অনেকটা সুখ-শান্তিতে থাকিতে পারে এক্ষণে তাহার দৃষ্টান্ত বিবৃত হইতেছে।

কোয়েকার্স অথবা বন্ধুসমিতি বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, আশ্চর্য্য এই যে তাহাদের মধ্যে দারিদ্র্য-দুঃখ দেখা যায় না। তাহাদের কথা কহিবার ও পোষাক পরিচ্ছদের একটু বিশেষ প্রণালী আছে, তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। কিন্তু তাহারা কোন এক বিশেষ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন প্রবৃত্তি ও ঋপু দমন করে। তাহারা বাসনা ও অত্যুগ্র মনের আবেগ সকল দমনে রাখে। এই দৃঢ় ভিত্তির উপর তাহাদের ধর্ম্মনীতি সংস্থাপিত। তাহাদের ধর্ম্মনীতি মুখে ও মতে মাত্র পর্য্যবসান হয় না, অভ্যাসের বলে তাহারা ঐরূপ ধর্ম্মনীতিকে কার্য্যে পরিণত করে। কার্য্য ও চিন্তায় তাহারা সতত সাবধান। ইহার ফলও আশ্চর্য্য! এই দলের সহস্র সহস্র লোক গ্রেটবৃটন ও য়ুনাইটেড ষ্টেটে বাস করে। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও গল্লিতে গল্লিতে ভিক্ষা করিতে বা প্রমত্ত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না। তাহাদের মধ্যে

কেহ কখন দুষ্ক্রিয়া জন্য আদালতে অভিযুক্ত হয় না। এই বন্ধুসমিতির লোকেরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বিবিধ বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। তাহাদের মধ্যে বণিক, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার সূত্রধর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক আছে। তাহারাও আমাদের মত নানা পাপাচার ও প্রলোভনের মধ্যে বাস করে। তথাপি, আত্মসম্মান ও সাবধানতার বশীভূত হইয়া তাহারা পাপাচার ও প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহাতেই প্রমাণ হইল, রাজদণ্ডের ভয়ে ভীত না হইয়াও সমাজের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে, যাহারা কেবল মাত্র ধর্ম্মনীতির বশীভূত হইয়া পাপ ও দারিদ্র্য দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। পরিশেষে বলিতেছি, মৃত্যুকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ মনে করিয়া থাকি, কিন্তু যদি অকাল-মৃত্যু না ঘটে তাহা হইলে, ইহাকেও কোন মতেই বিপদ বলা যাইতে পারে না। সকল মনুষ্য যদি ঈশ্বরের নিয়ম ধরিয়া চলিত, তাহা হইলে এখনকার ন্যায় এত পরিমাণে অকালমৃত্যু ঘটিত না।

দৈব বা প্রাকৃতিক বিপদ যে পৃথিবীতে নাই তাহা নহে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হস্ত নাই। তজ্জন্য ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত। এ শরীর মন আত্মা তাঁরই কৃপার দান। ইহা আমাদের নিজস্ব ধন নহে।

তাঁহার যেমন ইচ্ছা হয়, তেমনিই তিনি আমাদিগকে রাখিবেন। সুখ দুঃখ তাঁর হস্তে। আমাদের উচিত তাঁর আদেশ মত কার্য্য করা। তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে যে নষ্ট করিবেন না ইহা সিদ্ধবাক্য। ইহ লোকের প্রতি সম্পূর্ণ আবদ্ধ না হইয়া আমরা যেন পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। সেই স্থানেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে।

কোথা দুর্ব্বলের বল অনাথ-শরণ! তুমি শরীর মনে বল দেও। তোমার সাহায্য ভিন্ন আমরা নিজ নিজ বলে কিছুই করিতে পারি না।

আমাদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নাই, তুমিই আমাদের চক্ষু। মোহ-কোলাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক কর্ণ বধির। তোমার হিতকর উপদেশ আমরা শুনিতে পাই না। তুমি আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ও আধ্যাত্মিক কর্ণ খুলিয়া দাও যাহাতে তোমাকে দেখিয়া; তোমার কথা শুনিয়া পরম শান্তিলাভ করি, এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত।

আমি বাল্যকালে অনেক শুদ্ধাচারী পৌত্তলিক দেখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই নৈকষ-শ্রেণীর খাঁটি পৌত্তলিক ছিলেন। সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমীর দিন তাঁহারা সম্মুখস্থিত প্রতিমাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং মা মা করিয়া তাঁহার চরণতলে সটান লম্বমান হইয়া পড়িয়া ধূলির সহিত মিশাইয়া যাইতেন। বিজয়া-দশমীর দিন তাঁহারা আপনাদের চক্ষের ঘনীভূত বাষ্পজলের মধ্যদিয়া মায়ের দীর্ঘ দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং শ্রীমুখখানি কাঁদো কাঁদো দেখিতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার বারিসিঞ্চনে নূতন ধরণের এক প্রকার পৌত্তলিকতা—কাষ্ঠ পৌত্তলিকতা—কোনও

কোনও উচ্চ ভূমিতে গজাইয়া উঠিতেছে। সম্মুখস্থিত প্রতিমার দেবীত্বের প্রতি ইঁহাদের ষোলো আনার জায়গায় এক আনা বিশ্বাসও নাই। ইঁহারা বিলক্ষণই জানেন যে, বরং অন্ধকে নেত্রবান করা যাইতে পারে, তথাপি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রের এক ফুঁয়ে নির্জ্জীবকে সজীব করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাদের এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, প্রতিমা-খানা দেবতাও না কিছুই না, উহা ঐশী শক্তির বা মূল প্রকৃতির রূপক মাত্র। অথচ, সম্মুখের প্রতিমা খানি যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠার এক ফুঁয়ে সত্য সত্যই জাগ্রত জীবন্ত দেবী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা যেন আর তাহা নাই—তাহা যেন তিনি—এই ঢঙের একটা কৃত্রিম বিশ্বাসের স্তোক-বাক্যে তাঁহারা কথঞ্চিৎ প্রকারে মনকে প্রবোধ দিয়া মূর্ত্তি-পূজার নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু নাট্যাভিনয়েরও সময় আছে—দেবারাধনারও সময় আছে। নাট্যাভিনয় সকের সামগ্রী—দেবারাধনা ভক্তির সামগ্রী। নাট্যাভিনয় এবং দেবারাধনা দুইই এক সঙ্গে চলিতে পারে না। মনে কর দুই জন যাত্রী পর পারে যাইবার জন্য নৌকা আরোহণ করিলেন—একজন খাঁটি পৌত্তলিক, আরেক জন সখের পৌত্তলিক; আর, মনে কর যেন মাঝ গঙ্গায় যাইতে না যাইতে এমনি এক ভয়ঙ্কর তুফান উঠিল যে, নৌকার নিপুণ মাঝি মাল্লাদিগের মধ্যেও ত্রাহি ত্রাহি শব্দ পড়িয়া গেল। খাঁটি পৌত্তলিক অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "মা কালী! ক্রোড়ের সন্তানকে চরণে স্থান দান কর!" কিন্তু সকের পৌত্তলিকের মার্জ্জিত জ্ঞানে মা কালী একটা রূপক মাত্র—সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির রূপক। সে রূপক নাট্যাভিনয়-কালে অথবা কাব্য-রসের আস্বাদন-কালে খুবই কাজে লাগে, কিন্তু অন্তিম কালে তাহার মূল্য এক কানা কড়িও নহে। অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া সকের পৌত্তলিক নাট্যাভিনয় ছাড়িয়া অকৃত্রিম ভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার নিতান্ত অনভ্যস্ত বলিয়া তিনি তাঁহার সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় যাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, জগজ্জননী কৃপাণ-খর্পর-ধারিণী নৃমুণ্ড-মালিনী চামুণ্ডা দেবী, তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গেলেই তাঁহারা ব্রহ্মের উপাসক হ'ন; কিন্তু সেই নৃমুণ্ডমালিনী দেবীকে যাঁহারা রূপক মাত্র জানিয়াও কৃত্রিম ভাবে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের রোগ ভ্রম নহে—তাঁহাদের রোগ কৃত্রিমতা। ইঁহাদের এ রোগের প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে; তাহা এইঃ—অধম শ্রেণীর উকিলেরা যেরূপ মোকদ্দমা সাজায়, আর, সাক্ষীদিগকে যেরূপ গড়িয়া-পিটিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপ সাজানো এবং গড়িয়া-পিটিয়া প্রস্তুত করা সত্য হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে প্রকৃত সত্যের পথে পরিচালনা করা হো'ক্। আমাদের আত্মা যেমন শরীর-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ—ঈশ্বরকে সেইরূপ সম্মুখস্থিত প্রতিমার মৃণ্ময় শরীরে অবরুদ্ধ মনে করা একে তো নিতান্তই কৃত্রিম কাণ্ড, তাহাতে আবার তাহা নিতান্তই অনাবশ্যক। আমার নিজের শরীরে যখন আত্মা রহিয়াছে, আর সেই আত্মাতে যখন পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন সেখানে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমার কি এত গরজ পড়িয়াছে যে, প্রতিমাতে কৃত্রিমরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত দেবী-রূপে কল্পনা করিব? আমার রত্নাগারে যখন খাঁচা হীরার আঙটি রহিয়াছে, তখন আমার কি এত গরজ পড়িয়াছে যে, আমি একটা ঝুঁটা হীরার আঙটি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা অঙ্গুলীতে পরিধান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইব? একটা সত্য ঘটনা বলি শ্রবণ করুন:—বর্ষাকালে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর বৈটকখানার মজলিসে গান বাজনার কথা হইতেছে। বৈটকখানার এক কোন হইতে সম্মুখে সরিয়া বসিয়া এক জন সামান্য কর্ম্ম-চারির পুত্র বলিল যে, "আমি হারমোনিয়ম অভ্যাস করিতেছি।" গৃহকর্ত্তা বলিলেন "একটা হারমোনিয়মের মূল্য চার পাঁচ শ টাকার কম না—তুমি তাহা পাইলে কিরূপে?" বালকটি বলিল "আমি এক-প্রস্ত লম্বা কাগজে ঠিক্ হারমোনিয়মের দাঁতের মতো সাদা কালো ঘর কাটিয়া তাহার উপরে আঙুলের কর্তপ করিতেছি।" ইহা শুনিয়া গৃহকর্ত্তা সহাস্য বদনে তাহাকে বলিলেন "বেস্ হইয়াছে!—এক্ষণে যেরূপ বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘরে যাইবার সময় তোমার পাল্কি আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই, অতএব কাগজে একটা পাল্কি আঁকিয়া তোমার পৃষ্ঠে আটা দিয়া জুড়িয়া দিতেছি—তাহাতে ভর করিয়া তুমি দিব্য আরামে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরে পৌঁছিবে।" এ সকল কৃত্রিম কাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের প্রকৃত প্রণালী-পদ্ধতি কিরূপ তাহা যদি আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে জানিবেন যে, আমাদের দেশের মৌলিক শাস্ত্রে তাহা যেমন বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে এমন আর কোথাও না। বেদোপনিষদ শাস্ত্রে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের তিনটি বিহিত সোপান-পংক্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে তিনটি সোপানপংক্তি হ'চ্চে (১) শ্রবণ—যেমন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্য শ্রবণ; (২) মনন—যেমন ঐ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য ভাবনা; (৩) নিদিধ্যাসন—যেমন ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাতে চিত্তের পুনঃপুনঃ সন্নিবেশ। ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে,

"যতোযতোনিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং
ততস্ততোনিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ"

যেখানে যেখানে চঞ্চল মন প্রধাবিত হয়, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পরমাত্মাতেই তাহাকে সমাহিত করিবে। ভগবদ্গীতার এই কথা মানিতে হইলে, কোনো প্রকার মনঃকল্পিত প্রতিমূর্ত্তির দিকে যদি মন দৌড়ায় তবে তথা হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আনিয়া মনকে পরমাত্মাতে সমাহিত করাই বিধেয়। এ সকল মৌলিক শাস্ত্রের কথা-গুলি কেমন সরল—কেমন কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত! এই সকল খাঁটি সোণা, আর, উপপুরাণ এবং তন্ত্রের সোণালি রঙ করা তাঁবা, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কৃত্রিমতা-পথাবলম্বী সাধকদিগের এই যে একটি স্তোক-বাক্য যে, মূর্ত্তিপূজা আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনার সোপান—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশীয় ভ্রাতারা তো অনেক কাল ধরিয়া সে সোপান মাড়াইয়া উপরে উঠিতেছেন! এত দিনেও কি তাঁহারা গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হ'ন নাই? অবশ্যই হইয়াছেন—এই ভরসায় আমি তাঁহাদিগকে একটি সামান্য প্রবাদ স্মরণ করিতে অনুনয়-বিনয় করিতেছি; সে

প্রবাদ এই যে, শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।

আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন যাঁহারা আরেক রূপ কৃত্রিমতার ফাঁদে অজ্ঞাতসারে নিপতিত হ'ন। ইঁহারা চা'ন বেদান্ত-দর্শনের নির্ব্বাণ-মুক্তি; অথচ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়-বোধে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় যত্ন নিয়োগ করেন। পতঞ্জলি ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর-ভক্তি চিত্তনিরোধের একতম উপায় বলিয়া তাহা সাধকের পক্ষে শ্রেয়স্কর। বেদান্তদর্শনেও কথিত হইয়াছে যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছিবার একটি প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া তাহা অবলম্বনীয়। এ সম্বন্ধে গোটা দুই সাধাসীধা কথা আমার বক্তব্য আছে; তাহা এই;—

প্রথমতঃ অকৃত্রিম প্রীতি ভক্তি ব্যতিরেকে উপাসনা হইতে পারে না। কৃত্রিম বন্ধুতা বন্ধুতাই নহে—কৃত্রিম উপাসনা উপাসনাই নহে। দ্বিতীয়তঃ যিনি যাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত প্রীতি করেন, তিনি মুখ্য-রূপে তাঁহাকেই চা'ন। আদিম ঋষিরা তাই বলিয়াছেন

"স এষ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে এইরূপ মুখ্যরূপে চা'ন; তা বই—প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে কোনো প্রকার অভীষ্ট সাধনের উপায় করিয়া গড়িয়া তোলেন না। তৃতীয়তঃ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমঙ্গলালয়, প্রেমের আকর, এবং করুণার সাগর, এইরূপে তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই—অনির্ব্বচনীয় মহান্ আধ্যাত্মিক গুণ-সকল তাঁহাতে একাধারে পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিয়াই—সাধক তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়রূপে উপাসনা করেন। এইরূপ অপরিসীম সর্ব্বগুণান্বিত পরমাত্মার প্রতি ব্রহ্মোপাসকের অন্তর্দৃষ্টি, গভীর চিন্তা, এবং একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি যখন নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত নির্গুণ সত্তার প্রতি তাঁহার অন্তশ্চক্ষু কিরূপেই বা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে—কেনই বা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? আর, যদি প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে তাহাতে প্রমাণ হইবে যে, তাঁহার সে উপাসনা অকৃত্রিম উপাসনা নহে; যেহেতু লক্ষ্য রহিয়াছে, তাঁর, জ্ঞান-শূন্য প্রেমশূন্য ইচ্ছাশূন্য নির্গুণ সত্তার প্রতি, ভজিতেছেন তিনি জ্ঞানপূর্ণ প্রেমপূর্ণ উদ্যমপূর্ণ সগুণ ব্রহ্মকে। এইরূপ তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছেন—ইহারই নাম কৃত্রিমতা। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—

মনে কর আমার এক জন প্রিয় বন্ধু প্রশান্ত ধীর গম্ভীর এবং কর্ম্মিষ্ঠ। আমি কখনো বা তাঁহার ধীরতার প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করি, কখনো বা তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠতার প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করি, কখনো বা একই সময়ে তাঁহার ধীরতা এবং কর্ম্মিষ্ঠতা দুয়েরই প্রতি মনোনিবেশ করি। দুয়েরই প্রতি যখন একই সময়ে মনোনিবেশ করি, তখন কি দেখি তখন দেখি যে,

"মণিনা বলয়ং, বলয়েন মণির্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ॥"

মণিতে করিয়া হাতের বালা শোভা পাইতেছে, বালাতে করিয়া মণি শোভা পাইতেছে, বালা এবং মণি দুয়েতে করিয়া হস্ত শোভা পাইতেছে; জলের গুণে কমল শোভা পাইতেছে, কমলের গুণে জল শোভা পাইতেছে, আর, জল এবং কমল উভয়ের গুণে সরোবর শোভা পাইতেছে; ধীরতার গুণে কর্ম্মিষ্ঠতা শোভা পাইতেছে, কর্ম্মিষ্ঠতার গুণে ধীরতা শোভা পাইতেছে, আর, ধীরতা এবং কর্ম্মিষ্ঠতা উভয়ের গুণে আমার বন্ধু শোভা পাইতেছে। এ যেমন দেখিলাম, তেমনি ব্রহ্মোপাসক কখনো বা ঈশ্বরের অটল প্রশান্ত ভাবের প্রতি দৃষ্টি করেন, কখনো বা তাঁহার অপরিসীম প্রভাবশালী মহোদ্যমের প্রতি দৃষ্টি করেন, কখনো বা অপরিসীম মহোদ্যম এবং অটল শান্তি দুইই তাঁহাতে একাধারে দৃষ্টি করেন। তাহার পরে তিনি যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন দেখেন যে, তাঁহার আপনার উদ্যমের সীমা আছে; তাঁহার আপনার উদ্যম দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসন্ন হয় এবং তাহার কিয়ৎ ঘণ্টা পরেই সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিলীন হয়। তিনি আপনি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন হ'ন—পরমেশ্বর তখন অচেতন হ'ন না; তিনি আপনি যখন সুষুপ্তির মন্ত্রগুণে নির্গুণ হইয়া যা'ন—পরমেশ্বর তখন নির্গুণ হ'ন না; পরমেশ্বর তখন সেই প্রসুপ্ত জনের আপনার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রাণ মন শরীর পুনঃসংস্কৃত এবং নবীভূত করিয়া দে'ন। পুনশ্চ ব্রহ্মোপাসক দেখেন যে, তাঁহার আপনার প্রশান্তিরও সীমা আছে; দেখেন যে, তাঁহার আপনার সুষুপ্তির আরাম কিয়ৎ ঘণ্টা পরেই জাগ্রৎ কালের সগুণ অবস্থায় পরিসমাপ্ত হয়—উদ্যমের স্ফূর্ত্তিতে পরিসমাপ্ত হয়। যখন তিনি আপনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত সমস্ত হ'ন, তখন অন্তর্যামী পরমেশ্বর ব্যস্ত সমস্ত হ'ন না; তখন পরমেশ্বর সেই কর্ম্মকারী জীবের ভোগের জন্য, শিক্ষার জন্য, এবং উন্নতির জন্য অটল প্রশান্ত এবং ধীর ভাবে সমস্ত জগৎ নিয়মিত করেন। মনুষ্য নাকি অপূর্ণ, তাই সে সীমাবদ্ধ কর্ম্মোদ্যম হইতে সীমাবদ্ধ প্রশান্তিতে, এবং সীমাবদ্ধ প্রশান্তি হইতে সীমাবদ্ধ কর্ম্মোদ্যমে, পর্য্যায়ক্রমে পদনিক্ষেপ করে। কিন্তু সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মাতে সুষুপ্তির অটল প্রশান্তি এবং জাগ্রৎকালের প্রভূত কর্ম্মোদ্যম দুইই একাধারে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমাত্মার অপরিসীম মহোদ্যম সুগভীর শান্তিতে অটল এবং গম্ভীর; তাঁহার অটল শান্তি মহাপ্রভাবশালী উদ্যমের স্ফূর্ত্তিতে জাগ্রত এবং জীবন্ত। আমাদের আপনাদেরই অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয়; আমরাই সুষুপ্তিকালে নির্গুণ হই, জাগ্রৎকালে সগুণ হই। ঈশ্বরের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় না—ঈশ্বর নির্গুণ হইতে সগুণ বা সগুণ হইতে নির্গুণ হ'ন না—তিনি সর্ব্বকালেই পরিপূর্ণ; জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ—আনন্দে পরিপূর্ণ—শান্তিতে পরিপূর্ণ—উদ্যমে পরিপূর্ণ। অদ্বৈতবাদীরা সগুণ এবং নির্গুণের মধ্যে একটা সুবিশাল মায়া-প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করাইয়া, পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিতে এবং সৃষ্টি হইতে পরব্রহ্মে মনের যাতায়াতের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ করিয়া দে'ন। অদ্বৈতবাদীর মতে সবই ব্রহ্ম—অথচ অবিদ্যা হইতে অর্থাৎ ভ্রম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভ্রম শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না—হয় তোমার ভ্রম, নয় আমার ভ্রম, নয় আর কাহার ও ভ্রম। সবই যদি ব্রহ্ম—ভ্রম কাহার? ভ্রম

জীবের? কিন্তু ভ্রান্ত জীব তুমি কোথা হইতে পাইতেছ? সবই যে ব্রহ্ম! তুমি বলিতেছ—ভ্রান্ত জীব ভ্রমেরই একটা অঙ্গ। এটা তুমি দেখিতেছ না যে "ভ্রান্ত জীব ভ্রমের একটা অঙ্গ" এ কথা বলাও যা, আর, "মাথা মাথা-ব্যথার একটা অঙ্গ, এ কথা বলাও তা—একই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈত-বাদীর সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারে একেবারেই কপাট পড়িয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীর ন্যায় আমরা জগতকে মিথ্যা বলি না; আমরা বলি জগৎ ঈশ্বরের অপূর্ণ প্রকাশ। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার আপনাতেই রহিয়াছে—জগতের কুত্রাপি তাহা সম্ভবে না। তিনি আপনার অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা যথাপাত্রে যথানিয়মে যথাপরিমাণে যথোপযুক্ত রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশ অপাত্রে পড়িয়া ব্যর্থ না হয়—এই জন্য তিনি জীবাত্মাকে আপনার ভাবের ভাবুক করিয়া—আপনার ঐশ্বর্য্যের ভাগী এবং ভাণ্ডারী করিয়া—আপনার প্রেম-মাধুর্য্যের মর্ম্মজ্ঞ এবং রসজ্ঞ করিয়া ক্রমে ক্রমে গড়িয়া লইতেছেন। জীবাত্মার নিকটে তিনি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইলে জীবাত্মার পৃথক্ সত্তা বিলুপ্ত হইবে; তাহা যাহাতে না হয় এই উদ্দেশে তিনি সত্ত্বগুণাত্মক বুদ্ধি এবং আনন্দকে তমোগুণাত্মক জড়পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া দিয়াছেন; আবার জীবাত্মা জড়ে জড়ীভূত হইয়া না যায়, এই উদ্দেশে তিনি তাহার রজোগুণাত্মক অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা দ্বারা জড় জগতের আবরণ অপসারিত করিয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত পরিমাণে তাহার নিকটে আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বপ্রকাশ আনন্দ জ্যোতি প্রজ্ঞাপন করিতেছেন।

আমাদের দেশে এক্ষণে, একদিকে, সগুণ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার নানা উপাধি বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই সকল নানা উপাধিকে নানা দেব-দেবী রূপে সাজাইয়া তোলা হয়, আরেক দিকে পরব্রহ্মকে তাঁহার সমস্ত উপাধি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গুণ সত্তা রূপে সাজাইয়া তোলা হয়। শিব এবং শক্তির মধ্যে—গুণ এবং পুরুষের মধ্যে—এইরূপ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার কর্ত্তা কে? মূল কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর আমার বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে তাহা এখন বলি প্রণিধান করুন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতির ঐতিহাসিক জীবনের মধ্য পথে বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া দেব-প্রসাদের সহিত আত্মপ্রভাবের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল; আর, সেই ঘটনার পর হইতে দেবপ্রসাদভ্রষ্ট আত্মপ্রভাবের তমো ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সেই বিচ্ছেদের কণ্টকাকীর্ণ শাখা প্রশাখা চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। ঈশ্বর-প্রসাদ হইতে আত্মপ্রভাবের বিচ্ছেদই মূলবিচ্ছেদ; সেই মূল বিচ্ছেদের দ্বার খোলা পাইয়া তাহার মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ধর্ম্মরাজ্যে নানা-প্রকার শাখা-বিচ্ছেদের জঞ্জাল প্রবেশ করিল—প্রবেশ করিয়া বহির্জগতের জনসমাজকে নানা বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিল; এবং অন্তর্জগতের প্রধানদিগের মধ্যে—জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্মোদ্যমের মধ্যে—বিবাদের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে নানা প্রকার দার্শনিক মতামতের বায়ু ব্যজন করিতে লাগিল; তার সাক্ষী ঃ—

সাংখ্য দর্শন, প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অনাথা, উন্মত্তা এবং উচ্ছৃঙ্খলা করিয়া ফেলিল। এরূপ প্রকৃতি এক প্রকার ছিন্নমস্তা উন্মাদিনী বিভীষিকা।

বেদান্তদর্শন, জ্ঞানকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল। এরূপ উদাসীন জ্ঞান একপ্রকার পঞ্জিকার রাহু—ধড়শূন্য মাথা।

বৈষ্ণব শাস্ত্র, ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ ভক্তি এক প্রকার মস্তকবিহীন হৃৎপিণ্ড।

শাক্ত ধর্ম্ম এবং তন্ত্র-শাস্ত্র শক্তিকে শিব হইতে অর্থাৎ কল্যাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে বিপথগামিনী করিয়া ফেলিল। এরূপ শক্তি এক প্রকার মদের মাদকতা শক্তি; তা বই, তাহা আত্মার সংযম-শক্তি নহে।

শৈব ধর্ম্ম শিবকে অর্থাৎ মঙ্গলকে শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে উদাসীন বোম্‌ভোলা করিয়া ফেলিল; এরূপ ঝিমন্ত মঙ্গল জগতের কোনো উপকারে আসিতে পারে না।

তাহার পরে এই সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবয়ব খণ্ডে জীবন সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ের উদ্ভাবনা আরম্ভ হইল—নানা প্রকার রূপকের কল্পনা আরম্ভ হইল। অনীশ্বরা প্রকৃতিকে কালী দুর্গারূপে সাজাইয়া তোলা হইল। পরমেশ্বরকে শক্তিহীন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ভোলা মহেশ্বর রূপে সাজাইয়া তোলা হইল। অজ্ঞানা ভক্তিকে রাধারূপে সাজাইয়া তোলা হইল। এই সকল শাখা-বিচ্ছেদ হইতে নানা প্রকার কণ্টক-বিচ্ছেদ ফুটিয়া বাহির হইয়া বিচ্ছেদই এক্ষণে আমাদের দেশের প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতিবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, দলাদলি, আড়াআড়ি, রেষারেষি, কলহ বিবাদ, পর-নিন্দা পরচর্চ্চা, এই সকল দূষিত উপাদানই আমাদের দেশের শরীরের অস্থি মজ্জা শোণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইটিই হ'চ্চে আমাদের দেশের মর্ম্মান্তিক রোগ। এ মহাব্যাধির প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে। সে উপায় হ'চ্চে—আত্মার একটিও আধ্যাত্মিক অবয়ব ছিন্ন না করিয়া পরমাত্মার সহিত তাহার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যোগ সংস্থাপন করা। এইরূপ যোগের নাম অধ্যাত্মযোগ। পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ দুই রূপ—(১) প্রাকৃত যোগ এবং (২) অধ্যাত্ম যোগ; আর, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রাকৃত যোগ সাধন-নিরপেক্ষ—অধ্যাত্ম-যোগ সাধন-সাপেক্ষ। এ কথাটি আর একটু খুলিয়া বলি ঃ—

আমরা আমাদের সম্মুখে ঐ যে দেয়াল দেখিতেছি, উহা দেয়ালের বহিরাবরণমাত্র। ঐ দেয়ালটির ভিতরে কত যে অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা চলিতেছে—আমরা আমাদের চর্ম্মচক্ষে তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, কিন্তু, দেয়ালের অভ্যন্তর-প্রদেশের প্রথম স্তরে দেখেন—মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় স্তরে দেখেন—যোগাকর্ষণ; তৃতীয় স্তরে দেখেন—রাসায়নিক আকর্ষণ; চতুর্থ স্তরে দেখেন—আলোক উত্তাপ এবং তাড়িত রশ্মির নিগূঢ় রহস্যলীলা। এ সকল দেখিয়াও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এটা এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তরেরও অন্তর আছে—সকল বস্তুরই গভীরতম অন্তঃস্তর আছে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্রথম স্তরে দেখেন দেয়ালের দৃশ্যমানতা, দৃশ্যমানতার অভ্যন্তরে

দেখেন দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিচালনা; দর্শনেন্দ্রিয়-পরিচালনার অভ্যন্তরে দেখেন মনের সংযোগ; মনঃসংযোগের অভ্যন্তরে দেখেন বিজ্ঞানাত্মা। এ সকল দেখিয়াও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এটা এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তরেরও অন্তর আছে—সকল বস্তুরই গভীরতম অন্তঃস্তর আছে। আমাদের দেশের আদিম ঋষিরা ধ্যান-যোগে দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যের গভীরতম অন্তঃস্তর এবং দর্শকের গভীরতম অন্তঃস্তর একই অভিন্ন প্রদেশ। তাহা আত্মার হিরণ্ময় কোষ। আত্মার, সূর্য্যের, এবং সকল বস্তুর সেই গভীর অন্তঃস্তরে—সেই হিরণ্ময় কোষে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ঋষিদিগের ধ্যানে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। অতএব, এমন যে জ্ঞান-শূন্য বস্তু দেয়াল, তাহারও অভ্যন্তরে পরমাত্মা জাগ্রত রহিয়াছেন কিন্তু দেয়াল তাহা জানে না; তেমনি আবার, আত্মা যখন অজ্ঞান-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে তখনও পরমাত্মা আত্মার অভ্যন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন কিন্তু আত্মা তাহা জানিতেছে না। এইরূপ অজ্ঞান-গর্ভ যোগের নাম দেওয়া যাইতে পারে—প্রাকৃত যোগ অথবা নৈসর্গিক যোগ। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার যোগ আছে—তাহার নাম অধ্যাত্মযোগ। সাধক যখন আপনার শিশির-বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরমাত্মার অতলস্পর্শ গম্ভীর জ্ঞান-সমুদ্রের সংস্পর্শ উপলব্ধি করেন এবং সেই মঙ্গলালয়ের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করেন; এইরূপ যখন জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, প্রেমের সহিত, যত্নের সহিত, পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করেন; তখন তাহারই নাম আধ্যাত্মযোগ।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, অধ্যাত্মযোগ—কি যেন একটা অলৌকিক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। কিন্তু প্রকৃত কথা-এই যে, অধ্যাত্মযোগ বিশিষ্টরূপে সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া কঠিন—অলৌকিক বলিয়া কঠিন নহে। সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া আকাশে উত্থান করা যে-ভাবে কঠিন—অধ্যাত্মযোগ সে-ভাবে কঠিন নহে। সুখ সম্পদে উন্মত্ত না হইয়া—দুঃখ ক্লেশে অভিভূত না হইয়া—মনকে কর্ত্তব্য-পথে অবিচলিত রাখা যে-ভাবে কঠিন, অধ্যাত্মযোগ সেই ভাবে কঠিন। পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ এমন কোনো সামগ্রী নহে যে, তাহা নাই অথচ কলে-কৌশলে ঘটাইয়া তুলিতে হইবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার এক-মেটে যোগ সর্ব্বক্ষণই রহিয়াছে। সেই এক-মেটে যোগকে চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন দ্বারা দোমেটে করিলেই তাহা অধ্যাত্মযোগে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম-যোগের একটি ছোটো খাটো উদাহরণ দিতেছি—তাহা দৃষ্টে উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য আবাল বৃদ্ধ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

পিতা জানিতেছেন যে, আমি পুত্রের মঙ্গলেরই জন্য তাহাকে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছি; কিন্তু পুত্রের এইরূপ জ্ঞান হইতেছে যে পিতা কেবল আমার উপরে প্রভুত্ব খাটাইবার জন্য আমাকে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বলিতেছেন; এ অবস্থায় দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পিতার জ্ঞান এবং পুত্রের জ্ঞান উভয়ে পরস্পরের বিপরীত-মুখী। তাহার কিয়ৎ বৎসর পরে পুত্র যখন বিদ্যাশিক্ষার পথে রীতিমত অগ্রসর হইয়া শিক্ষিত বিদ্যার রস-গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার মনে

আর-একরূপ জ্ঞান জন্মিল; তখন সে জানিতে পারিল যে, পিতা আমার মঙ্গলেরই জন্য আমাকে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন। এই দ্বিতীয় অবস্থায় পুত্রের জ্ঞান পিতার জ্ঞানের সহিত একতানে মিলিত হইয়া গেল। তাহার পরে পুত্র আপন ইচ্ছায় বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইল। এই তৃতীয় অবস্থায় পুত্রের ইচ্ছা পিতার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত একতানে মিলিত হইয়া গেল। এইরূপে পিতার জ্ঞান এবং ইচ্ছার সহিত পুত্রের জ্ঞান এবং ইচ্ছা একতানে মিলিয়া যাওয়াতে পিতার পুত্রবাৎসল্য এবং পুত্রের পিতৃভক্তির মধ্যে যোগ ঘনীভূত হইল। এই চতুর্থ অবস্থায় পিতার ভালবাসার সহিত পুত্রের ভালবাসা একতানে মিলিত হইয়া গেল। পিতা-পুত্রের মধ্যে ভালবাসা-সম্বন্ধ পূর্ব্বেও ছিল এখনো রহিয়াছে; তবে কি—না পূর্ব্বে তাহা একমেটে ছিল, এখন তাহা দোমেটে হইল। পিতার জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার সহিত পুত্রের জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার যোগবন্ধন এই-যেরূপ দেখিতে পাওয়া গেল ইহা এক প্রকার ছোটো খাটো অধ্যাত্মযোগ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

উদ্বোধন।

(পরলোকগত মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর শ্রাদ্ধকালে আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত)

হায়! এই দেবগৃহের ভক্তি-ভাজন গৃহস্বামী আমাদের হৃদয়ের কি আরাম নিকেতন ছিলেন—কি সুবিমল আনন্দের উৎস ছিলেন! এ জীবনে তেমন আর আমরা পাইব না। তাঁহার বিশাল হৃদয় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ পরিধি-মণ্ডলে কুলাইল না তাই তিনি দেবলোকের অমৃত-আনন্দময় মুক্ত সমীরণে সমুত্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয়-দ্বার অমৃত নিকেতনের দিকে দিবানিশি উন্মুক্ত থাকিত; আমাদের জীবনে আমরা তাহা কপাট-বদ্ধ দেখি নাই—এক দিবসও কপাটবদ্ধ দেখি নাই—এক নিমেষও কপাটবদ্ধ দেখি নাই। তাঁহার হৃদয় কবিত্ব-রস-মাধুর্য্যের এবং সুবিমল প্রেমানন্দের অগাধ খনি ছিল। তাহাতে আবার তাহা উচ্চতম সাহিত্যের অপর্য্যাপ্ত রত্নভাণ্ডার ছিল। সে ভাণ্ডার লুটিয়া আমরা কত দেশ বিদেশের কত রস-পূর্ণ ইতিহাস-পুরাবৃত্ত—স্বদেশের কত বিচিত্র পুরাতন কাহিনী—বঙ্গের কত অপূর্ব্ব সেকাল-রহস্য—মনের জাহাজ বোঝাই করিয়া করিয়া লইয়া গিয়াছি। সে যে ভাণ্ডার ছিল তাহা অক্ষয় ভাণ্ডার, চিরকালই তাহা মূল্যবান্ সামগ্রীতে ভরা থাকিত—তাহা ফুরাইতে জানিত না। সেই ভাণ্ডারের লোভে আমরা যখনই তাঁহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় জুড়াইতে আসিতাম, আমরা তাঁহার দ্বারের নিকটস্থ হইতে না হইতেই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ের দ্বার দূর হইতে আপনা-আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। সেরূপ অমায়িক মধুময় হাস্য আর আমরা চক্ষে দেখিব না! সেরূপ জ্ঞানের কথা এবং প্রেমের কথা আর আমরা কর্ণে শুনিব না! এখানে তিনি নাই ইহা মনে করিতে পারাও আমাদের পক্ষে সুকঠিন। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে এক সূক্ষ্ম হৃদয় সারা বঙ্গভূমিময় ব্যাপিয়া রহিয়াছিল তাহার সংস্পর্শ আমি দূরদেশে থাকিয়াও বার বার অনুভব করিতাম। তাহারও অভ্যন্তরে তাহা অপেক্ষা আরেক গ্রাম

সূক্ষ্মতর এবং গভীরতর হৃদয় যাহা এলোক এবং দেবলোকের মধ্যে সুর বাঁধিয়া এক্ষণে স্পন্দিত হইতেছে—সেই তাঁহার সূক্ষ্মতম হৃদয়ের তাড়িত সংস্পর্শে আজ আমাদের শোকাশ্রু-পরিপ্লুত হৃৎপদ্ম-কানন বিকসিত হইয়া করুণাময় প্রেমময় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অমৃত আনন্দরসে ভরিয়া উঠিতেছে। আজিকের দিব্যধামবাসী এবং সেদিনকার এই দেবগৃহবাসী ভক্তিভাজন গৃহস্বামীর মাধুর্য্য-রস-পূর্ণ স্বচ্ছ সুবিমল হৃদয়ের মধ্য দিয়া আমরা সর্ব্বজগতের কল্যাণপ্রদ পিতা শান্তিপ্রদায়িনী মাতা এবং প্রাণপ্রদ সুহৃদের অপার্থিব প্রেমরাজ্য, মঙ্গল-নিকেতন এবং হৃদয়-কমল-বিকাশিনী স্বর্গীয় জ্ঞানারুণছটা অবলোকন করিতেছি। দেখিতেছি যে, সেই আমাদের প্রিয়তম রাজনারায়ণ বাবু পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণা পশ্চাতে রাখিয়া দেবতাদিগের সহিত সত্যং জ্ঞানমনন্তং আনন্দরূপমমৃতং পরমাত্মার গুণগানে প্রাণের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছেন। যদি—সহৃদয় বন্ধুজনের আত্মায় আত্মায় যোগ আছে—হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ আছে—প্রাণে প্রাণে যোগ আছে—এ কথা সত্য হয়, তবে আমরা জানিতে না পারিলেও—কল্পনাতে ভাবিতে না পারিলেও—আমাদের সেই দেবগৃহবাসী ভক্তিভাজন প্রিয়তম হৃদয়-সখা কোনো এক অলক্ষিত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পথদিয়া আমাদের উপরে শান্তিঃশান্তিঃ এবং কল্যাণ বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, যেহেতু পরমেশ্বরের শক্তি অনন্ত, করুণা অসীম; তাঁহার প্রসাদের অজস্র ধারা ইহলোক এবং পরলোকের বাঁধ মানে না। এই দেবগৃহের গৃহস্বামী যে লোকে যে খানেই থাকুন—তিনি পরমাত্মার প্রেমের অভ্যন্তরে অনুপম শান্তিতে বিলীন রহিয়াছেন—এবং সেই স্বর্গীয় সুধাপানে নবীভূত হইয়া পরমেশ্বরের করুণা এবং নূতন মঙ্গল-রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে দ্রবীভূত হইতেছেন ইহা জানিয়া আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সহিত এক হৃদয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থে সর্ব্বমঙ্গলালয় শান্তিদাতা পরমাত্মার উপাসনায় সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

দীক্ষা।

যিনি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, কোন বিশেষ দিনে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করাকে দীক্ষা বলে। প্রায় সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই এই দীক্ষা-প্রথা প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মসমাজও এই দীক্ষা-প্রথার আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসীদিগকে প্রকাশ্যভাবে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার উপদেশ দেন। প্রকাশ্য সভাতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণ মত সকলে বিশ্বাস থাকা স্বীকার করা, এবং সকলের সমক্ষে পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া ঐ সকল মত জীবনে পালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দীক্ষা।

অনেকে এই দীক্ষা-প্রথার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যাহা তুমি বিশ্বাস কর সেইরূপ কার্য্য কর; সে বিষয়ে লোক-খ্যাতি এবং প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন কি? ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান আপত্তিজনক বটে, কিন্তু অনেক সময়ে বাহ্যানুষ্ঠানেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আপন আপন জীবন পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, সময়ে সময়ে মনে মনে যে কোন প্রতিজ্ঞা করি,

তাহা ভঙ্গ করিতে আমরা সহজে সক্ষম হই না। প্রতিজ্ঞার একটি বল আছে, অনেক সময়ে প্রতিজ্ঞার বলে, আমরা অনেক গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রণোদিত হই। "আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিব না" যদি গম্ভীরভাবে মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি, তবে মিথ্যা বলিবার প্রলোভন জয় করিতে ঐ প্রতিজ্ঞার স্মৃতি আমাকে অনেক সময়ে সাহায্য করিবে। প্রতিজ্ঞার বলে যে, অনেকে অনেক সময়ে পাপ ইচ্ছাকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যদি আপন মনে মনে প্রতিজ্ঞারই এইরূপ কার্য্যকারিতা জানা গেল, তখন মনে মুখে এক হইয়া গম্ভীরভাবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া "অদ্য আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল পালন করিব, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিব এবং প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিতের ধর্ম্ম গ্রহণ করা রূপ মহাব্রতের উৎসাহজনক আচার্য্য-প্রদত্ত জ্বলন্ত উপদেশ-মালা যে তাহার অন্তরে এক স্থায়ী ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিক এই দীক্ষা ব্যাপার দীক্ষিতের অন্তরে এমন এক উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয় যে, এই স্রোত তাহার ধর্ম্মজীবনকে আজীবন সজীব রাখিতে পারে।

দীক্ষার দিন জীবনের একটি প্রধান দিন। জীবনে যখনই আমার মন কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবে, তখনই ঐ বিশেষ দিন আমার স্মরণ-পথে উদিত হইয়া আমাকে লজ্জিত করিবে। যখনই আমার মন ঈশ্বরোপাসনা করিতে অনিচ্ছুক হইবে, তখনই ঐ বিশেষ দিন "আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব" এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। আমার মন বিপথে পদচারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিব, অদ্য যে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, অতএব আমি ইহা করিতে পারি না, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি না, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না" এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে। মন সহজে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চায় না, ইহা মনের একটি স্বভাব। আমরা অনেক সময়ে লোকনিন্দার ভয়েও পাপকার্য্য হইতে বিরত হই। যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে পাপ পথ পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং একটি বিশেষ ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিবার ইচ্ছা সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যদি ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, তবে লোকসমাজে তাঁহার যেমন নিন্দা এবং অপবাদ ঘোষিত হইবে, অন্য ব্যক্তি অধিকতর দুরাচারী হইলেও, তিনি তদ্রূপ নিন্দাভাজন হইবেন না। দীক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া গেলেও কেবলমাত্র লোকাপবাদ-ভয়েই তিনি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে পারেন।

দীক্ষার আর একটি কার্য্যকারিতা এই যে, ইহা দীক্ষিতকে সৎসাহসী করে। দীক্ষিত ব্যক্তি যখন যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন তাহা সাধারণে প্রকাশ করিতে অথবা তদনুসারে কার্য্য করিতে কখনও কোন সমাজ অথবা ব্যক্তিকে ভয় করেন না। কারণ তিনি যে ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম তাহার পৈতৃক ধর্ম্ম ও সমাজের

বিরুদ্ধ হইলেও এবং ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সমাজে তাহাকে কি ভয়ানক রূপে নিপীড়িত হইতে হইবে, আত্মীয় স্বজনের কি ভীষণ কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইতে হইবে, ইহা জানিয়াও প্রকাশ্যভাবে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি যে অতি প্রশংসনীয় সৎসাহসের পরিচয় দিলেন, তাহা অতুলনীয়। এই একটী সৎসাহসের কার্য্যই তাঁহাকে চিরজীবন সাহসী রাখিবে। কখনই কোন সৎকার্য্য করিতে তিনি ভয়ে ভীত হইবেন না; সাহসের সহিত, উৎসাহের সহিত জীবনের কর্ত্তব্য সকল তিনি সম্পন্ন করিতে পারিবেন। অদীক্ষিত ব্যক্তির এরূপ সৎসাহস সম্ভব নহে। তিনি একটি কাজ কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াও একবার সমাজের দিকে এবং একবার আত্মীয় স্বজনের দিকে তাকাইবেন। এইরূপে তাহার অনেক সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। মনের সদ্বৃত্তিগুলি এইরূপ বাধা প্রাপ্ত হইলে তাহারা আর কখনই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, এবং অবশেষে শুষ্ক এবং মলিন হইয়া যায়।

যাহার অন্তঃকরণের সৎবৃত্তি সকল সরস, সতেজ এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত নহে, শুষ্ক শুষ্ক মলিন এবং নিষ্প্রভ তিনি ক্রমে ক্রমে মনুষত্ব বর্জ্জিত হন। অতএব দীক্ষা যে জীবনে একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয় তাহা নিঃসন্দেহ। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে অর্থাৎ হিতাহিত ভালমন্দ বুঝিবার উপযুক্ত পরিপক্কতা লাভ না করিয়া কখনও ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত নহে। অপরিপক্ক বয়সে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, পরিণত বয়সে আবার তাহাই অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে। বক্তৃতার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া একটি গুরুতর দুর্ব্বলতা। একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা আপন অন্তরে সত্যাসত্যের এবং ভাল মন্দের বিচার করেন না; তাহারা কেবল বক্তৃতার স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান। এক সময়ে ব্রাহ্ম প্রচারকের তেজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই বিগলিত হন, এবং সেই ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া তাহাতেই বিগলিত হন, এবং সেই ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া তাহারই পশ্চাৎবর্ত্তী হন; কিন্তু বক্তৃতা স্রোতের প্রবলতা যতই কমিতে থাকে, তাহার অন্তঃকরণের ধর্ম্ম উদ্দীপনাও ততই হ্রাস প্রাপ্ত হয়; এবং ইতিমধ্যে অন্য ধর্ম্মের একটি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শুনিলেই পূর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আমরা যে নিত্য ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহার কারণ কেবল এইরূপ স্রোতে ভাসা। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং নিজের জীবন পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মমত গঠন করেন না। পুস্তক পাঠ এবং বক্তৃতা শুনিয়া অন্যের মত সংগ্রহ করেন, এবং বড় লোকের বক্তৃতা এবং বড় লোকের পুস্তক হইলেই তাহাতে গুরুত্ব আরোপণ করেন। কাজেই তাহাদের মত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বাস্তবিক ধর্ম্মমত সকল আত্মচিন্তা এবং আত্মপরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না।

এই শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেই মঙ্গল। ইহারা স্রোতে ভাসিয়া আইসে, স্রোতে চলিয়া যায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব কিছুই অবগত হইতে না পারিয়া এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদের মনঃকল্পিত কুৎসা রটনা করিয়া অন্যের মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দেয়। যিনি একবার জলে অবগাহন করিয়া জলের শীতলতা অনুভব করিয়াছেন, তিনি আবার কি প্রকারে জলকে উষ্ণগুণবিশিষ্ট বলিতে পারেন জানি না। যিনি এরূপ বলেন, তিনি হয় তো কখনও জলে অবগাহন করেন নাই, তীর হইতেই উহার শীতলতা অনুমান করিয়াছিলেন, না হয়, অন্যের মুখে শুনিয়া জলকে শীতল বলিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! আমি একবার ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিলাম কিন্তু কিছুকাল পরেই আমার সে বিশ্বাস চলিয়া গেল, আবার সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকেই আমি নিতান্ত অসত্য এবং অসার বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমাদের এরূপ করিবার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যগুলি জীবনে পরীক্ষা না করিয়াই ইহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অতএব যে সকল যুবকের অন্তঃকরণে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, তাঁহাদের প্রথমে আত্মপরীক্ষা করা আবশ্যক। তাঁহারা আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিবেন যে, আত্মচিন্তা এবং স্বীয় স্বীয় জীবনে পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা যে সকল সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে সেই সকল সত্যের সমাবেশ দেখেন বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে উৎসুক হইয়াছেন; না, ব্রাহ্মসমাজের সুমিষ্ট সঙ্গীতাবলী শ্রবণে এবং সুন্দর উপাসনা-প্রণালী অথবা সমাজের অন্য বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। যদি প্রথমোক্ত ভাবে কেহ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তবে তিনি দীক্ষিত হউন। কারণ, তাঁহার ধর্ম্মমত অচল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিছুতেই টলিবার নহে। আর শেষোক্তভাবে যিনি আসিয়াছেন, তিনি প্রতিনিবৃত্ত হউন; কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাব তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করে নাই। আজ না হয় কাল, তিনি মতপরিবর্ত্তন করিবেন, ইহা নিশ্চয়। সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরাও যেন সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করাকেই সমাজের উন্নতি সাধন মনে না করেন। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, শতশত অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসী, একটি প্রকৃত বিশ্বাসীর তুল্য নহে। প্রকৃত বিশ্বাসের কণামাত্রও যে ব্যক্তির আত্মাতে আছে তিনি এককই সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন। দীক্ষা প্রদানের সময় এইরূপ পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতে হইবে। অপাত্রকে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করা না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তবেই ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ এবং তবেই আমরা ব্রাহ্মসমাজের ক্রমোন্নতির আশা করিতে পারি।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ।

১ অগ্রহায়ণ, ১৮২১ শক। অদ্য হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধনরক্ষক পদে ও পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজ্ঞানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথঠাকুর।
ট্রষ্টীগণ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৫ অগ্রহায়ণ রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ঊনচত্তারিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে। ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥০ ঘটিকা এবং অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময়ে সকলের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬১৩৸৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৬৭৵৩
সমষ্টি	...	১১৮১৲
ব্যয়	..	৬০০৵৯
স্থিত	...	৫৮০৸৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের	
বাটীতে গচ্ছিত	৬১৲৩
	৫৬১৲৩
সমাজের ক্যাশে মজুত	১৯৸৵০
	৫৮০৸৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১৪১॥৵৬

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার	১॥৴৬
	১৪১॥৴৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৭।৵৹
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা		১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায় ঐ		১২৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ		২৲
„ „ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, ঐ		৩৲
„ „ উপেন্দ্রনাথ কুমার, ঐ		১৷৹
„ „ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ		৫৲
„ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ		৩৲
„ „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ		৩৲
„ „ শ্যামলাল মল্লিক, ঐ		৩৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ		৩৲
„ „ মথুরানাথ রায়, ঐ		৩৲
„ „ লালবিহারী বড়াল, ঐ		৩৲
„ „ তুলসীদাস দত্ত, ঐ		৩৲
„ „ হেমলাল পাইন, ঐ		৩৲
„ „ দেবেন্দ্র দেব দাস, ঐ		১৷৹
„ „ কন্নুলাল বর্ম্মণ, ঐ		৩৲
„ „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ		৩৲
৺ „ মতিলাল পাল, ঐ		৩৲
শ্রীযুক্ত মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কাশিমবাজার		২৪৸৹
„ মহারাজা জি, এন্, গজপতিরাও গুরু, সি, আই, ই, ভিজিগাপত্তন		১০৵৹
„ বাবু হরকুমার সরকার, ঘোড়ামারা		১০৲০
„ „ ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বাহিলরায়গঞ্জ		১০৵৹
„ „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এলাহাবাদ		৩।৵০
„ „ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ		৩।৹০
„ „ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, নলহাটী		।৵০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, মাণিকদহ,		১০৲
„ „ ব্রাহ্মসমাজ, মেদিনীপুর		৩।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়		১২৲
		১৫৭।৵০
পুস্তকালয়	...	৩৸৬
যন্ত্রালয়	...	৩০৯৵৯
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		৬১৩৸৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩২২৸৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৯।৲৩
পুস্তকালয়	...	৴০
যন্ত্রালয়	...	২৪৭৸৬
সমষ্টি		৬০০৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

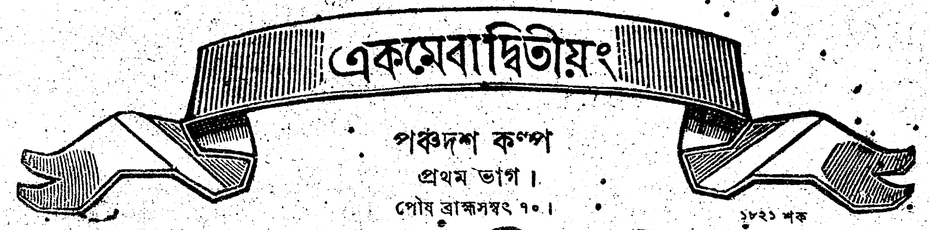

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়			পৃষ্ঠা
পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)		...	১৩৭
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১৪১
কৃষ্ণাবতার (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৫০

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৩। কলিগতাব্দ ৫০০০। ১ পৌষ শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই। মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা।

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০। ১৮২১ শক

৬৭৭ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের প্রথম উপদেশ।

ঈশ্বরের উপাসনা পরের উপাসনা নহে, যেহেতু তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা। তাঁহার সহিত চিরকালই আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং চিরকালই সম্বন্ধ থাকিবে। তাঁহা হইতে আমাদের আত্মাতে নিয়তই প্রেমময় জ্ঞান-জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে এবং তাহাতেই আমাদের আত্মা জীবন পাইতেছে। প্রাতঃকালে সেই নিখিল মঙ্গলের আকর—শক্তি প্রাণ চেতন জ্ঞান এবং আনন্দের আকর—পরমাত্মাতে মনঃসমাধান করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে দিন দিন আমাদের পরিবারের মঙ্গল হইতে থাকিবে। প্রাতঃকালে সুগন্ধি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিলে আমাদের শরীর সুস্থ হয়; কেন সুস্থ হয় তাহার কারণ কেহই জিজ্ঞাসা করে না, যেহেতু তাহার কারণ খুবই স্পষ্ট; তেমনি প্রাতঃকালে একান্তকরণে পরমাত্মার উপাসনা করিলে আমাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয় ইহাতে কাহারো সংশয় হইতে পারে না। আমরা যদি পাষাণ হইয়া যাই তবে তাহা অমঙ্গল; আমরা যদি মূঢ় জন্তু হইয়া যাই তবে তাহা অমঙ্গল; আমরা যদি মনুষ্য হই তবে তাহাই মঙ্গল; আমাদের অন্তঃকরণে যদি জ্ঞান প্রেম এবং উদ্যম স্ফূর্ত্তি পায় তবে তাহাই মঙ্গল। আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরমাত্মাতে মনঃসমাধান করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে আমাদের জ্ঞান প্রেম এবং উদ্যমের পরাকাষ্ঠা চরিতার্থতা হয়—এই জন্য তাহা পরম মঙ্গল। এরূপ পরম মঙ্গল আমাদের হাতের কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া তাহা হইতে বিমুখ হওয়া নিতান্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকেই শোভা পায়। যিনি আমাদিগকে এত ভাল বাসিতেছেন যে, তাঁহার ভালবাসা হইতে আমাদের সবই আমরা পাইতেছি—দেহে প্রাণ পাইতেছি, মনে চেতন পাইতেছি, জ্ঞানে সত্য পাইতেছি, আত্মাতে অমৃত আনন্দের খনি পাইতেছি—তাহা পাইয়াও তাঁহার প্রতি ভালবাসা সমর্পণ করিতে—প্রীতি ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে আমরা যদি ভার বোধ করি তবে

আমরা বাহিরে মনুষ্য, অন্তরে পাষাণ। অতএব আমরা যদি নির্জ্জীব পাষাণ হইতে ইচ্ছা না করি তবে আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদ-ভাণ্ডার হইতে শক্তি জীবন চেতন জ্ঞান এবং আনন্দ সঞ্চয় করি এবং তাঁহার অনুগত ভক্ত হইয়া প্রীতি ভক্তিপূর্ণ বিমল অন্তঃকরণে সে সমস্ত ধন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করি। এক্ষণে তাই আমরা এই সুবিমল প্রভাতে আত্মার অন্তরতম পরমাত্মাকে প্রেমের আকর এবং সকল মঙ্গলের মূলাধার জানিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

দ্বিতীয় উপদেশ।

শরীর প্রসন্ন না থাকিলে যেমন প্রাত্যহিক মধ্যাহ্ন ভোজনে অরুচি হয়, তেমনি আমাদের অন্তরাত্মা প্রসন্ন না থাকিলে প্রাত্যহিক ঈশ্বরারাধনায় অরুচি হয়। শরীর মন সুপ্রসন্ন থাকিলে আত্মার মঙ্গল-কিরণ সংসারে বিকীর্ণ হইবার পথ পায়; এই জন্য শরীর মন যাহাতে সুপ্রসন্ন থাকে তাহার জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু শরীর যদি দেখিতেই কেবল হৃষ্ট পুষ্ট হয়—মন উপরে উপরেই নিরুদ্বিগ্ন হয়; ভিতরে ভিতরে যদি অন্তরাত্মা গ্লানিযুক্ত থাকে তাহা হইলে শরীরের সে হৃষ্টপুষ্টতাতেও বিশ্বাস নাই, মনের সে নিশ্চিন্ততাতেও বিশ্বাস নাই; তাহা হইলে শরীর মনের সুস্থতা বাহ্য-শোভন একটা কৃত্রিম কাণ্ড হইয়া উঠে। বাহিরে যেমন শরীর মনের সুস্থতা আবশ্যক—ভিতরে তেমনি অন্তরাত্মার সুস্থতা আবশ্যক; তাহা হইলে উভয়ের যোগে উভয়েই উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যখন দেখিবে যে, সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় মন বসিতেছে—তখনই জানিবে যে, শরীর মন এবং অন্তরাত্মা তিনই সুস্থ রহিয়াছে; যখন দেখিবে যে, পরমেশ্বরের উপাসনায় মন বসিতেছে না তখনই জানিবে যে, ভিতরেই হউক্ আর বাহিরেই হউক্ কোনো না কোনো স্থানে স্বাস্থ্যের অভাব রহিয়াছে। এই জন্য পরমাত্মার উপাসনায় যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য বাহির হইতে ভিতর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করানো আবশ্যক। আমাদের দেশের অধ্যাত্ম শাস্ত্র-সমূহে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক প্রকার বিহিত প্রণালী পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে। সে সমস্ত প্রণালী পদ্ধতির সার এই:—প্রথমতঃ যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা; উপযুক্ত আহার বিহার, উপযুক্ত কর্ম্ম চেষ্টা, উপযুক্ত নিদ্রাজাগরণ ইহাই দুঃখবিনাশক যোগের সোপান। দ্বিতীয়তঃ পাপ পরিবর্জ্জন এবং চতুর্দ্দিকের লোকসমাজের সহিত হৃদয়ের সদ্ভাব সংস্থাপন। সদ্ভাব সংস্থাপনের চারিটি বিভাগ (১) মৈত্রী কিনা—সুখী ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া; করুণা কিনা দুঃখী ব্যক্তির দুঃখে দুঃখী হওয়া; মুদিতা—পুণ্যকারী ব্যক্তির পুণ্যকার্য্য অনুমোদন করা; উপেক্ষা—পাপকারী ব্যক্তির পাপকার্য্য উপেক্ষা করা। তৃতীয়ত প্রত্যাহার অর্থাৎ মনকে বিষয়রাজ্য হইতে প্রত্যাহার করা কিনা টানিয়া লওয়া। চতুর্থতঃ শ্রদ্ধাবান্ সরল এবং প্রশান্ত অন্তঃকরণে প্রীতিভক্তির সহিত পরমাত্মার ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হওয়া। এইরূপ করিয়া ঈশ্বরপ্রসাদে

আমাদের আত্মা যতই জ্ঞানে উজ্জ্বল, প্রীতিতে সরস এবং সৎকার্য্যে উৎসাহী হইতে থাকিবে—ততই ঈশ্বরের উপাসনায় প্রত্যহই আমাদের রুচি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং মঙ্গলের মূল আকর হইতে আমরা সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে থাকিব। মূল হইতে রসাকর্ষণ না করিলে বৃক্ষের শরীরে জীবন সঞ্চারের যেমন অন্য উপায় নাই—পরমাত্মার উপাসনা ব্যতিরেকে মনুষ্যের শরীর মন আত্মাতে তেমনি মৃত্যুর অতীত স্বর্গীয় জীবন সঞ্চারের অন্য কোনো উপায় নাই। সেই জন্য প্রাত্যহিক উপাসনা নিতান্তই কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বর-প্রীতি সুপরিস্ফুট হইয়াছে, ঈশ্বরোপাসনা কেবল তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে—তাহা তাঁহাদের প্রাণের আরাম। পথ্য-সেবন রোগীর পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু অরোগী ব্যক্তির পক্ষে অন্ন ভোজন কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য নহে—তাহার পক্ষে তাহা যেমন কল্যাণপ্রদ তেমনি সুখপ্রদ। প্রেমী জ্ঞানী এবং সৎকর্ম্মশীল ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনায় অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হ'ন। তাঁহার সে আনন্দ স্থায়ী আনন্দ—বিমল আনন্দ—উজ্জ্বল আনন্দ—সরস আনন্দ—মধুময় আনন্দ; সেই আনন্দই প্রকৃত-রূপে আনন্দনামের যোগ্য।

তৃতীয় উপদেশ।

শিশুদিগের নিকট হইতে আমরা খুব একটি সুশিক্ষা লাভ করিতে পারি। শিশুদের সুখের আকাঙ্ক্ষা নাই—অথচ তাহারা সুখী। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা না পাইলে যৌবন-কালে সঙ্গতিপন্ন লোকের মনের ভাব আর এক রূপ হয়। তাহার অসংযত সুখ-লালসা যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে থাকে তাহার সুখ সন্তোষ সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে। শেষে সুখের একটা অলীক কল্পনা আসিয়া সুখের বসিবার আসনে আপনি জমকিয়া বসে। সেই কুহকিনী কল্পনা রথ অশ্ব সাজ সজ্জা আমোদ প্রমোদ এবং সকলের উপরে প্রভুত্ব ইত্যাদি প্রকার নানা প্রলোভন সামগ্রী অবোধ যুবকের মনোনেত্রের সম্মুখে সাজাইয়া তুলে; সাজাইয়া তুলিয়া তাহার আকর্ষণ বলে তাহাকে মৃত্যুর ফাঁদপাতা সঙ্কটাকীর্ণ ঔদ্ধত্য এবং উন্মত্ততার পথে নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার পরে সেই অন্ধকার-ময় পথে আলেয়ার ন্যায় কৃত্রিম সুখের পৈশাচিক আলোক চমকিত করিয়া অধীন যুবককে কখনো বা দুঃখের হ্রদে কখনো বা গ্লানির পঙ্কে, কখনো বা বিপত্তির সাগরে ডুবাইয়া দেয়; কখনো বা বিষাদের তিমিরাচ্ছন্ন রসাতলে নিক্ষেপ করিয়া অবসন্ন হয়; কখনো বা সিংহ-ব্যাঘ্র-সংকুল ভয়ের অরণ্য-মধ্যে উপনীত করিয়া দিয়া বিকট হাস্য করে। ইহারই নাম কুহকিনী কল্পনা। আর এক প্রকার কল্পনা আছে, তাহার নাম শুভ কল্পনা। বাল্মীকি মুনি অযোধ্যাপুরীকে যেরূপ আদর্শপুরী করিয়া সাজাইয়াছেন, তাহাতে শুভকল্পনারই প্রসাদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি মুনির উদ্ভাবিত অযোধ্যাপুরীতে সকলেই স্ব স্ব ব্যবসায়ের সৎপথে নিযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের হিত-সাধনে ব্যাপৃত, কেহই আত্মসুখের জন্য লালায়িত নহে—অথচ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ এবং পরম সুখী। মনুষ্য মনুষ্য তো বটে, মনুষ্য তো আর অসুর নহে, দৈত্য নহে,

পিশাচ নহে ; এই হেতু শুভবুদ্ধির কন্যা শুভ কল্পনা তাহার মনশ্চক্ষুতে অবসর ক্রমে সময়ে সময়ে দেখা দিতে ছাড়ে না। কিন্তু হইলে হইবে কি—অবোধ যুবার অন্তঃকরণের আর এক দ্বার দিয়া—খিড়কি দ্বার দিয়া কুহকিনী কল্পনা চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া তাহার জ্ঞান-চক্ষুতে ধূলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং তাহাকে মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া মৃগ-তৃষ্ণিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড় করাইয়া লইয়া বেড়ায়। যুবা ব্যক্তির মনোমধ্যে শুভ বুদ্ধি এবং সুখ-লালসার এই যে পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ—ইহা ঘুচানো যাইতে পারে কেবল এক উপায়ে। সে উপায় সহজ মনে করিলেই সহজ, কঠিন মনে করিলেই কঠিন, সে উপায় আর কিছু না—ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে তৎপরতা।

আমাদের অসংযত প্রবৃত্তি চায় অনিয়মিত আত্মসুখ ; শুভবুদ্ধি চায়—সমস্ত পরিবার-বর্গের এবং জন-সমাজের সমষ্টি সুখ, আর, সেই সঙ্গে সমষ্টি সুখের ক্রোড়-স্থিত সুনিয়মিত আত্মসুখ ; তা বই যে আত্মসুখ সমষ্টিসুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হৃদয়ে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, শুভবুদ্ধি সে-রকম আত্মসুখ চায় না। বুদ্ধি বলে—তুমি সুখী হইতে ইচ্ছা করিতেছ—ভালই করিতেছ ; কিন্তু তুমি যদি অসংযত সুখ-লালসা এবং কুহকিনী কল্পনার পথে ধাবিত হও—তবে সে পথে কস্মিন্ কালেও প্রকৃত সুখের দেখা সাক্ষাৎ পাইবে না ; পাইবে কেবল সুখের ছদ্মবেশধারী দুঃখের অশুভ সাক্ষাৎকার, অশান্তির কোলাহল, অন্তর্ব্যাধির জ্বালা, অজ্ঞানের অন্ধকার এবং বিষাদের নৈরাশ্য। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তুমি যদি কর্ত্তব্য-সাধনের পথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে তুমি যে, আপনি একা কেবল সুখী হইবে তাহা নহে—তাহা হইলে তোমার সমস্ত পরিবারমণ্ডলী এবং কিয়ৎ পরিমাণে চতুর্দ্দিকের জনসমাজ তোমার সুখ-সন্তোষের ভাগী হইবে।

কর্ত্তব্য-সাধনের পথে অবশ্য বাধাবিঘ্ন আছে ;—কিন্তু বাধাবিঘ্ন সকল পথেই আছে। যাহারা অসংযত আত্মসুখের পথে মূঢ়ভাবে ধাবিত হয় তাহাদের পথের বাধা-বিঘ্ন বড় যে কম তাহা নহে। সমস্ত লোকেই তাহাদিগকে ঘৃণা-চক্ষে দেখে ; সাধু ব্যক্তিরা তাহাদের জন্য দুঃখিত হয়, কপট ব্যক্তিরা তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাহাদের নিকট হইতে স্বার্থ আদায় করিতে চেষ্টা করে ; দুর্জ্জনেরা তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আহ্লাদ যে কোথায় রাখিবে তাহার স্থান পায় না। এই সকল পর্ব্বতাকার বাধা বিঘ্নের প্রতিকূলে যাহারা অসংযত আত্মসুখের পথে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তাহারা অচিরে বিপদ-সাগরে পড়িয়া হৃদয়ের সমস্ত সুখশান্তি খোয়াইয়া ফেলে। কর্ত্তব্য-সাধনের পথ সেরূপ নহে। কর্ত্তব্য-সাধনের পথে সহস্র বাধাবিঘ্ন থাকিলেও সে বাধাবিঘ্ন ওরূপ মারাত্মক বাধাবিঘ্ন নহে। বিশেষতঃ মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের মহতী শক্তির প্রতি যাঁহাদের অটল বিশ্বাস—কর্ত্তব্য-সাধন-পথের বাধা বিঘ্ন তাঁহাদের কণ্ঠের হার। নেপোলিয়ন শুদ্ধ কেবল অন্ধ অদৃষ্ট-বলে এবং আপনার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বলে ভর করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "অসাধ্য বলিয়া একটা শব্দ তাঁহার অভিধানে নাই।" তিনি ঘোর বিষয়ী ব্যক্তি—তিনি যখন তাহা বলিতে পারিলেন, তখন যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-সাধন-পথে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় বিধাতা

পুরুষকে সহায় পাইয়াছেন, তিনি কোন্ লজ্জায় বলিবেন—যে, কর্ত্তব্য-সাধন-পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। অন্ধ অদৃষ্ট অপেক্ষা সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ কি অধিকতর বলশালী নহেন? জটিল বিষয়-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা—সরল ধর্ম্মবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কি মাত্রায় অধিক নহে? সৎপথাবলম্বী সাধু ব্যক্তিরা স্ব স্ব হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলবিধাতার উৎসাহদায়িনী অভয়বাণীই শুনিতে পা'ন ; তাঁহারা তাঁহাদের সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে সর্ব্বসন্তাপহারী ভয়হারী বিশ্বপিতার প্রসন্ন মুখই দেখিতে পা'ন। সর্ব্বজগতের রাজরাজেশ্বর তাঁহাদের বল, সর্ব্বজগতের পিতা মাতা এবং গুরু তাঁহাদের সহায়, সর্ব্বজগতের সুহৃৎ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম-ডোরে বাঁধা—এমন-তরো যখন তাঁহাদের সহায় সম্পত্তি এবং বল—তখন কাহারো সাধ্য নাই যে, তাঁহাদের সুখ-শান্তি আশা ভরসা এবং আনন্দের একচুলও হানি করিতে পারে।

শিশু যেমন আত্মসুখের জন্য লালায়িত হয় না অথচ পরমসুখী; তেমনি, যিনি সর্ব্বজগতের পিতামাতা পরমেশ্বরের সুমহৎ আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনের পথে চলিতে আরম্ভ করেন, এবং চলিতে আরম্ভ করিয়া গম্য স্থানের দিকে কিয়ৎদূর অগ্রসর হ'ন, তিনি আত্মসুখের জন্য লালায়িত হ'ন না ; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কি সুখে বঞ্চিত হ'ন? তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—তাঁহার ভিতরে কিরূপ প্রগাঢ় সন্তোষের খনি আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সম্মুখাগত মহাজন-মণ্ডলীর মুখের ভাবেই বুঝিতে পারা যায়—কোন্ মহাজনের ভাণ্ডারে মূল ধন আছে, আর, কোন্ মহাজন ঋণ করিয়া অন্তঃসারশূন্য বাণিজ্য চালাইতেছে। যে ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের কল্যাণময় পথে থাকিয়া তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতির সহিত আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়, সে তখন আত্মসুখের পথ একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায় ; তখন সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষ স্বয়ং তাহার জন্য সুখশান্তি এবং কল্যাণ প্রতিনিয়ত প্রেরণ করেন—বাহির হইতে সূর্য্য চন্দ্রের স্বর্ণথাল ভরিয়া প্রেরণ করেন—অন্তর হইতে আত্মার হিরণ্ময় পাত্র ভরিয়া প্রেরণ করেন ; তাঁহার প্রেরিত সে সুখের আস্বাদন যে কিরূপ সুমধুর, তাহা যিনি আস্বাদন করিয়াছেন তিনিই জানেন। তাহার পরে যখন প্রেরিত সামগ্রীকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ভক্তের কৃতকৃত্য অন্তঃকরণ প্রেরয়িতার প্রতি দ্বিগুণ বেগে প্রধাবিত হয় ; তখন সেরূপ প্রেম-পিপাসু ব্যক্তিকে কিছুই আর দিবার থাকে না—পরমাত্মা তখন আপনাকে দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ
কবয়োবদন্তি।

ওঠো! জাগো! সদ্‌গুরুর নিকটে গিয়া জ্ঞানশিক্ষা কর। পণ্ডিতেরা বলেন ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম।

এই হৃদয়ভেদী গম্ভীর বাক্যে উপনিষদের ঋষিগণ তৎকালবর্ত্তী লোক সকলকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এ উৎসাহবাক্যে লোকের মন উত্তেজিত

করিবার প্রয়োজন কি তাহা জানিতে হইলে তার আগেকার দু একটী কথা বলা আবশ্যক। উপনিষদের সমসাময়িক জনগণ হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বহুব্যাপারশালী ক্রিয়াকাণ্ডে উন্মত্ত ছিল। বৈদিককালে যে সরল সহজ স্বাভাবিক উপাসনা প্রচলিত ছিল কালেতে তাহা বিলুপ্ত হইল—বৈদিক দেবতাগণ সিংহাসনচ্যুত হইলেন ও বৈদিক আচার অর্চ্চনা কতকগুলি অর্থশূন্য আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইল। বৈদিক আর্য্যদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ—রীতি নীতি—পূজার্চ্চনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল যদি জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ঋগ্বেদসূক্তে তাহার কতক আভাস দেখিতে পাইবেন। দেখিবেন যে বৈদিক ঋষিদের চক্ষে প্রকৃতিই দেবতারূপে আবির্ভূত ছিলেন—জল স্থল আকাশ অন্তরীক্ষ—দ্যুলোক ভূলোক সকলি দেবতাত্মক। উষা যিনি পৃথিবীকে আলোকিত ও জীব সকলকে জাগ্রত করিয়া নব বধূর ন্যায় সহাস্য বদনে শুভ্র বসনে ধীরে ধীরে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন বৈদিক ঋষিগণ সেই উষাদেবীর স্তুতিগান করিতেন। অনন্তর বিশ্বলোচন অরুণবাহন তরুণ বিভাকর তাঁর পূর্ব্বদিগস্থিত প্রাসাদ হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইয়া সহস্র কিরণে দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল করত উদয় হইলেন, আর্য্যেরা এই আশ্চর্য্য-দর্শন কি বিমুগ্ধ ভাবে দর্শন করিতেন। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সবিতা। যে গায়ত্রী মন্ত্র বেদের শীর্ষস্থানীয় তাহা সবিতার ধ্যানমন্ত্র। সূর্য্যের ভ্রমণ-পথ আকাশে—অগ্নির মাহাত্ম্য ভূলোকে। অগ্নি আদিম আর্য্যদের গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই যজ্ঞদেব—তিনিই পুরোহিত। কিন্তু অগ্নি শীতপ্রধান দেশের বিশেষ উপযোগী, আদরের সামগ্রী। আর্য্যেরা যেমন দাক্ষিণাত্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিলেন ক্রমে অগ্নির মহিমা অস্তমিত হইয়া ইন্দ্রের প্রভুত্ব বিস্তার হইল। বৈদিক দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রদেব প্রধান আসন অধিকার করিলেন। কেননা এ অঞ্চলে উত্তাপ অপেক্ষা বারিধারার উপকারিতা অধিক। ইন্দ্র মেঘের রাজ্যে রাজত্ব করেন ও বৃত্রাসুর হনন করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করেন এবং পর্জ্জন্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বসুমতীকে ধন ধান্যে পূর্ণ করেন—এই তাঁহার মহিমা। এই ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ—উষা সোম—দেবজননী অদিতি আদিত্য—দ্যাবা পৃথিবী ইঁহারাই বৈদিক ঋষিদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন, ঋক্ মন্ত্র এই সকল দেবতার স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ। আর্য্যেরা এই দেবতাদিগকে যজ্ঞক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিতেন ও তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে প্রীতিভোজনে পরিতৃপ্ত হইলেন।

এই এক চিত্র! ব্রাহ্মণকালে আর এক চিত্র দৃষ্ট হয়। তখন দেখা যায় প্রাকৃতিক উপাসনার রূপান্তর ঘটিয়াছে—তখন যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণই পুরোহিত, ব্রাহ্মণাধিপত্যের সীমা নাই। ধর্ম্ম যে অন্তরের বস্তু তাহা কতকগুলি সারহীন অর্থহীন আড়ম্বরময় কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইল। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি এই সমস্ত ক্রিয়াজালে প্রচ্ছন্ন হইল। এই বিপর্য্যয় দৃষ্টে উপনিষদের ঋষিরা অরণ্যে গিয়া 'আরণ্যক' প্রচার করিলেন। আর এই সমস্ত জটিল 'বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়ায়' বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

বেদবেদাঙ্গ সকলি অপরা বিদ্যা—পরা বিদ্যা সেই যদ্দ্বারা সেই অবিনাশী সত্য পুরুষকে লাভ করা যায়।

তাঁহারা আরও বলিলেন

"যোবা এতদক্ষরমবিদিত্বা জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবৎ এব তদ্ভবতি।"

সেই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করা যায়—সে সকলি নিষ্ফল—অন্তবৎ।

এই সময়েই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—

ওঠো! জাগো! সৎগুরুর নিকটে গিয়া শিক্ষালাভ কর—পণ্ডিতেরা বলেন ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম।

এ কথা নিদ্রামগ্ন মনুষ্যদের জাগরণ-ডঙ্কা!

একালেও এই ডঙ্কাধ্বনি ধ্বনিত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সুগভীর ভেরীনিনাদ উত্থিত হইয়া অজ্ঞানান্ধ সুপ্তাত্মা সকলকে জাগ্রত করুক—এই আমাদের বাসনা—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আমরা এখনকার জনসমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাই?

এই যে ধর্ম্ম যে অন্তরের বস্তু তাহা কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিতে গেলে ধর্ম্ম কি? না গঙ্গাস্নান—তীর্থযাত্রা—জপ—মালাধারণ—গেরুয়া বসন পরিধান—ভস্মলেপন—শরীরশোষণ, কিন্তু এই সমস্ত উপকরণ কেবল ধর্ম্মের বহিরাবরণ মাত্র।

এই সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মের ফল কি? গঙ্গাস্নানে কি ফল যখন মনের মালিন্য ধৌত হইল না?

যখন অন্তরের পাপ সমানই জাগিতেছে—যখন পাপের পরিহার কার্য্যে বিরত হইয়া আমরা কতকগুলি অভ্যস্ত নামাবলী আবৃত্তি করি—সে মৌখিক প্রার্থনার কি ফল? বৌদ্ধদের প্রার্থনা-চক্র ঘুরানবৎ এরূপ প্রার্থনা পণ্ডশ্রম মাত্র।

চীনদেশে এই এক প্রথা আছে যে পাপ হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশে যাত্রীরা নিজ নিজ চরিত্রগত দোষাবলীর এক তালিকা পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করে। পুরোহিত সেই তালিকা অগ্নিসাৎ করিয়া অনুতপ্ত ভক্তকে অব্যাহতি দেন। আমরা কি মনে করি এ অনুতাপের কোন অর্থ আছে? না শিরোমুণ্ডন, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়? এই সমস্ত কৃত্রিম উপায়ে কি অন্তর্য্যামী পুরুষের নিকট হইতে পাপক্ষমা প্রত্যাশা করা যায়?

শরীরশোষণে কি লাভ? যতটুকু স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আমি তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাহি না কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উপোষণ গেরুয়া বসন ধারণ ভস্মলেপন—এই সকল সাধন ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট সাধন নহে।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের যে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইবার আবশ্যক করে না।

আমরা আসলের স্থানে কি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি?

সত্যের জ্যোতিতে ঝলসিত হইয়া আমরা ছায়া কল্পনা করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি।

সত্যস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা সেই "দেবদেব মহাদেবের' সিংহাসনে স্বহস্তরচিত মনঃ-

কল্পিত দেবদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করি—এইরূপে আমাদের পূজার্চ্চনা অপাত্রে নিয়োজিত হইয়া অশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

যদি বলিদানের সার্থক্য সম্পাদন করিতে চাও তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বার্থ বলিদান কর। যে সকল দুর্দ্দান্ত ঋপু আমাদের আত্মার শান্তি ও কল্যাণের বিঘ্নকারী তাহাদিগকে বলিদান দেও—প্রভুচরণে জীবন উৎসর্গ কর—কালীর নিকটে দারুণ জীবহত্যারূপ বলিদানে কোন ফল নাই।

এইরূপ মূঢ়তা অনাচারের অব্যর্থ ফল আত্মার অধোগতি। আমরা অন্তরে দৃষ্টি না করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি—ধর্ম্মের কঠিন ব্রত পালনে অক্ষম বলিয়া তাহার কতকগুলি নিরর্থক সহজ উপায় অবলম্বন করিতে যাই—সত্যের প্রতি আত্মাকে উন্নত না করিয়া সত্যকে আপনার সমকক্ষে টানিয়া আনিবার প্রয়াস পাই—সত্য সেই একই রহিয়াছে, ইহাতে আমাদের নিজেরই সমূহ ক্ষতি—দিন দিন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অবনতি হইতেছে—তাই বলি

ওঠো! জাগো! সদ্‌গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা কর, ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় কঠিন।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—ধর্ম্ম কি?

আসল ধর্ম্ম অন্তরের ধর্ম্ম—চিত্তবিক্ষেপকারী কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া কর্ম্মে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয় না।

আসল ধর্ম্ম—স্বার্থত্যাগ আত্মসংযম ইন্দ্রিয়দমন প্রেম ও ভক্তি, ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া আত্মাভিমান বর্জ্জন পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গীকরণ। প্রভুচরণে আত্মসমর্পণ।

এই সকল গুণ যাঁর অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যাঁর অচল নিষ্ঠা, তিনিই সাধু তিনিই আমাদের আদর্শ পুরুষ। চৈতন্যদেব রামমোহন রায় প্রভৃতি মহা মহা ধর্ম্মবীরদের উপর কেন আমাদের এত ভক্তি শ্রদ্ধা, এঁদের নাম কেন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়?

কেন না তাঁহারা সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া পরোপকার-ব্রতে ব্রতী ছিলেন; ঈশ্বর-প্রেমে তাঁদের হৃদয় পূর্ণ ছিল—বিষয়-সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রভুর কাজে প্রাণ দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না। সংসারপ্রলোভন তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই, তাঁহারা বিষয়-বাণে অক্ষত—মৃত্যু-ভয়েও তাঁরা ভীত ছিলেন না—প্রাণ দাতার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। এই হেতু তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকের আদর্শ-পুরুষ।

চৈতন্যদেব ভক্ত-শিরোমণি হইয়া বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-প্রেম ও ভগবদ্ভক্তি-রসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি নিজে যে প্রেমসুধাপানে মাতওয়ারা ছিলেন তাহা জগৎ সংসারে ঢালিয়া দিবার নিমিত্তে চব্বিশ বৎসর বয়সে গার্হস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকটে জাতিবিচার ছিল না—ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্য্য ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি ভ্রাতৃ-আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাই এ দেশে তাঁর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের এমন প্রাদুর্ভাব।

রামমোহন রায় সত্যের পিপাসু ছিলেন সত্য রক্ষার জন্য কি না করিয়াছিলেন? পরিবারের লাঞ্ছনা, লোকের গঞ্জনা, অশেষ প্রকার সাংসারিক উৎপীড়ন সহ্য করিলেন—গৃহত্যাগী হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিলেন, তাঁর লক্ষ্য সেই একই—সকল স্থান হইতে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে সার সত্য খাটি সত্য আহরণ করা। তাঁর সময়টা একবার মনে করিয়া দেখুন—তখন দেশের অবস্থা কি গাঢ় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল—পৌত্তলিকতা ও নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কারে প্রবল ব্রহ্মবিদ্যা বিলুপ্তপ্রায়—এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অশেষ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি আমাদের জন্য সনাতন সত্যধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মাতৃভূমির মঙ্গল কামনায় একাকী অসহায় মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই। তোমরাও বীরের ন্যায় তাঁহার সেই ধর্ম্ম-নিশান হস্তে করিয়া তাঁর সূচিত মার্গ অবলম্বন কর—তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। মনে রাখ যে, তিনি যে শুভ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা কায়মনে আমাদিগকে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি স্বহস্তে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন যাহাতে তাহা ভারবান ও ফলবান্ বৃক্ষরূপে উত্থিত হইয়া দিশি দিশি ছায়া বিস্তার করে তাহাতে আমাদের অবারিত শ্রম, যত্ন ও চেষ্টার যেন বিরাম না হয়। আমরা তাঁহার অমূল্য দানের উত্তরাধিকারী, যেন তাঁর অযোগ্য সন্তানের ন্যায় আচরণ না করি। তাঁর সেই মহাজীবনী আমাদের নব্য যুবকদের আদর্শস্থল, সেই স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত রাখিলে, আমাদের মুমূর্ষু হৃদয় নবজীবন লাভ করিলে, আমরা উৎসাহানলে নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিব।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর নামোল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁর সদ্যোবিয়োগে অশ্রু সম্বরণ করা সুকঠিন—বোধ করি সভাস্থ সকলে আমার এই মর্ম্মব্যথায় ব্যথী হইবেন। তাঁহার সহিত আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার অচলা ঈশ্বরভক্তি—তাঁর ধর্ম্মানুরক্তি দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা, দেশহিতৈষিতা আমরা অল্প বিস্তর সকলেই অবগত আছি। তিনিও আমাদের জন্য আদর্শ জীবনী রাখিয়া পরলোকবাসী হইয়াছেন—ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন এই আমার প্রার্থনা।

এই সকল মহাপুরুষেরাই আমাদের জীবনের আদর্শ ক্ষেত্র—ইঁহাদের জীবন-কাহিনী আমাদের জীবন-পথের পরম সম্বল। ইঁহারা, সংসার-সাগরতটে যে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তদ্দর্শনে অনেকানেক ভগ্নতরী দুর্ব্বলহৃদয় আতুর জনের মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—"প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" সদ্‌গুরুর নিকটে গিয়া শিক্ষা লাভে প্রবুদ্ধ হও" কিন্তু এস্থলে আমরা যেন একটী বিষয় ভুলিয়া না যাই।

গুরু আমাদের শিক্ষাদাতা কিন্তু গুরু ঈশ্বরস্থানীয় নহেন।

সদ্‌গুরু আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেন—পুণ্যপথ প্রদর্শন করেন—তাঁরা ঈশ্বরের পথপ্রদর্শক মাত্র—স্বয়ং ঈশ্বর নহেন।

কেহ বলিবেন—একথা বলা বাহুল্য—এ কথা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তাহা নহে। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই গুরু প্রথম বয়সে জ্ঞানদাতা বলিয়া ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হন, ক্রমে তিনি শিষ্যমণ্ডলীর চক্ষে দেবত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত

হইয়া আর এক প্রাণ ধারণ করেন। আমাদের চক্ষের সামনে এইরূপ কতকগুলি শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। তাই আমার ইচ্ছা আপনাদিগকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিই।

মনুষ্যবিশেষকে ঈশ্বরের অবতার কল্পনা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত-বিরুদ্ধ। অবতারবাদে এইটুকু সত্য আছে যে মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে—প্রতি আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব কিয়দংশে বিদ্যমান।

ঈশ্বরের আবির্ভাব সর্ব্বত্রই। বাহ্য প্রকৃতিক্ষেত্রে ঈশ্বরের আবির্ভাব—মনুষ্যের আত্মাতে তাঁর আবার স্পষ্টতর প্রকাশ, যাঁর যত জ্ঞান—যাঁর যত প্রেম—যাঁর যত স্বাধীন চিন্তা—সাধু চেষ্টা—যিনি যে পরিমাণে স্বার্থত্যাগ—আত্মাভিমান বিসর্জ্জনে সক্ষম তিনি সেই পরিমাণে দৈবশক্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন—আমরা তাঁহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ঐশী প্রতিভার পরিচয় পাই। এই হিসাবে ঈশা, মূসা, মহম্মদ, চৈতন্য—ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র—ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। এই সকল ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জগদুদ্ধারের জন্য সময়ে সময়ে উদিত হন কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের অধিকারী নহেন। সে হিসাবে আমরা সকলেই ঈশ্বরের প্রেরিত—ঈশ্বরের পুত্র—কেহই আমরা দেবপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত নহি। সে প্রসাদ সর্ব্বত্রই বর্ষিত হইতেছে—আমরা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে—অধিকার অনুসারে তাহার অল্প বিস্তর উপভোগ করি। মহা প্রতিভাশালী ধর্ম্মবীর কালেভদ্রে একটী আধটী দৃষ্ট হয় কিন্তু সে মহত্ত্বের বীজ প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত আছে; উপযুক্ত ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য কালে, উপযুক্ত জল বায়ু সেচনে সে বীজ অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়। জীবাত্মা ক্রমে জ্ঞানে, ধর্ম্মে প্রেমে উন্নত হইয়া—ঈশ্বরের ইচ্ছা সহিত আপন ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া প্রভুপদসন্নিধানে অগ্রসর হইতে পারে—তাঁর সহবাসজনিত বিমলানন্দ ভোগের অধিকারী হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ঈশ্বর মনুষ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—পিতা পুত্রের সম্বন্ধ—দাস প্রভুর সম্বন্ধ—উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ—আমাদের কোন মধ্যবর্ত্তী নাই। যেমন খৃষ্টধর্ম্মমতে ঈশা ত্রাণকর্ত্তা, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই—মুসলমান ধর্ম্মে যেমন মহম্মদ ঈশ্বরের একমাত্র রসুল অর্থাৎ প্রেরিত—তাঁহার সহায়তা ভিন্ন পরিত্রাণ নাই—সে রূপ কোন মধ্যবর্ত্তী পুরুষে আমাদের বিশ্বাস নাই। পুণ্য উপার্জ্জন করিতে হইলে আমাদের আত্মনির্ভর শিক্ষা করিতে হইবে—আমাদের নিজের যত্ন চেষ্টা অধ্যবসায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সহায়তা প্রয়োজনীয়। সত্যের পথ রাজমার্গ—ঈশ্বরলাভের জন্য বিশেষ কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই—কোন কুটাস্ত্র নাই। আমাদের নিজের যত্ন চেষ্টা ও পুণ্যবলে সেই পথে চলিতে হইবে—গুরু পথপ্রদর্শক মাত্র। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যদি কোন ব্যবধান থাকে ত পাপই সে ব্যবধান—পাপই আবরণ—সেই আবরণ উন্মোচন কর ঈশ্বর দেখা দিবেন—তাঁর প্রেমমূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া সাধককে পরিতৃপ্ত করিবেন। পুণ্যপথের পথিক হইয়া ঈশ্বরের দ্বারে আঘাত কর—নিশ্চয় সে দ্বার মুক্ত হইবে—প্রভুর

দর্শন লাভ হইবে। ভগবদ্ভক্তের হস্তে ভগবৎ-প্রসাদ অজস্রধারে বর্ষিত হইবে।

বলা হইয়াছে "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" সদ্গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও।

গুরুর নিকট হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিয়াছি?

এই যে,

"একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।"

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ঈশ্বরপ্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এই আমাদের বীজ মন্ত্র।

মনুষ্য-প্রীতি ঈশ্বরপ্রীতির প্রথম ধাপ। ভ্রাতার প্রতি যাঁর মমতা নাই তিনি পিতার ভালবাসার অধিকারী নহেন। মনুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ বিস্তার কর—ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে জীবনের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন কর—ঈশ্বরপ্রীতি লাভের সেই মুখ্য সাধনা। মৌখিক ভক্তিতে কোন ফল নাই—মৌখিক প্রার্থনার বল নাই—ধর্ম্মকে জীবনের সঙ্গী করিতে হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া ধর্ম্মনিয়মে চরিত্র সঙ্গঠন করিতে হইবে—তাহা হইতেই আমাদের মনুষ্যত্ব, তাহাতেই ইহলোকে সদ্গতি পরলোকে মুক্তিলাভ।

যদি ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম তাহা হইলে সেই পথে হাঁটা হাঁটির আবশ্যক কি?

এই প্রশ্নের উত্তর একটুকু প্রণিধান পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে সহজেই মনে উদয় হইবে।

প্রথম, আমাদের জীবনের প্রতি নিরীক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে জীবন এক সংগ্রামের ব্যাপার। এই জীবন-সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে। সংসার কোমল পুষ্পশয্যা নহে সংসার কঠোর রণক্ষেত্র। মানব সমাজের শৈশবাবস্থা হইতেই প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ—সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিলে আমাদের পদে পদে বিপত্তি। প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া অধীনে না আনিতে পারিলে প্রকৃতি আমাদিগকে পরাস্ত করিয়া মহা বিপদে ফেলে। কখন মহা ব্যত্যা আসিয়া আমাদের ঘর দ্বার ভগ্ন করিয়া দিতেছে—কখনো দুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যায়—জলপ্লাবনে দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায়—ভূমি কম্পে আমাদের প্রস্তরের বাসগৃহ তাসঘরের ন্যায় সহজে ভগ্ন চূর্ণ করিয়া ফেলে। আমরা বিজ্ঞানবলে এই দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিকে স্ববশে আনিতেছি—দেখুন জল বায়ু দাসের ন্যায় আমাদের পরিচর্য্যা করিতেছে—মরুভূমি শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হইতেছে—সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গরাজি অতিক্রম করিয়া তাহার উপর দিয়া আমরা দিব্য আরামে গতিবিধি করিতেছি—আকাশের বিদ্যুৎ আমাদের সম্বাদ বাহক ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। কিন্তু এই প্রকৃতির উপর জয়লাভেই আমাদের সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব হয় না।

আমরা যে মনুষ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছি সে সমাজে নানা বিঘ্ন বিপত্তি নানা দুঃখ ক্লেশ অমঙ্গলরাশি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে—এই সামাজিক রিপুদলকে বিদলিত করিয়া লোকসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বিধবার দুঃখমোচন—জনসাধারণে শিক্ষা বিস্তার—দেশভ্রমণে যে সমস্ত বিঘ্ন বাধা রহিয়াছে তাহা খণ্ডন করিয়া ভ্রমণপথ উন্মুক্ত কর—বিভিন্ন

জাতির মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ়বদ্ধ কর—দেখুন আমাদের সমাজে কত শত কুসংস্কার—কত উন্নতির প্রত্যবায় বিদ্যমান—সমাজসংস্কারকের হস্তে কত কাজ।

সমাজ ছাড়িয়া প্রতিজনে আপনার প্রতি দৃষ্টি করুন দেখিবেন আত্মোৎকর্ষ সাধনে কত যত্ন কত পরিশ্রম কত উদ্যমের আবশ্যক। পাপ-প্রলোভন অতিক্রম করিয়া সৎপথে চলিতে হইলে কত দুর্দ্দান্ত প্রবল রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়।

আমাদের প্রত্যেকের মনে কোন না কোন অসৎ প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে। প্রতিজনে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখুন আমরা কোন না কোন কুপ্রবৃত্তি কোন দুষ্য অভ্যাসের দাস। কেহ লোভপরবশ—কেহ কামাসক্ত—কেহ পানাসক্ত—কেহ ধনমদে মত্ত—কেহ বৃথা কৌলীন্য-অভিমানে অন্ধীভূত—কেহ আমোদপ্রিয়—কেহ আলস্যের অধীন। এই সকল মন্দ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস দমন করিয়া সৎপথ অবলম্বন করা আবশ্যক। আমরা কতবার সাধু প্রতিজ্ঞা করিতেছি কতবার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিপথে পদার্পণ করিতেছি। উত্থান পতন, আমাদের জীবনের গতিই এই।

এই ঘোরতর সংগ্রামে ধর্ম্মবলই আমাদের বল। ধর্ম্মনীতি সমাজসেতুর ধারণকর্ত্তা, আমাদের মনোবৃত্তি সকলের নিয়ন্তা। সমাজসংস্কার বল—জাতীয় ঐক্য সাধন বল—আত্মোৎকর্ষ সাধন বল—ধর্ম্ম এ সমস্তের ভিত্তিভূমি। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিজয় নিশান আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র বন্ধন। সেই পতাকা উড্ডীন করিয়া আমরা গম্য স্থানে অনায়াসে পৌঁছিতে পারি—জাতীয় উন্নতি, আত্মোন্নতি সাধন করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের মহোচ্চ শিখর অধিকার করিতে পারি—ইহজীবনে যাহা কিছু শ্রেয়স্কর কল্যাণকর ধর্ম্মের প্রসাদে তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।—এই হেতু দেখা যায় সমাজ-সংস্কারের মূলদেশে দাঁড়ায় ধর্ম্মসংস্কার—যার পত্তন রামমোহন রায় বঙ্গদেশে করিয়া গিয়াছেন ও পরবর্ত্তী মহাত্মাগণ যার উপর শোভন গাঁথুনি তুলিয়া আমাদের জন্য শান্তিনিকেতন প্রস্তুত করিতেছেন।

কিন্তু মনুষ্য স্বভাবতই দুর্ব্বল। এই ধর্ম্মযুদ্ধে কে আমাদিগকে বল দিবেন? অন্তরে বাহিরে নানা রিপু, কাহার প্রসাদে আমরা তাদের পরাজয় করিয়া কৃতী হইব? যিনি দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, তিনিই আমাদের সহায়। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরই আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধে নেতা। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও—সকল বিপত্তি প্রশমিত হইবে, সর্ব্বশুভকামনা সিদ্ধ হইবে। যদি সকল সংশয় আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় তথাপি আমাদের ভয় নাই কেন না ঈশ্বর আমাদের সহায়।

এতক্ষণ জীবন-সংগ্রামের কথা বলা হইল। আর একদিকে দেখুন—জীবন-যবনিকার ওদিক্ মৃত্যুর দিকটা অবলোকন করুন আবার ধর্ম্মের উপযোগিতা উপলব্ধি হইবে।

জীবন ও মৃত্যু এ পীট আর ও পীট। এক দিকে জীবনের সুখসৌন্দর্য্য—আনন্দ উল্লাস, অন্য দিকে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি, মৃত্যুর বিলাপ-ধ্বনি।

আমাদের এই জীবন কি ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর, সংসার কি অসার ক্ষণভঙ্গুর। আমরা এই পৃথিবীতে দুদিনের তরে আসিয়াছি, দুদিনের পরে অন্যত্রে গমন

করিতে হইবে। এই জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই—

"অদ্য রাজা কল্য দরিদ্র, অদ্য মহোল্লাস কল্য হাহাকার, অদ্য অভিনব বিকশিত পুষ্পতুল্য লাবণ্যযুক্ত, কল্য ব্যাধি দ্বারা শুষ্ক ও শীর্ণ। অদ্য রূপবতী গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যার সহিত মধুরালাপে দিনযাপন, কল্য তাহার মৃত দেহোপরি অশ্রুবর্ষণ!" অদ্য যে কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু খুবা জননীর নয়নমণি, পিতার বৃদ্ধ বয়সের নির্ভর যষ্টি হইয়া নবোদ্যমে নবোৎসাহে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন কল্য অকস্মাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া লোকান্তর গমন করিলেন—হায় হায় এই ত আমাদের অবস্থা—কে না বলিবে আমরা জীবনে মৃত্যুর মধ্যে বাস করিতেছি।

এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে থাকিয়া আমাদের কি সুখ? আমাদের শান্তি কোথায়? আরাম কোথায়? যেখানে যাই—যে দিকে দৃষ্টিপাত করি কেবলি পরিবর্ত্তন, সকলি অনিত্য! এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় সুখশান্তি কোথায় পাওয়া যায়? অনিত্যের মধ্যে নিত্য ধন কোথা? অস্থির চরাচরে কোথায় আমাদের ধ্রুবতারা? এই মৃত্যুর রাজ্যে অমৃতলাভ কিসে হয়? বুদ্ধদেবকে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল যে হে দেব! মৃত্যুর পরে আত্মার গতি কি হইবে? তিনি তার কোন সম্যক উত্তর দিতে পারেন নাই। বলিলেন "ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত—ও সব ভাবিয়া কি হইবে? পৃথিবীতে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ কর। আমি যে চতুঃ মহাসত্য নির্দ্দেশ করিয়াছি—দুঃখনিবৃত্তির অষ্ট মহামার্গ প্রদর্শন করিয়াছি সেই পথে চল তোমাদের মঙ্গল হইবে। ইহলোকেই তোমরা নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইবে।"

কিন্তু এ উপদেশে আমাদের মন প্রবোধ মানে কৈ? ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমরা গভীর অন্তর প্রদেশ হইতে বলিয়া উঠি

"যেনাহং নাহমৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।"

যাহাতে অমৃত লাভ না হয় তাহা লইয়া কি করিব? এই জীবনই কি আমাদের শেষ? মৃত্যুর বিয়োগই কি চির বিচ্ছেদ? ভালবাসার জিনিস চলিয়া গেলে তাঁর সঙ্গে কি পুনর্ম্মিলন হইবে না? ঈশ্বর কি আমাদের আত্মাতে একবার বিদ্যুতের মত প্রকাশিত হইয়া চিরকালের মত সরিয়া যাইবেন? তাহা কখনই হইতে পারে না।

আমাদের বিশ্বাস এই যে ঈশ্বরপ্রীতি ইহকাল পরকালের বন্ধনী। বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও পরকাল ছাড়িয়া ধর্ম্মস্থাপনে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন তাই তাহা আমাদের দেশে স্থায়ী হইল না। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম তার জন্মভূমি হইতে বিলুপ্ত হইল। ভগবদ্ভক্তি-বলে চৈতন্য বিজয়ী হইলেন—ভগবদ্ভক্তি বিহীনে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট হইল। এরূপ হওয়া বিচিত্র কি? সূর্য্য ছাড়িয়া মশালের আলোকে কি ভূমণ্ডল আলোকিত করা যায়, না কূপজল সিঞ্চনে বিস্তীর্ণ মরুভূমিকে ফলবতী ও শস্যশালিনী করা সম্ভবে?

এই মৃত্যুময় সংসারে অমৃতলাভ কি সে হয়? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন—তাহা ঈশ্বরপ্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে

অটল বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর আজ্ঞানুসারে জীবনের কর্ত্তব্য পালন।

এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে আমাদের কোথাও ভয় নাই—এই মৃত্যুময় সংসারে আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া পরম শান্তি লাভে সমর্থ হই। আমরা যেখানে যাই ইহলোক পরলোক তাঁরই মঙ্গল রাজ্য। সেই যে ভবপারাবারের পর পার—যদিও কোন যাত্রী সে দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া আমাদের বলিতে পারে নাই—তথাপি আমাদের স্থির বিশ্বাস এই—আত্মপ্রত্যয়ে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ইহকাল অনন্তকালের সোপান, এ পৃথিবী মধ্যপথের পান্থশালামাত্র—আমাদের সম্মুখে অনন্ত জীবন—অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম চিরদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন—তিনি আমাদের পরম পিতা, চির সখা। তাঁর অমৃত নিকেতনে লইয়া গিয়া আমাদের জন্য যে কি অমূল্য অক্ষয় ধন সঞ্চিত রাখিয়াছেন কে বলিতে পারে?

"কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন
মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে ভগবদ্ভক্তের কোন ভয় নাই—তিনি ঈশ্বরের প্রসাদে সংসার-রণক্ষেত্রে জয়লাভ করেন, মৃত্যুও তাঁহাকে ভয় দিতে পারে না—কেন না তিনি জানেন

"মৃত্যু সে অমৃত সোপান।"

এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া আমরা জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া মৃত্যুশয্যায় উল্লসিত চিত্তে নির্ভয়ে বলিতে পারি

"জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু,
নির্ভয় হইনু সখা হে,
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে
সহজে ত্যজিব এই দেহে।"

কৃষ্ণাবতার।

আমরা গতবারে রুক্মিণী হরণের কথা বলিয়াছি। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন নামে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণে আছে দৈত্য শম্বর সূতিকা-গৃহ হইতে ষষ্ঠ দিবসে শিশু পুত্র প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ করে। ভবিষ্যতে প্রদ্যুম্ন মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া শম্বরকে বিনাশ করেন এবং তদীয় ভার্য্যা মায়াবতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ঐ সকলের বিস্তারিত বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণাদিতে প্রাপ্তব্য। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের ২৯ অধ্যায়ে আছে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনায় ঐরাবত-পৃষ্ঠে দ্বারকায় আগমন করেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহেন, মধুসূদন! মুষ্টিক চানূর প্রভৃতি তাপসবিদ্বেষী দৈত্যগণকে তুমি সংহার করিয়াছ, কংস কুবলয়াপীড় বালঘাতিনী পূতনাকে বিনাশ করিয়াছ কিন্তু ভূমিতনয় নরক প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে থাকিয়া রাজকন্যাগণকে অবরোধ করিতেছে, বরুণের ছত্র হরণ করিয়াছে, এমন কি আমার মাতা দিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া গিয়াছে এবং আমার ঐরাবৎ হস্তী গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে তুমি ইহার প্রতিবিধান কর। শ্রীকৃষ্ণ এতৎশ্রবণে হাস্য করত দেবরাজের হাত ধরিয়া উত্থিত হইলেন। গরুড়কে চিন্তা করিবামাত্র গরুড় আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া গরুড়ারোহণে আকাশপথে নরকের পুরে গমন করিলেন। নরক কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু বলবান শ্রীকৃষ্ণ চক্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক নরককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পুত্রকে নিহত দেখিয়া ভূমি,

দিতির কুণ্ডল লইয়া জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি কুণ্ডল গ্রহণ করুন কিন্তু নরকের পুত্রগণকে রক্ষা করুন এই বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া নরকালয় হইতে রত্ন সমূহ গ্রহণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ষোড়শ সহস্র কন্যা দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদের সকলকেই দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। পরে বরুণের ছত্র ও অদিতির কুণ্ডল সঙ্গে লইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়পৃষ্ঠে ইন্দ্রপুরে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ ত্রিদশালয়ে গমন করিলে দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র লইয়া স্বর্গদ্বারে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ এইরূপ অর্চ্চিত হইয়া দেবরাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দিতিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেবরাজের সহিত দিতিকে প্রণাম করিয়া তদীয় কুণ্ডল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জগন্মাতা দিতি সাতিশয় প্রীতা হইয়া হরিকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়ঙ্কর
সনাতনাত্মন্ সর্ব্বাত্মন্ ভূতাত্মন্ ভূতভাবন

হে পুণ্ডরীকাক্ষ তুমি ভক্তগণের অভয়দাতা, তুমি সনাতন, তুমি সকলের আত্মা, তুমি ভূতগণের স্রষ্টা এবং তুমি সর্ব্বভূতময় তোমাকে নমস্কার ইত্যাকার কয়েকটি সুন্দর শ্লোকে দিতি কৃষ্ণের স্তব করিয়া উপসংহারে বলিলেন

এতৎ চান্যানি তে রূপং স্থূলচিহ্নোপলক্ষিতম্,
ন জানামি পরং যত্তে প্রসীদ পরমেশ্বর।

আমি তোমার স্থূল মূর্ত্তিই দেখিতেছি কিন্তু তোমার প্রকৃতরূপ অবগত নহি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদিগকে বর প্রদান কর। অদিতি কহিলেন তুমি সর্ব্ববিজয়ী হও। পরে সত্যভামা প্রণাম করিলে অদিতি কহিলেন তুমি স্থিরযৌবনা হও। পরে ইন্দ্রও অদিতির অজ্ঞানুসারে কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দন প্রমুখ দেবকাননে উপস্থিত হইলেন। তখন অনতিদূরে সুশোভন পারিজাত বৃক্ষ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে এই বৃক্ষটিকে আমার গৃহোদ্যানের নিমিত্ত দ্বারকায় লইয়া যাইতে হইবে। আমি পারিজাতমঞ্জরী কেশপাশে নিত্য ধারণ করিয়া সপত্নীগণের মধ্যে শোভমান হইব। নারীচরিত্র সকল কালেই সমান, পুরুষদিগের উপরে আধিপত্য সর্ব্বজনবিদিত। কৃষ্ণের এতগুলি স্ত্রী তথাপি সত্যভামার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষটিকে উৎপাটন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন, উদ্যানরক্ষকগণ বিষম গোলোযোগ আরম্ভ করিল, এবং ইহাও কহিল বজ্রপাণি ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে দেববৃন্দ তাঁহার অনুগামী হইবেন। অতএব সমস্ত দেবতাগণের সহিত বিবাদ আপনার কর্ত্তব্য নহে। সত্যভামা চিরপ্রথানুসারে তাহাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন এই পারিজাত বৃক্ষে ইন্দ্রের কি অধিকার। অমৃত মন্থনের সময় যদি ইহা উঠিয়া থাকে তবে ইন্দ্র কি নিমিত্ত ইহা একাকী ভোগ করিবেন। তোমরা শচীকে গিয়া বল সত্যভামা পারিজাত হরণ করিয়াছেন, তিনি যদি ভর্ত্তৃপ্রণয়িনী হয়েন ভর্ত্তাকে দ্বারকায় পাঠাইয়া প্রত্যাহরণ করুন।

বিজ্ঞাপন।

সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ১২ই পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬॥ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় আন্দুলে 'আত্মোন্নতি সভার' ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। অতএব ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৪২ ৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৮০৸৶৩
সমষ্টি	...	৮২৩ ৶৩
ব্যয়	..	৩১৩৷৯
স্থিত	...	৫০৯৸৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৯৸৬
৫০৯৸৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৪০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর, কলিকাতা ৩৲
„ রাজা রামেশ্বর মালিয়া, হাওড়া ৩৲
৬৲
পুস্তকালয় ... ৩৷৵০
যন্ত্রালয় ... ৯২৲
গচ্ছিত ... ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৷৷০
সমষ্টি ২৪২৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ২২৯৲৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৩৲৯
পুস্তকালয় ... ৷৷৵৬
যন্ত্রালয় ... ৬৭৷৷৵৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ২৸৵০
সমষ্টি ৩১৩৷৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

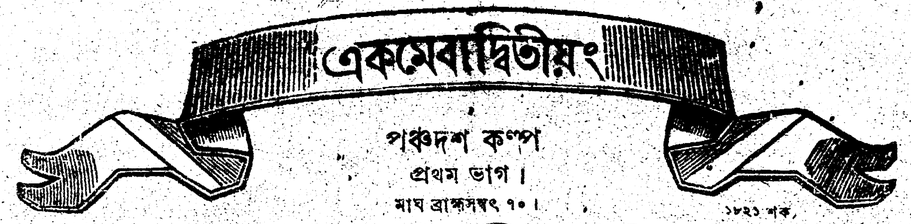

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০। ১৮২১ শক,

১৬০৮ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়		পৃষ্ঠা
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	১৫৩
শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব	... ...	১৫৪

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

নবম ১৮২১। কলিকাতা ১৮২১। ৩ মাঘ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৷৵০। ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কণিকা।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মূল্য আট আনা।

কথা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

(নূতন কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য এক টাকা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

প্রথম ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

১৮২১ শক

৫০৮ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০, ৭ পৌষ।

৭ পৌষ প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উষাকীর্ত্তনকারিগণ মহর্ষিদেবের এই দীক্ষার দিনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং ভবনস্থ প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন ও পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে উপাসনা সমাধা করিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। মহর্ষি এই সময়ে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদের সহিত যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই—

'আমি প্রত্যভিবাদন এবং শুভাশীর্ব্বাদের সঙ্গে তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা জানাইতেছি। অদ্য সেই ৭ ই পৌষ;—এই ভয়ানক শীতের অতি শীতল বায়ু অগ্রাহ্য করিয়া আজি তোমরা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত পল্লীকে এবং পল্লীবাসিদিগকে পবিত্র করিয়াছ, এ গৃহকে পবিত্র করিয়াছ! তোমরা যে সুমহদ্‌ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার উদ্‌যাপন নাই। এ ব্রত তোমাদের জীবনের ব্রত। সংসারের কোন বাধার দ্বারা এ ব্রত হইতে তোমরা বিরত হইবে না। যতদিন জীবন—ততদিন তোমরা দেশবিদেশে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিবে; তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।

তোমাদিগকে দেখিয়া আমি কি আনন্দ লাভ করিতেছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আমার বহিরিন্দ্রিয় সকল ক্রমেই শক্তিহীন হইতেছে; অন্তরের ভাষা প্রকাশ করিতে মনে মনে তর্জ্জমা করিতে হয়, ঠিক্ ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই অবস্থাতেই তিনি এখন আমাকে এখানে রাখিয়াছেন। তাঁহার যতদিন ইচ্ছা ততদিন রাখিবেন। আর ও একবৎসর যদি তিনি আমাকে এই ভাবে এখানে রাখেন, তবে আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা—তাহাতেই আমার আনন্দ! আমি তাঁহার সঙ্গে নিত্য সহবাসের আশায় সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়াই আছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৭০ ব্রাহ্মসম্বৎ।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। আমরা শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাভাতিক বায়ু সেবনে বহির্গত হইলাম। উদ্যানভূমি অতি রমণীয়। নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। আমরা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এই অবসরে পূর্ব্বদিকে অরুণরাগ দৃষ্ট হইল। তখন আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এক সহৃদয় বন্ধুকে কহিলাম—

উদেতি খলু ভানুমান্ বিমলপদ্মরাগদ্যুতিঃ
প্রভাভিরবভাসয়ন্ তিমিরগর্ভলীনং জগৎ।
অহোবত নিশাপতিঃ সমভিবীক্ষ্য তস্যোদয়ং
বিষাদতমসাবৃতোমলিনিমানমাপদ্যতে।

দেখ, নির্ম্মল-পদ্মরাগ-সদৃশ সূর্য্য অন্ধকারগর্ভে নিমগ্ন সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া কেমন উদিত হইতেছে। কিন্তু হায়! রাত্রিশেষের চন্দ্র সূর্য্যের এই উদয়* দেখিয়া যেন বিষাদের কালিমায় মলিন হইয়া পড়িতেছে।

চল, আর না, আমরা ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হই। পরেই মঠধারী স্বামীজী প্রকাণ্ড ঘণ্টারব সহকারে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধূপধুনার সুগন্ধ আশ্রম প্রদেশ আমোদিত করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ আমরা দলবদ্ধ হইয়া সমস্বরে 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দন গীতি গাহিতে গাহিতে নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত পথ দিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম।

পরে সকলে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গীত হইতে লাগিল। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

অদ্য শান্তিনিকেতনের মহোৎসব—ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দিন নিজের পূর্ণ আদর্শে, নিজের প্রকৃতিগত সত্যে মনুষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথম উন্মেষিত হইয়াছিল সেই দিনের এই ব্রহ্মোৎসব। অদ্য আমরা এই উৎসব-ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া শান্তির প্রদাতা পরব্রহ্মের স্তুতিরবে প্রভাতকে জাগ্রৎ করি; সে মহাস্তুতিরবে এই দিগন্ত-ব্যাপী বিশাল প্রান্তর নিনাদিত হউক, ব্রহ্মোপাসনার সুগন্ধি কুসুম আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া পরমাত্মার চরণপ্রান্তে নিপতিত হউক।

শান্তির নিকেতন যিনি, তিনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়া যে স্থান পবিত্র হইয়াছে, তাহাও শান্তি-নিকেতন। অধ্যাত্ম চক্ষে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে যে, যেখানে স্বীয় অব্যক্ত মহিমাতে হিরণ্ময় পরম কোষেতে ঈশ্বর বিরাজিত রহিয়াছেন সে কেমন নির্জ্জন, কেমন সত্য, কেমন শান্ত। আবার চর্ম্মচক্ষে অবলোকন কর, যে, জ্ঞান-যোগে, প্রেম-যোগে তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য যে স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই এই শান্তিনিকেতন কেমন নির্জ্জন, কেমন মনোনুকূল। ইহা নির্জ্জন পবিত্র ভূমি, ইহাই ঋষি তপস্বী জনের রম্য তপস্যা-ভূমি! প্রভাত সূর্য্য যখন নূতন রশ্মিতে ইহার দিগ্দিগন্ত সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে, যখন ইহার উদ্যানের পত্র সকল মর্ম্মরিত করিয়া মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং নেত্রোদ্ঘাটন করিবা মাত্র ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ও নিম্নে বিশাল প্রান্তর দৃষ্টি-পথে

* উত্থান ও শ্রীবৃদ্ধ।

পতিত হয়, তখন সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরম পুরুষের সহজ সুন্দর প্রেমের হিল্লোলে আত্মা স্নিগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতা-রসে পূর্ণ হয়। অতএব ইহার সদৃশ ব্রহ্ম-সাধনের, ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের অনুকূল স্থান আর কোথায় পাইব? যে সকল শান্ত পুরুষেরা—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ গৃহস্থেরা শ্রদ্ধার সহিত, তপস্যার সহিত নির্জ্জনে বসিয়া নিষ্কাম ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারা পুণ্যপাপবর্জ্জিত হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে সেই স্থানে গমন করেন যেখানে সেই অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, "উপনিষদ্ বিদ্যা-রূপ মহা ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ শর উপাসনার দ্বারা শানিত করিয়া তাহাতে যোজনা করিবেক। ব্রহ্মভাবনা-গতচিত্ত দ্বারা এই ধনু আকর্ষণ করিয়া, হে শিষ্য, সেই অক্ষর পরম পুরুষকে বিদ্ধ কর।" বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মও উপনিষদের সহিত সমস্বরে বলিতেছেন, "প্রণব ধনুস্বরূপ, জীবাত্মা শরস্বরূপ এবং ব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ; প্রমাদ-শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক।" এই জ্ঞান-প্রাণ-পূর্ণ জগতের মূলে, এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মার অভ্যন্তরে জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ সেই পরমাত্মা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ", সকলের প্রভু মহান্ পুরুষ। সেই মহান্ পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে জগতের নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব প্রকাশ পাইতেছে। যিনি ঈশ্বরকে পরম পুরুষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহার নিকটে তিনি অপ্রকাশিত রহিয়াছেন। কিন্তু যিনি তাঁহাকে জ্ঞানময়, প্রেমময় এবং ইচ্ছাময় বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তিনি এই জগতের মূলে তাঁহাকে নিয়ন্তারূপে এবং আপনার আত্মাতে প্রত্যেক শুভ বুদ্ধির মূলে তাঁহাকে নিয়ন্তা রূপে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গলভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্রশক্তি, সেই পরম পুরুষ, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ—তিনি জগতের নিয়ন্তা এবং আত্মার পরমাত্মা, পরম উপাস্য দেবতা।

তাঁহার দুই কার্য্য মহান্; এক আমাদের সম্মুখে অগণ্যগ্রহোপগ্রহমণ্ডিত অসীম আকাশ, দ্বিতীয় আমাদের অন্তরে অনন্ত উন্নতিশীল এই চিরজীবী জীবাত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে, হ্রস্বও নহে, দীর্ঘও নহে, কিন্তু সে কি সারবান্ বস্তু। এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে, এক বিন্দু আত্মার উপর যেন সমুদয় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না, আত্মার অভাবে শত শত সূর্য্য অন্ধকারময়। আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা, দুইই সেই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ অনন্ত পুরুষের আদর্শ। এই দুইয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্ত্তমান, আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁহার সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণরূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃত নিলয়ে গমন করি; সেখানে সাক্ষী রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই, যখন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন

রাজা, তেমনি তিনি আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্ম্মরাজ্যে আত্ম সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া ও পুণ্যের পুরস্কার দিয়া আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁহার করুণা নিভৃত আত্মাতে—তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যেমন তাঁহার সঙ্গে আমাদের এই নিগূঢ়তম কল্যাণকর সম্বন্ধ—পিতা-পুত্র যোগ, তেমনি সেই সম্বন্ধের গুণে, তাঁহার নিত্য উপাসনায় এইস্থানের এত মাহাত্ম্য, তেমনিই এই মহোৎসবের অবসর। অতএব আইস, হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, এখন আমরা সংসারের আর সকলই ভুলিয়া যাই এবং সেই প্রাণদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের হস্তে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিয়া এই নির্ম্মল প্রভাতে তাঁহার উপাসনা করি ও জীবনকে ধন্য করি।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বাভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যখ্যান পাঠ করিলেন।

"যিনি মহতো মহীয়ান আমরা ক্ষুদ্র হইয়া তাঁর কথা কি বলিব। জানি না তাঁর কথা কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায়ই বা শেষ করিব। এতক্ষণ যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া কৃতার্থ হইলাম তাহা ভারতের প্রাচীন ঋষিবাক্যে। যাঁহারা ধ্যানযোগে তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন সেই সকল প্রাচীন ঋষিগণের মহাবাক্যে। এখানে আমরা নিজের কথা কিছু বলিতে আসি নাই। এক্ষণে যে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব তাহাও ঋষিবাক্যে। যিনি এই নির্জ্জন প্রশান্ত তপোবনে ভগবচ্চিন্তায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, যাঁর কৃপায় এই ভারত আবার ব্রহ্মনামে জাগ্রত হইয়াছে, যাঁর এই মহতী কীর্ত্তি, তাঁরই অগ্নিময় মহাবাক্যে। ঋষিবাক্য প্রাচীন হইলেও চিরনূতন। সকলে ভক্তিসহকারে অবহিত হইয়া শুন, এতকাল যাহা পাও নাই ইহাতে তাহাই পাইবে।"

পরে ব্যাখ্যান পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

পরমাত্মা আনন্দ-ঘন। তিনি যে আনন্দ নিত্য উপভোগ করিতেছেন, যাহাতে অপরে সেই আনন্দের কণামাত্র ভোগ করিতে পারে, সেই জন্যই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন। প্রীতির ধর্ম্মই এই যে সে অপরকে সহভাগী করিতে যায়। আমরা যে আজ শান্তিনিকেতনের সুরম্য মন্দিরে বসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছি ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে কোন্ লক্ষ্য কার্য্য করিয়াছে? যিনি সাধনার বলে ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিয়াছেন, মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াই মুক্তির পূর্ব্বাভাস অবলোকন করিতেছেন, যিনি আত্মপ্রসাদের পূত সলিলে স্নাত হইয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন, তিনি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও আমাদের জন্য আজ ব্যাকুল। তিনি চান আমরা সেই পরম দেবতাকে জীবনের কাণ্ডারী করি। জীবন ও ধন তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদদত্ত অনুপম শান্তি-সুখ লাভ করি। তাই তিনি আপনার জন্য নহে, দূরে থাকিয়া কেবল আমাদেরই জন্য, এই উদাস প্রান্তরের ভিতরে এই সাধন-মন্দির বহুল অর্থে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইহা

হইতে ঈশ্বরপ্রেমীর হৃদয়ের আকুলতা, ব্রহ্মানন্দের অনুপম মাধুর্য্য—উহার অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য পরিমাণ কর।

আমরা সংসারের জীব, পার্থিব মলিন সুখ—রূপ যৌবনের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, ধন-ঐশ্বর্য্যের উপর যাহার ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি সামর্থ্য উৎসাহ অবসাদের উপর যাহার স্থায়িত্ব, জীবন ও মরণ বিক্ষোভিত জগতে আমরা তাহারই পিপাসু, তাহারই জন্য লালায়িত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-জন্য সুখ অপেক্ষা যে নির্ম্মলতর স্থায়িতর আনন্দের উৎস আছে, তাহা তিনিই জানেন, কাব্য সাহিত্য, জ্যোতিষ রসায়ন, ভূতত্ত্ব পদার্থতত্ত্ব যাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; বলিতে কি জ্ঞানের অনুশীলনে যিনি তৎপর, সংসারের বিপ্লবে তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত অনাহত।

এই পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ, তাহার মধ্যে বৈষম্যই বা কত। মুষ্টিভিক্ষার জন্য কেহ বা নিত্য-লাঞ্ছিত, শীতের নিদারুণ প্রকোপে কেহ বা প্রকম্পিত, কঠোর বাক্যবাণে কেহ বা মর্ম্মপীড়িত, অপমান অত্যাচারে ভীত শঙ্কিত, কেহ বা গৃহহীন সহায়-হীন, এমন এক কপর্দক নাই যাহাতে নিজ সন্তানকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে চিকিৎসার গুণে রক্ষা করিতে পারে, কেবলই হা হুতাশ ক্রন্দন বিলাপের অভিনয়—সংসারের এই ত এক দিক। অপর দিকে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য্য, বসন ভূষণের বৈচিত্র, ধনগর্ব্বের স্ফীতিভাব, ভোগসামগ্রীর পর্য্যাপ্তি ও হাস্যোল্লাসের কলরব; কি ভয়ানক বৈষম্য। যিনি এই অপ্রতিবিধেয় অসামঞ্জস্য কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য, হৃদয়ের কোমল বৃত্তির পরিচালনায় মুক্ত-হস্তে অন্ন-বস্ত্র অকাতরে দান করেন—আর্ত্তের মর্ম্মপীড়া দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, তিনিই ধন্য।

যখন সংসার-ক্ষেত্রেই আমাদিগকে বিচরণ করিতে হইবে, তখন আপাতপ্রতীয়মান বৈষম্যে বিপদের কষাঘাতে আমরা একেবারে অবসন্ন হইয়া না পড়ি, তাহার জন্য আমাদের পূর্ব্বসাবধানতা চাই, জ্ঞানের আলোচনা চাই, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষলাভের জন্য চেষ্টা চাই। যখন আমরা বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে নির্ম্মলতর জ্ঞানানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইব, জগতের কৌশল আলোচনা এবং তাহার মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইব, বিবিধ গ্রন্থে মনীষিগণের গবেষণার পরিচয় পাইতে থাকিব, তখন সে আনন্দের অবস্থা হইতে সংসারের প্রতিকূল তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। আমরা উচ্চতর জ্ঞানের আনন্দে সংসারের নিম্নতর রাজ্যের বিপদপাতের হস্ত হইতে অনাহত থাকিব, আমাদের মনের শান্তিকে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে না।

এই জ্ঞানের আলোচনায় সাংসারিক বিপদপাতের তীক্ষ্ণাগ্রকে বিকুণ্ঠিত করিবার সামর্থ্য জন্মিলেও, এই কালসাধ্য শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। তাই বলিয়া কি তাহাদের কোন আশা নাই। কালের ক্রীড়নক হইয়া সে চিরকাল কি সংসারসমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে? ঈশ্বরের রাজ্যে কি তাহার কোন প্রতিবিধান নাই? যিনি মঙ্গলস্বরূপ যিনি নিখিল জগতের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। যদি জ্ঞান-রাজ্যের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়া সে আনন্দ-স্রোতে সাংসারিক বিপর্য্যয়কে পরাস্ত করিবার সুবিধা না ঘটে আধ্যাত্মিক আনন্দের—

বিমলতম শান্তিবারির আগমন পথ অনাবৃত করিয়া দাও। সেখান হইতে যে মধুধারা ক্ষরিত হইবে তাহা হইতে সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণার নরকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, জগতের বৈষম্য-জনিত কষ্টক্লেশ তিরোহিত হইয়া যাইবে, অপার অসীম আনন্দে জগৎ-সংসার পরিপূরিত হইবে।

তুমি আজীবন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, জ্ঞানের উপদেশ দিতেছ, শুষ্ক জ্ঞানে তোমার জীবন নীরস হইতে পারে, কোন গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না পাইয়া তোমার চিত্ত অস্থির হইতে পারে, কাহাকেও তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবৃদ্ধ দেখিয়া তোমার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইতে পারে, তোমার অন্তরে যে জ্ঞান-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, উহার মধ্যে নাস্তিকতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ লোভ অভিমান অহঙ্কারের বিষবৃক্ষ আপনা হইতে জন্মিয়া তোমার জীবনকে অশান্তিময় করিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ সাধনা-বলে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হও, আত্মাফলকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে সক্ষম হও, তবে তাহা হইতে যে স্বর্গীয় শান্তিসুখ প্রাপ্ত হইবে, তাহার নিকটে কোথায় তোমার জ্ঞানের আনন্দ! কাব্য জ্যোতিষ আলোচনার তৃপ্তি! ইন্দ্রিয়-সুখ-জনিত আনন্দ ত দূরের কথা।

সেই জন্যই বলিতেছি সংসারের বৈষম্য দেখিয়া ভীত হইও না, এখানকার হাহাকারে ম্রিয়মাণ হইও না। তোমার অন্তরে এমন এক পদার্থ রহিয়াছে, যাহাকে সতেজ ও সবল করিতে পারিলে সংসারের তাবৎ অন্ধকার বিদূরিত হইবে, অন্তর্দ্দেশ পুলকে পরিপূরিত হইবে, নয়নাশ্রু বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে সর্ব্বাপেক্ষা বিমলতম সুখ বিমলতম আনন্দ বিমলতম শান্তি অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই আধ্যাত্মিক জগতের গুরু একমাত্র ঈশ্বর, তিনিই একমাত্র নেতা, তিনিই আমাদের শিক্ষা দীক্ষার পুরস্কার। প্রাতে সায়াহ্নে তাঁহাতে চিত্তের সমাধান কর। ধনী দরিদ্র সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই তিনি অভিগম্য। "প্রখরবুদ্ধি না পেয়ে সন্ধান আসে ফিরে তিনি হে অকিঞ্চনগুরু। ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে ধন-মান সকলই তাঁহাতে সঁপিয়ে।"

যিনি সাধারণের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-কামনায় নিভৃতে এই সাধনমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, তিনি চান আমরা সাধনাবলে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া জগতের বৈষম্য বিদূরিত করি, দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, আরণ্যক ঋষিদিগের ধর্ম্ম এদেশে প্রচার করি, জ্ঞানের সঙ্গে নীতির এবং এই উভয়ের সহিত ধর্ম্মের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই, ব্রাহ্মধর্ম্মর প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির অনুরূপ এইরূপ বিজন প্রান্তরে আসিয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করি।

পরমাত্মন্! এখানে আমরা নিজের কথা বলিবার জন্য আসি নাই, তুমি নিঃশব্দ বাণীতে নিরন্তর যে শিক্ষা ও উপদেশ এখানে ঢালিতেছ, তাহাই শ্রবণ করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। তোমার যে দৈববাণী শ্রবণে ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল আমরা তাহাই শ্রবণের জন্য ব্যাকুল। তোমার যে বিরাটমূর্ত্তি সন্দর্শনে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" আমরা তাহাই দেখিবার জন্য লালায়িত। আবিরাবির্ম্মএধি তুমি আমাদের নিকট

আবির্ভূত হও। বৈরাগ্যের কবচে আবৃত হইয়া তোমাকে চাহিতেছি তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। দীনভাবে তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি তুমি আমাদের অশ্রুজল মার্জ্জনা কর; অনন্যগতি হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি তুমি আমাদিগকে তোমার উদার ক্রোড়ে স্থান দাও; মুমুক্ষু হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি তুমি আমাদের কামনা পূর্ণ কর। তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমন্ত্রক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন।

ব্রহ্মমন্দিরের তোরণোপরি স্বর্ণাক্ষরে বেদোদিত মুক্তির উপদেশ খোদিত। অনেকে ঊর্দ্ধমুখে নির্নিমেষে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল দলবলসহ নিম্নোক্ত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্যান প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন।

(তেওট) গাও আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মনাম।
যে নামের গুণে হবে পূর্ণকাম।
সরল ব্যাকুল অন্তরে, পিতা পরমেশ্বরে,
ডাক অবিরাম; সশরীরে প্রবেশিবে স্বর্গধাম।
(খয়রা) বসি যোগাসনে, স্তিমিত লোচনে,
কর ব্রহ্ম দরশন; (শান্তিনিকেতনে) সেই চিদানন্দঘন, প্রাণরমণ, যোগীহৃদয়রঞ্জন। (অপরূপরূপ) অনন্ত সুন্দর, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি; যাঁহার পরশে,
প্রেমানন্দরসে, উথলে হৃদয় মাতি।
(যোগানন্দরসে)
(ছুটকি) জড় জীব নরে, দেবতা অমরে,
করে যাঁর যশোগান; সেই প্রাণসখা আছেন অন্তরে—হইয়ে প্রাণের প্রাণ। বিলাস লালসা,
বাসনা পিপাসা, মিছে আশা পরিহরি; হও শুদ্ধচিত, শান্ত সমাহিত, শান্তিরস পান করি।
(খয়রা) এস ভাই, চল যাই, সবে মিলে শান্তিনিকেতনে।
অন্তরে বাহিরে, হেরি প্রাণভরে,
প্রাণারাম নিরঞ্জনে।
ভুলে ভেদাভেদ জ্ঞান, বৃথা অভিমান রে;
প্রেম আলিঙ্গনে বাঁধ জগদ্বাসী জনে।
জ্বলে ব্রহ্মজ্যোতি প্রতি জীবনে জীবনে;
দিব্যজ্ঞানালোকে দেখ, দেখ প্রেমনয়নে।
মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দে, নাম সঙ্কীর্ত্তনে;
বিতর প্রেম পুণ্য শান্তি নিখিল ভুবনে।

এবারে উদ্যানভূমিতে ইষ্টকনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত একটী গৃহ দেখিতে পাইলাম। তাহা ব্রহ্মবিদ্যালয়। তাহার সোপানে পূর্ণকুম্ভ। নানাবিধ পত্র পুষ্পে তাহার শ্রী সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ দিন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা হইবে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এইরূপ কহিলেন—

"প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া এক্ষণে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। এদেশে ব্যায়াম শিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি আছে, কিন্তু যেখানে অধ্যাত্মবিদ্যা অধীত হইতে পারে, এরূপ কোন স্থান নাই। নিরবচ্ছিন্ন

শরীর লইয়া মনুষ্য নহে, মনের উন্নতি সাধনও মনুষ্যের পক্ষে তাবৎ নহে, আত্মার উন্নতি চাই। এই এক আত্মার উন্নতি সাধনেই মনুষ্যের দেবত্ব স্থাপিত হইতে পারে। শরীর মন ও আত্মা লইয়াই মনুষ্য। আমরা দেখিতে পাই বিদ্যা দুই প্রকার, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। এই অপরা-বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে পরা-বিদ্যার আলোচনা চাই, তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। বিষয়-সুখে মনুষ্যের তৃপ্তি নাই, কেবলমাত্র জ্ঞানের আলোচনায়ও শান্তি লাভ হইতে পারে না, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে ঈশ্বরলাভেই প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে। "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা"

কিন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে সৎগুরুর নিকটে যাওয়া চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মেও আছে "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাইবার জন্য গুরুর নিকট গমন করিবেন; গুরু ও সেই অনুরাগী শিষ্যকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন। সেই জন্যই এই অনুকূল স্থানে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, এবং যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে।

এদেশের শাস্ত্র নিচয়ে আধ্যাত্মিক সত্য প্রচুর পরিমাণে নিহিত। প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের জন্য অক্ষয় অমূল্য সম্পত্তি বেদ উপনিষদের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমুদায়ের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় সত্য সম্বন্ধে অগ্রে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে পরে বিদেশের সত্য আলোচনা করা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টাধর্ম্মাবলম্বীগণ মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করেন, মুসলমানেরা মহম্মদকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং বাইবেল ও কোরাণকে এই দুই সম্প্রদায় আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য দেশ কাল বা মনুষ্য বিশেষে আবদ্ধ নহে। বৌদ্ধগণ নীতির উপরেই আস্থাবান কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহারা সন্দিহান। কিন্তু আমরা বলি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে না নীতি দাঁড়াইতে পারে, না প্রকৃত শান্তি লাভ হইতে পারে, না আমাদের অন্তরে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে তাহা চরিতার্থ হইতে পারে। সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব এত অধিক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা এবং প্রচারের জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র; তাঁহার নিকটে সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হইল; এক্ষণে ইহার দ্বার সাধারণের সমক্ষে উৎঘাটন করিবার ভার আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রমুক্ত করিয়া দিলাম। ইহার উপরে তাঁহার প্রসাদবারি অবতীর্ণ হউক, এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সংসিদ্ধ হউক। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের এই সাধু-সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করুন।

আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সপ্তপর্ণ মূলে উপস্থিত হইলাম।

তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত একটী সাধন বেদি আছে। বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইবামাত্র তদুপরি যেন এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলাম এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিলাম;

কোঽয়ং পদ্মপরাগপিঞ্জরবপুর্লাবণ্যবারাংনিধি-
র্মেধ্যৈর্মূলফলৈরযত্নসুলভৈঃ সংপ্রাপ্য প্রাণস্থিতিং।
প্রেয়া কস্য পিনদ্ধচীরবসনোকাং সিদ্ধিমুদ্দিশ্য বা
নিঃসঙ্গো নিভৃতে বিরাগপরমো যোগাসনং সেবতে।

পদ্মপরাগকান্তি লাবণ্যের সমুদ্র এই মহাপুরুষ কে? ইনি অযত্ন-সুলভ পবিত্র ফলমূলে দেহধারণ পূর্ব্বক কাহার প্রেমে চীরবাসা হইয়া এবং কোন্ সিদ্ধির উদ্দেশে এই নিভৃত প্রদেশে নিঃসঙ্গ ও বিরাগী হইয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন।

ঐ ধ্যানস্তিমিতলোচন মহাপুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হইল এবং মনে মনে তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সমস্বরে সকলে 'কর তাঁর নাম গান' এই গানটী গাহিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। যাঁহার যথায় ইচ্ছা তিনি তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমিও একাকী উদ্যানের ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম এক একটী স্তম্ভোপরি কোথাও বেদমন্ত্রের একাংশ, কোথাও ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্পাংশ। স্থানে স্থানে ছায়াবহুল বৃক্ষমূলে সাধনবেদি এবং তন্নিকটে স্তম্ভোপরি খোদিত বৈরাগ্য সঙ্গীত। এই সমস্ত মন্ত্র ও বৈরাগ্য সঙ্গীতের এমনই প্রভাব যে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে সহজেই সমস্ত ভোগ ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয় এবং মন ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি এক সুচ্ছায় বেদিতে বসিলাম এবং সম্মুখস্থ স্তম্ভে একটী বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া কহিলাম

ব্রহ্মন্ নেচ্ছামি ভূতিং ন খলু দিনপতের্নাপি চাস্ত্রীং নচৈন্দ্রীং,
কর্ম্মারব্ধোহি ভোগঃ ফলতি সুকৃতিনাংভ্রশ্যতে চাপি কালে।
দাসস্তুৎপাদপদ্মেকুহনিহিতমতির্যাচতে সর্ব্বকালং
ধ্যাতুং তে প্রেমমূর্ত্তিং কথিতুমবিতথাং কীর্ত্তিগাথাঞ্চ দেব।

হে দেব! আমি ইন্দ্র চন্দ্রাদির ঐশ্বর্য্য চাহি না, কারণ সুকৃতিমানদিগের ঐশ্বর্য্য-ভোগ কর্ম্মাধীন এবং কালে তাহা নাশ হইয়া যায়। আমি এক্ষণে তোমার পাদপদ্মে মতি রাখিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যেন সর্ব্বকাল তোমার প্রেমমূর্ত্তি ধ্যান ও তোমারই কীর্ত্তি গুন করিয়া বেড়াই।

ক্রমশঃ স্নানাদির সময় হইয়া আসিল। আমি কূপোদকে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া লইলাম এবং সোপান পরম্পরা দিয়া সাধন-শৈলে গিয়া উঠিলাম। আহা কি মনোরম স্থান। তথায় সতত সুনির্ম্মল বায়ু বহিতেছে এবং বৃক্ষে পক্ষিদিগের অব্যক্ত মধুর কোলাহল শুনা যাইতেছে। তথায় গিয়া এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের মূল আশ্রয় করিলাম। আমার মস্তকোপরি সুনির্ম্মল আকাশ, দূর হইতে সুদূরে প্রসারিত এবং নিম্নে বিস্তীর্ণ মাঠ। উহা উচ্চ নীচ বলিয়া তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি তখন অনেকটা উচ্চ ভূমিতে আরূঢ়, তন্নিবন্ধন সহজেই মনে এই ভাবোদয় হইল।

কুতশ্চিৎ সংস্থানাৎ ঘনতিমিরগাঢ়ব্যতিকরৈঃ
সুদূরেক্ষ্যাৎ ক্ষিপ্তোন্যপতমহমস্মিন্ জলনিধৌ।
তৃষার্ত্তঃ সংক্ষোভাদমৃতমিতি মত্বাঽদ্ধিতধিয়া
অপামন্তর্লীনং গরলমুপভুঞ্জেঽঞ্জলিপুটৈঃ।

হা! আমি ঘনান্ধকার সম্পর্কে নিতান্ত অলক্ষিত কোনও স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি, এবং পতন-ক্ষোভ বশত অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অন্ধ বুদ্ধিতে অমৃত বুঝিয়া অঞ্জলি

অঙ্গুলি কেবল জলের অন্তর্লীন গরলই পান করিতেছি। এই ভাবিয়া কিছু আকুল হইয়া উঠিলাম এবং শান্তিলাভের জন্য ব্রহ্মে মন সমাহিত করিলাম।

ইত্যবসরে অতিথিবৎসল দ্বিপেন্দ্র বাবুর হাঁক ডাক পড়িয়া গিয়াছে। আহার প্রস্তুত। তাঁহার সর্ব্বতঃপ্রসারিণী দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া কাহারও কোথাও থাকিবার যো নাই। লোক আসিয়া কহিল বাবু ডাকিতেছেন। কি করি দ্বিপেন্দ্র বাবুর আহ্বান। গাত্রোত্থান করিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরকে কহিলাম

চিত্তং হৃতং নু ভবতা ভুবি ভোগমূলং
তেনাত্যজং বিষয়জন্মসুখং হি ভূমন্।
পাদৌ পদং ন চলতস্তরুপাদমূলাৎ
কিং ভো ব্রবীমি বিবশোস্মি তবানুবৃত্ত্যা।

হে ভূমন্, পৃথিবীতে ভোগের মূল মনকে তুমিই হরণ করিয়াছ সেই কারণে আমি সমস্ত বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। এক্ষণে এই বৃক্ষের পাদমূল হইতে আমার পদদ্বয় এক পদও চলিতেছে না, বলিব কি, আমি তোমারই অনুবৃত্তিতে একান্ত বিবশ হইয়া পড়িয়াছি।

পরে আহারান্তে কিছুক্ষণের জন্য সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

এ দিকে যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অভিনয়ের বিষয় কবিগুরু বাল্মীকি। তিনি প্রথমাবস্থায় দস্যু ছিলেন। তাঁহার নাম রত্নাকর। রত্নাকর স্ত্রীপুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য অরণ্যে দস্যুবৃত্তি করিত। একদা একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র লইয়া দিবা দুই প্রহরে বন দিয়া যাইতেছিলেন। রত্নাকর তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লগুড় হস্তে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে কহিলেন দেখ ব্রহ্মহত্যা করিয়া পাপভাগী হইও না। রত্নাকর কহিল কিসের পাপ, আমি এইরূপ হত্যা করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিয়া থাকি। যাহাদের জন্য এইরূপ করিয়া থাকি, বলিতে কি, তাহাদেরই এই পাপ। ব্রাহ্মণ কহিলেন ভাল, আমরা এই স্থানে থাকিয়া তোমার প্রত্যাগমনকাল অপেক্ষা করিতেছি, তুমি জানিয়া আইস, তোমার স্ত্রীপুত্র তোমার এই পাপের ভাগী হইবে কি না। তখন রত্নাকর গৃহে গিয়া সকলকে কহিল আমি মনুষ্যহত্যা করিয়া তোমাদেরই প্রতিপালন করিতেছি সুতরাং তন্নিবন্ধন যা কিছু পাপ তাহা তোমাদেরই হইবে। তখন তাহারা কহিল দেখ তুমি আমাদের আশ্রয় আর আমরা তোমার আশ্রিত, তুমি যে কোন উপায়ে আমাদের ভরণপোষণ কর তন্নিবন্ধন পাপপুণ্য তোমারই হইবে, আমরা কেন তাহার অংশী হইব। রত্নাকর এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইল এবং অবিলম্বে অরণ্যমধ্যে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ঠাকুর, আমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কেহই আমার এই পাপের অংশী হইতে চাহে না। এক্ষণে আমার মোহ অপনীত এবং মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর আর আমি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইব না, আপনি নির্বিঘ্নে চলিয়া যান। এই দস্যু রত্নাকরই ভবিষ্যতে মহাকবি বাল্মীকি। যাত্রায় তাহারই অভিনয় হইয়াছিল। আমরা অনেক ক্ষণ তাহা দেখিতেছিলাম, ইত্যবসরে, মনাংসি বংশিধ্বনিনা জহার, কোথা হইতে বংশীরব আসিয়া সকলের মন হরণ করিল। গিয়া দেখি অদ্ভুত ব্যাপার।

কএকটা সচ্ছিদ্র বাঁশের বাঁশরী হইতে অতি মধুর রাগরাগিণী বাহির হইতেছে এবং এক জন সাত আট খানা খঞ্জনী লইয়া কখন ভূমিতে কখন মস্তকে কখন বক্ষে ও কখন বা উরুদেশে তাহা ঠুকিয়া ঠুকিয়া অতি সুলয়ে সঙ্গত করিতেছে। অবাক হইয়া অনেক ক্ষণ তাহা শুনিতে লাগিলাম।

ঐ সময় উদ্যানের বহিঃপ্রদেশ লোকে লোকারণ্য। নানাবিধ দোকান পসার বসিয়াছে। কোথাও নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বালকেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। কোথাও নানারূপ সুশোভন কৃত্রিম ফলপুষ্প বিক্রয় করিবার জন্য আনীত হইয়াছে। এইটী বস্তুতই আনন্দবাজার। লোক জন কত দিকে কতরূপ ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে। কেহ হাসিতেছে কেহ নাচিতেছে, কোথাও অনেকে দলবদ্ধ হইয়া গাহিতেছে, সকলেই যেন আনন্দে উন্মত্ত। ইতর ভদ্র সকলেই এক স্থানে মিলিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য।

উদ্যানের ভিতর স্বামীজী একস্থলে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে লোক। তিনি সাধারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে আরও কএক জন উত্থান করিলেন এবং উচ্চস্বরে বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করিতে লাগিলেন। সেদিনকার প্রচারকদিগের উৎসাহ অতুলনীয়। তখন চতুর্দিকে খুব জনতা। উৎসব দর্শনের জন্য চারিদিক হইতে লোকসমাগম হইতেছে। কি উৎসাহ! কি ঘোর কলরব!

ক্রমে রক্তচ্ছবি সূর্য্য অস্তমিত হইল। গাঢ় অন্ধকার অল্পে অল্পে চতুর্দিক আবৃত করিয়া ফেলিল। অন্ধকারে নক্ষত্র সকল আকাশে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি ঊর্দ্ধে নক্ষত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সহচরকে কহিলাম

যোজন্মস্থিতিভঙ্গকারণমজো যোনিস্বভাবানভি-
ব্যাপ্য প্রোজ্ঝিতসর্ব্বসঙ্গসুখিতো বিশ্বং প্রশাস্তি স্বরাট্।
তস্যেয়ং লিখিতা বিভাতি পুরতঃ সৎকীর্ত্তিবর্ণাবলী
তারাস্তোমমিষেণ সংশয়জুষামুন্মেষণার্থং হি খে।

যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ও জন্মরহিত যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে ব্যাপ্ত ও সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জিত হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছেন, ঐ দেখ, সংশয়ীদিগের জ্ঞানলাভের জন্য তারা-সমূহ-ছলে যেন তাঁহারই সৎকীর্ত্তি বর্ণাবলী নিখিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সুপ্রশস্ত কাচময় গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মঠাধ্যক্ষ স্বামী জী সাধকের মন পুলকিত করিয়া ঘন ঘন ঘণ্টা রবের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য লোকের ভিড় ভেদ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে সঙ্গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"অনুকূল স্থানে অনুকূল ভাবের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি; হৃদয়ের বদ্ধভাব বিদূরিত করিবার জন্য আজ আমরা সমাগত। মুক্ত গগনের নিম্নে উদাস প্রান্তরের ক্রোড়ে সমাসীন হইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলে, অনন্তের ছায়া এখনও কি আত্মাতে প্রতি-

ভাত হয় নাই। তরুণঅরুণের রক্তালোকে পূর্ব্বগগন উৎভাসিত দেখিয়াছ, মহান ও শান্তভাব কি হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। অদ্যকার সঞ্চরমান বায়ুহিল্লোলে তাঁহারই পবিত্র নিশ্বাস সমীরিত—ইহাতেও কি ব্রহ্মসংস্পর্শ অনুভব করিতে পার নাই। ব্রহ্মের মঙ্গলগীতে আজ চারিদিক মুখরিত—ইহাতেও কি আত্মার মোহনিদ্রা বিদূরিত হয় নাই। এখন আবার সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যে অবস্থান করিতেছ, ইহাতেও কি হৃদয়দেশ স্তব্ধ পুবকে পরিপূরিত হয় নাই। এই অসীম শূন্যের ভিতরে আসিয়াছ, বৈরাগ্যবহ্নি কি অন্তরে সমুজ্জ্বিত হয় নাই। স্তম্ভে স্তম্ভে মৃতসঞ্জীবনমন্ত্র সঙ্গীতকণা খোদিত দেখিতেছ, ইহাতেও কি আত্মার বলাধান হয় নাই। ঐ দেখ 'শান্ত উপাসীত' শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর এই মহামন্ত্র ব্রহ্মধ্যানে প্রস্তুত হইবার জন্য ডাকিতেছে। "ব্রহ্মাভয়ং" ঈশ্বরের অভয় মঙ্গলমূর্ত্তি বরাভয় দান করিবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, উত্থান কর, জাগ্রত হও, দিবারাত্রের পবিত্র সন্ধিক্ষণ এই অমৃত বেলা চলিয়া যায়। চির-অনুরাগের সামগ্রী সেই অতি প্রাচীন আর্য্য কুলদেবতা, যাঁহার আশীর্ব্বাদ বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইতেছে, আজ তিনি এখানে বর্ত্তমান। কৃতজ্ঞতার গুরুভারে তাঁহার চরণে অবনত হও, প্রীতি ভক্তির বিমল উচ্ছ্বাস তাঁহার চরণে ঢালিয়া দাও। বৈদিক সিদ্ধমন্ত্রে পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ কর। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের প্রীতিপূজা গ্রহণ করুন।"

পরে সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

"ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্য্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমুদয় যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি? বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায়—সূর্য্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্য্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির—এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্য্যজাতির মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই? তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায় মনে বাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি,
নচেৎ ইহাবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ;

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে মহতী বিনষ্টিঃ, মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তৎ বয়ং—
নচেৎ অবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ—

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন—আমরা অবিশ্বাস করি না—কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং

"সুকেশাচ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়নী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ—

সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম্ম এক, ব্রহ্ম এক;—যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্ম্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি; এখানে তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়—নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ তবে বিনয়ের সহিত শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে। সত্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্ম্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্পপিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা,—হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট, লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা, পান করিয়া যাও! আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সঙ্কীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্য্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অন্ধ অন্ধকূপই আমাদের মত ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ

জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন তথাপি ভূমৈব সুখং ভূমাই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং—যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোকরহিত—য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি ইঁহাকেই যাঁহারা জানেন তাঁহারাই অমর হন—অথ ইতরে দুঃখমেব অপীয়ন্তি, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখ শোকের নির্ব্বাপন সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখ নির্ব্বাপনের, মুক্তি লাভের অন্য যে কোন উপায় আরও কঠিন—কঠিন কেন, অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন—তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন অতি সহজ হয়—তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্ব্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,—

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্য মনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙ্‌মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। আমরা ত সংসারের সঙ্কীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি,—আমরা জানি সংসারের "স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি," সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ—সকলেরই মধ্যে ভয় দুঃখ ক্লেশ জরা মৃত্যু বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে;—অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন—স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ তিনি সংসার, কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার, কাল, ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে ত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল—তবেত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বৈক্যং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না সেই জন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই তাঁহারা উপনিষৎ-কথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্‌ন বিভেতি কদাচন

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন,

যৎবাচা নভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে,
তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে—

যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্,
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে—

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃতলাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা আন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদচ, যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ—

"তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে, তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে। শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম তাহার মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরী তীর্থযাত্রীর জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে দেখা গিয়াছিল ভাসমান মৃতদেহের মধ্যে অনেকগুলি রমণী আপন সন্তানকে বক্ষের মধ্যে দৃঢ়বাহুপাশে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে; যে মাতৃস্নেহ প্রলয়-বিক্ষুব্ধ অকূল সমুদ্রের মৃত্যুবিভীষিকার মধ্যেও আপনাকে জয়ী ও জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করে, সেই মৃত্যুঞ্জয় স্নেহের পূর্ণ পরিচয় কোন সন্তান প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মের মধ্যে পায় না—অথচ সেই অসম্পূর্ণ পরিচয়ের অন্তরালে অপরিমেয় মাতৃস্নেহের একটা আভাস সন্তানের মনে অলক্ষ্য ভাবেও বিরাজ করিতে থাকে। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং

আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে, তাঁহা হইতে বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ, বাক্য তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসে—এবং মাতৃ-অঙ্ককামী শিশুর মত ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোন ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া ঋষিবাক্য অমান্য করিয়া ব্রহ্মলাভের সহজ উপায় স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন তাঁহারা একথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া মানিয়া লইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে—সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনন দ্বারা জানা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ একথা স্বীকার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ নহে—এমন কি, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্ত্তির রূপ ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য কারণ, স বৃক্ষ কালাকৃতিভিঃ পরোন্যঃ তিনি সংসার হইতে কাল হইতে সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেই জন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবংশান্তিমত্যন্তমেতি অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়; অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় ত ভাল, যদি না হয় তবু সত্য বই গতি নাই। পৃথিবী কূর্ম্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়, তথাপি বিজ্ঞান-পিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরু প্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমান ক্ষুধার্ত্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ—কিন্তু সে বলে আমিত সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই—সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসার মধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্ম পিপাসা মিটাইতে চাই তখন মরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না—যত দুর্লভ হউক্ সেই পিপাসার জল—আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই—তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার বাক্য মনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্ম্মপথ ত সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ ত সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—না উঠিলে না জাগিলে এই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম দুরত্য পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না, আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না—এবং ব্রহ্মাণ্ডের ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ, বিত্তলাভ, যশোলাভ সহজ না হয়,—তবে ধর্ম্মলাভ, সত্যলাভ, ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে! কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, খনি অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রম গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালমন্দ সুন্দর কুৎসিত অন্তর বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য? তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তান সূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন মনু বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন; এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞান নিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন, এবং যদ্‌যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন;—অতএব মনুর অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে, কেবল জ্ঞানে নহে, কর্ম্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দ্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোন প্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে একথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতাপুষ্পপল্লব পশুপক্ষীমনুষ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই—এক মহাপ্রাণের অনন্তকম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুলবিচিত্র বিশ্বসঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দ্দেশ্যতা অনির্ব্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিঃশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না, আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্ব্বাঙ্গের বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিঃশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না, আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্ত্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্ত্তী বাষ্পাণুর প্র-

ত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনও মূর্ত্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে, অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্ত্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি—

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্ব্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ দরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি—

কিন্তু যখন তিনি ইঁহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয় প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কি বলিবার আছে? তিনি আছেন একথা যখনি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—তখনি যথার্থতঃ বুঝিতে পারি যে, আমি আছি, বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই, আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথ নভোমণ্ডলের নক্ষত্র পুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না, তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্য্যে উদ্গীত হইয়া উঠে—ওঁ,—একটি বাক্য শুনিতে পাই—অস্তি, তিনি আছেন—এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎ চরাচরের, সমস্ত কার্য্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান্ অস্তি শব্দকে কোনও আকারের দ্বারা মূর্ত্তি দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে তিনি আছেন? আমি আছি এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ তিনি আছেন এ কথা কি তাহা অপেক্ষাও সহজ নহে? তিনি আছেন এ কথা না বলিলে আমি আছি এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে তিনি আছেন, সাকার মূর্ত্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর কিছু দিতে পারে।

অনেকে বলেন, দুর্ব্বল মানবপ্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়; আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানবপ্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই মনু গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি বিত্তপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্ম্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের এইরূপ মহত্ত্ব সাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন—মানবপ্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই—ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্র পরাইয়া অন্ন নিবেদন করিয়া আমাদের কর্ম্ম চেষ্টার কোন মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্ম্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সে পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র তাহা কর্ম্ম নহে, তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের কোন সুখ সাধন হয় তবে সেত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্ম্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? কর্ত্তব্যকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মকে, মানব প্রকৃতির, সর্ব্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোন্‌খানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জ্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা পূর্ব্বক নিদ্রা, ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য হইতে থাকি; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জ্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দ্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে আমাদের চিত্তে বাচি

ক্রিয়ায়াং মনে বাক্যে ও কর্ম্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে ঐক্য নাই—সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতে হইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে কোন্ সর্ব্বব্যাপী সত্য, কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে বাক্যে ও কর্ম্মে একতা দান করিবেন? সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়-জয়ী পরম নির্ভর পাই নাই; সংসার গুরুভার লৌহ-শৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড়দুর্ব্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি—কোন প্রবল রাজা, কোন পরম শত্রু কোন প্রচণ্ড উপদ্রবে তাঁহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে পারি না যে,—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর! তিনি রহিয়াছেন—ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর কর, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ কর, অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেল; কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাও এবং তাঁহার কর্ম্ম কর! তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটের তিলক করিয়া লও; যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য্য করিয়া লও, যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ কর, নৈরাশ্য দূর কর, অবসাদ অপসারিত করিয়া দাও—অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ণ বলে অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্মসেবার পরম গৌরবে সংসারের সঙ্কট পথে সরল হৃদয়ে ঋজু দেহে চলিয়া যাও! সুখের সময় বল—অস্তি—তিনি আছেন, দুঃখের সময় বল—অস্তি—তিনি আছেন, বিপদের সময় বল, অস্তি—তিনি আছেন! পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয় লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেল! বল, যে মহান্ অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না—আমার ন জরা, ন মৃত্যুর্ন শোকঃ। বল—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ
তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষৎ-কথিত সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন! সেই পরমাত্মায় নিরত আমাতে উপনিষদের যে সকল ধর্ম্ম তাহাই হৌক্, আমাতে তাহাই হৌক্!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই প্রার্থনা করিলেন।

হে রস-স্বরূপ তৃপ্তিহেতু পরমেশ্বর! এই প্রয়োজন-সুলভ সুন্দর বিচিত্র বিশ্ব তোমার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্কগণ-পরিশোভিত আকাশের দিকেই নেত্রপাত করি, কিম্বা এই ভূতধাত্রী পৃথিবীর গিরি নদী তরুরাজির প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সর্ব্বত্র তোমারই নিপুন হস্তের চিহ্ন সকল দেখিতে পাই। প্রীতি এবং মঙ্গল ভাব এবং আনন্দ বিধানই তোমার এই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমার মঙ্গল ভাবে সমস্ত জগৎ পরিপূরিত, তোমার আনন্দ কিরণে সকল দিক্ সমুজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। তোমার সৃষ্ট সুন্দর পদার্থ সকল, নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া, তুমি যে নয়নের নয়ন, মনের মন, তোমার নিকট প্রণত হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করে। বিষয়-রসই আস্বাদন করি, কিম্বা গভীর তত্ত্বানুসন্ধানেই নিমগ্ন হই, দেখি যে তোমার স্নেহ প্রেমের নিদর্শন সেখানে উজ্জ্বল। জিহ্বা বিষয়ের রসাস্বাদন করিয়া পুলকিত হয়, মন তত্ত্বের সুগভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুশৃঙ্খলা ও সুপ্রণালী-বদ্ধ নিশ্চয় সত্য মঙ্গলের সহজ পথ প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দ-রসে মগ্ন হয়। অন্তর্বাহ্যে তুমিই এক মাত্র রস-স্বরূপ, তৃপ্তি-হেতু।

তুমি প্রেমের আকর! যে তোমাকে দেখে না, জানিতে চাহে না, তাহাকেও তুমি প্রেম দান করিতেছ। দিবসে তোমার সূর্য্য-কিরণ পুণ্যাত্মা পাপী উভয়কেই আলোক বিতরণ করে, আকাশ-বিহারী তোমারই বায়ু উভয়েরই শরীরে জীবন বিধান করে, তোমারই জলধারা সকলেরই সাধারণ হিতকারী। তুমি জীবিত জনকে শুভ বুদ্ধি দিয়া ধর্ম্মপথে পরিচালন কর এবং মৃতকেও আপনার উদার ক্রোড়ে স্থান দিয়া কৃতার্থ কর। এত যে তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তাহার জন্য কি ক্ষণ কালের নিমিত্ত তোমার চরণে প্রণত হইয়া উপাসনা করিতে, কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি হস্তে করিয়া অবনত মস্তকে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে আমরা আলস্য বোধ করিব? কিন্তু হে দেব, তোমার সহায়তা ব্যতীত কোন্ কর্ম্ম করিতেই বা আমরা সক্ষম হই? অতএব প্রার্থনা করি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ের ভক্তি কৃতজ্ঞতার বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া দাও, যে, তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত ও পুষ্পান্বিত হইয়া তোমার চরণতল সুশোভিত করুক।

হে দয়াময়! তোমার দয়া কত প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি তোমার যে করুণা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অনুভব করিতেছি, যখন দেখি যে, তোমার সেই করুণা তোমার অসীম রাজ্যের অগণ্য লোককে তৃপ্ত করিতেছে, তখন বাক্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তোমার করুণা দিবসে রাত্রিতে, তোমার করুণা মাতৃ-হৃদয়ে, তোমার করুণা সাধু লোকের অন্তঃকরণে। যখন দেখি, ক্ষুদ্র প্রাণী বৃহৎ রোমাবলীর দ্বারা আবৃত হইয়া উচ্চ হিমাদ্রি-শৃঙ্গের চিরতুষাররাজির মধ্যে কেমন উত্তপ্ত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছে, তখন তোমার করুণার রহস্য ভাবিতে গিয়া মন স্তম্ভিত হয়! অতএব হে পরমাত্মন্, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, বিনীত ভাবে হৃদয় মনকে তোমাতে অর্পণ করিতেছি যে, যাহা কিছু তোমার পূজার জন্য দিতে হয়, সকলই প্রদান কর। হস্তকে তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত কর, পদকে তোমার কার্য্যে প্রেরিত কর, রসনাকে তোমার মহিমা গানে নিযুক্ত কর, মনকে তোমার চিন্তাতে নিমগ্ন কর, আত্মাকে তোমার সহিত যুক্ত কর, তোমাতে যাইয়া আত্মা শান্ত হউক। তোমার প্রস্ফুটিত জ্ঞান-চক্ষু দেখিয়া আত্মা পরিতৃপ্ত হউক। তুমি যখন রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু হইয়া আমাদিগের সকল অভাব মোচন করিতেছ, তখন হে পরমাত্মন্, কাতর প্রাণে, বিনীত অন্তঃকরণে তোমার উন্নত ধামের প্রতি অবলোকন করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি যে, তুমি এই পৃথিবীর শোক মোহ কোলাহলে ব্যথিত আমাদের আত্মার প্রতি কৃপা কর। কৃপা কর, হে দীন-দয়ালু, কৃপা কর। আমাদের আত্মার শান্তি রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল-ছায়া সর্ব্বত্র বিস্তার কর, ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবর্গকে তোমার পথে অগ্রসর কর।

এ দেশকে তোমার জ্ঞানে উজ্জ্বল কর। পৃথিবীকে শান্তি-সলিলে শীতল কর, সকলকে তোমার উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর। আমাদের অদ্যকার উৎসবকে অনন্তজীবনের উৎসবে পরিণত কর, ইহাই তোমার নিকটে প্রার্থনা। ধন্য জগদীশ্বর, তুমিই ধন্য!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরিশেষে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কি ভীষণ জ্বনতা! কি বিষম কলরব!

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিজ্ঞাপন।

সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩২৫ / ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫০৯৸ ৬
সমষ্টি	...	৮৩৪৸৶০
ব্যয়	..	২৯৮।/ ৯
স্থিত	...	৫৩৬॥ ৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৩৬॥৩
৫৩৬॥৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১৯০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৯০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫/০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
,, ,, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার,	ঐ	৩৲
,, ,, উমেশচন্দ্র দেব,	ঐ	৩৲
,, ,, মুকুন্দানন্দ আচার্য্য,	ডেরাডুন	৩।৶০
,, মহারাজা বাহাদুর,	দিনাজপুর	১॥৶০
		১৫/০
পুস্তকালয়	...	৪॥ ৬
যন্ত্রালয়	...	১১৩।/০
গচ্ছিত	...	।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৸০
সমষ্টি		৩২৫/ ৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০২॥৶
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৪৸০
পুস্তকালয়	...	২/০
যন্ত্রালয়	...	২৮৸৶৯
সমষ্টি		২৯৮।/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
প্রথম ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৭০।

১৮০৮ শকাব্দা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং, সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ প্রাতঃকাল।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই লোকসমাগম হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মমন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ধূপধুনার সুগন্ধ উপাসনার স্থান সুরভিত করিয়া তুলিল। এই অবসরে ব্রাহ্মেরা সমস্বরে 'দেহজ্ঞান দিব্য জ্ঞান' এই বন্দনা-গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতাবসানে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদিগ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। পরে বেদি হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এইরূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"আত্মার হিরণ্ময় কোষে শুভ্র জ্যোতিতে অবস্থান করিয়া যিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে উৎসাহ-অনল প্রজ্বলিত করিতেছেন সেই আনন্দময় প্রেমময় পরম পিতা অখিল মাতার চরণে প্রণিপাত করিয়া অদ্য আমরা এই উৎসব-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। হৃদয়ের ভক্তিচন্দনে, প্রীতি-কুসুমে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবার জন্য অদ্য এই উৎসব-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। ঐ দেখ "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধু বহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" নদী সকল মধু ক্ষরণ করিতেছে। যাঁহার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ সেই পরমাত্মার উদ্দেশে প্রকৃতির লতা বনস্পতি ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া অনন্ত আকাশ পথে তাঁহারই জন্য চলিয়াছে। তাঁহারই আনন্দ লীলাতে সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ। প্রতি নিমেষে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার আনন্দ রূপ কল্যাণরূপ নবতররূপে উত্থিত হইতেছে। অদ্য এই ব্রহ্মমন্দিরে সেই মঙ্গলরূপ আদিদেব ভুবননাথের উপাসনা হইবে ইহারই জন্য অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত আয়োজন। সমুদয় ভুবন যাঁহার উদ্দেশে উন্নতিমার্গে প্রধাবিত হইতেছে, যাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া সকল আত্মা

জ্ঞান-চক্ষু উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আশ্চর্য্য ভাবে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে এবং সত্য ধর্ম্মের সুন্দর সোপানে পদনিক্ষেপ পূর্ব্বক শান্তির উদ্দেশে উত্থিত হইতেছে তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। ব্রাহ্মধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, ব্রহ্মোপাসনাই শান্তি মঙ্গলের হেতু। যিনি দেবাধিদেব ত্রিভুবনের রাজা তিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যেরও রাজা, আমরা মর্ত্ত্য জীব হইয়া তাঁহার দর্শন লাভের জন্য এই ব্রহ্মমন্দিরে সমাসীন হইয়াছি এবং তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য এখানে প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই অবসরে এই শুভ সময়ে তাঁহার প্রতি চিত্ত সন্নিবেশিত কর। যদি হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা একটি একটি করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে পার তবে সকল আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ হইবে, যদি মনের সকল সদ্‌গুণ চয়ন করিয়া তাঁহার পূজাতে অর্পণ করিতে পার তবে কোন পাপ আসিয়া আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব এমন মঙ্গল মুহূর্ত্ত, বৎসরের এমন পবিত্র দিন যেন আমরা বৃথা নষ্ট না করি। বিষয়-চিন্তা মনের কুটিলতা পরিহার করিয়া পবিত্র হইয়া সেই পরমপিতার স্নিগ্ধ মূর্ত্তি শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া এস আমরা একান্ত মনে প্রেম ভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।"

উদ্বোধনের পর এই সঙ্গীত হইল।

রাগিণী আশা ভৈরোঁ—তাল তেওরা।

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি
তোমারি নামে খুলিল হৃদয় শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।
তোমারি নামে পূর্ব্ব তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন সাগরে জাগিল লহরী লীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি।

পরে স্বাধ্যায়ন্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে আর একটী সঙ্গীত হইল।

রাগিণী দেও গান্ধার—তাল চৌতাল।

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে
শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি!
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্ দিগন্তে
আবরিয়া রবি শশি তারা
পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এই প্রার্থনা করিলেন।

"আজ এই পুণ্য প্রভাতে নবনব ভাবসুরভিত প্রীতি-পুষ্প ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতার প্রতিদান বিমল আত্মপ্রসাদ লইয়া গৃহে ফিরিতেছি, ক্ষণেকের জন্য একবার অপেক্ষা কর। পরব্রহ্মের মঙ্গলগাথা শ্রবণে এই যে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলে, উত্তর দাও অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা হয় কি না। মরুময় আত্মা লইয়া এখানে আসিয়াছিলে, ব্রহ্মসংস্পর্শে উহা সরস ও সুকোমল হইয়া উঠিল, বল অপ্রতিম ঈশ্বরের পূজায় সিদ্ধিলাভ হয় কি না। হৃদয়বেদনা বহিয়া অশরীরী ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছ, হৃদয়ের গুরুভার অপসারিত হইল, জানিতে চাই ব্রহ্মপূজার সার্থকতা আছে কি না। যুক্তি-তর্কের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তোমার প্রেমবিগলিত হৃদয় যাহা সাক্ষ্য দিতেছে অপাঙ্গ-বাহিত অশ্রুকণা যাহার পরিচয় দিতেছে তোমার নিষ্পাপ দেহ যাহার প্রমাণ দিতেছে, বৃথা বাক্‌জালে তাহা গোপন করিতে যাইও না। এইখানে আসিয়া তোমার শ্রদ্ধাভক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল, সত্যের সন্ধান পাইয়া ভ্রমান্ধ আত্মায়, চেতনার সঞ্চার হইল, অন্তর্দ্দেশ স্তব্ধপুলকে পরিপূরিত হইল, অথচ বলিতে চাও নিরাকার ঈশ্বরের পূজা নাই, কার্য্য দেখিয়া কারণে অবিশ্বাস কি ভয়ানক বিড়ম্বনা। একদিকে প্রমাদরহিত প্রাচীন ঋষিদিগের জ্বলন্ত সাক্ষী, অন্যদিকে হৃদয়ের অন্তঃস্ফূর্ত্ত সার বাক্য, একদিকে আবরণবিহীন সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক মহাসত্য, অন্যদিকে যুগাতীত কালের সহিত সখ্যবন্ধন, ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন অন্তর্ব্বাহ্য দেখিয়াও তাহার প্রতি উদাসীন ভাব! মোহের কি অপূর্ব্ব ছলনা!

কালব্যাপী রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিপ্লবে একে একে সকলই হারাইয়াছি, কলাবিদ্যা এখান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও দেশ দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু যার জন্য প্রাচীন ভারতের এত গৌরব, আর্য্যজাতির এত সম্মান সমাদর, সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা সেই ব্রহ্মবিদ্যা—সেই অনন্যপরায়ণা ব্রহ্মবিদ্যা এখানে আবির্ভূতা হইয়াছেন, উৎগ্রীব হইয়া তাঁহার করুণ নিবেদন শ্রবণ কর, তিনি বলিতেছেন "সেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাং" আমি তোমার নিধি, তোমার পিতৃ পিতামহগণের সাধনলব্ধ অক্ষয় সম্পত্তি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন আমার গুরুত্ব আর কে বুঝিবে।

যদি আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া হতাশ হও, সেই আর্য্যকুলদেবতার নিকটে বরাভিক্ষা কর, তিনি তোমার আশা অধিকার প্রশস্ত করিয়া দিবেন। ধর্ম্ম-ধন্ধায় পতিত হইয়া দিশাহারা হইয়াছ, সকাতরে প্রার্থনা কর, তিনি ধ্রুবতারা হইয়া তোমার গন্তব্য পথ জ্যোতিষ্মান করিবেন। পাপে তাপে কলুষিত হইয়াছ, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমার অন্তরের কালিমা বিধৌত করিয়া দিবেন। ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তোমাকে মিলিত করিবেন।

পরমাত্মন্! তোমার সেই অতীন্দ্রিয় রূপ মানসপটে চিরমুদ্রিত কর, তোমাকে দেখিয়া আত্মার দৈবচক্ষু প্রস্ফুটিত হউক। ভারতের সেই প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান—সেই গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দাও যে অনন্তের সন্ধানে সকলে ধাবিত হউক। তোমার প্রসাদ বিতরণ কর যে আজিকার এই উৎসব এই শান্তি স্বস্ত্যয়ন অচ্ছিদ্র হউক। একমেবাদ্বিতীয়ং এই মহামন্ত্রের বিজয়-নিশান নিখাত কর যে প্রেমের রাজ্য সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। বেদের নামে এই বিচ্ছিন্ন ভারতে এক বিশাল ভ্রাতৃসমাজ গঠিত হউক। আবার বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র যাজ্ঞবল্ক্য এদেশে আবির্ভূত হউন, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী কাত্যায়নীর বেদগানে এই মহাশ্মশানে মহাপ্রাণের সঞ্চার হউক। গতি মুক্তির পথ অনাবৃত দেখিয়া ব্রহ্মনামের উচ্চ কলরবে দিকবিদিক পরিপূরিত হউক।' এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল,

তোমার পবিত্র ইচ্ছায় উহা সম্পন্ন হউক। তোমার নিকটে এই মাত্র প্রার্থনা।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে।

রাগিণী আসোয়ারি—তাল চৌতাল।

রক্ষা কর হে!
আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়, রক্ষা কর হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে
আপনা হতে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে॥

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে!
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলহে আনন্দগানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে,
থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে!
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তি-রসপানে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

জানি হে যবে প্রভাত হবে,
তোমার কৃপা তরণী
লইবে মোরে ভব সাগর কিনারে।
(হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয়
গাহিয়া যাব চলিয়া
দাঁড়াব আসি তব অমৃত দুয়ারে।
(হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে
তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে।
জনম মোরে দিয়েছ তুমি
আলোক হতে আলোকে
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে।
(হে প্রভু)
জানি হে নাথ পুণ্যপাপে
হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন সমুখে।
(হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত
রয়েছে দিনরজনী
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে॥
(হে প্রভু)
জানি হে জানি জীবন মম
বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশভয় পাথারে।
এমন দিন আসিবে যবে
করুণাভরে আপনি
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে॥
(হে প্রভু)

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(আজি) প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে।
(তুমি) আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে।
হৃদয় দেবতা রয়েছ প্রাণে,
মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে।
সব কলরবে সারা দিনমান
শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,

সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে
সকল কর্ম্মে সকল মননে
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে।
পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণে আলোকমালা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শিল্পনিপুণ শ্রীযুক্ত বাবু নিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহোৎসব উপলক্ষে গৃহটী সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ অতি অদ্ভুত। যেখানে যাহা যোজনা করিলে গৃহশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠে তিনি বহু পূর্ব্ব হইতে সেইরূপই যোজনা করিয়া ছিলেন। যখন আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন গৃহশোভা দর্শন করিয়া মোহিত না হইয়া ছিলেন এমন লোকই বিরল। দেখিতে দেখিতে উৎসবক্ষেত্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়িকে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রাঙ্গণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্বকর্ত্তব্য এইরূপে বিবৃত করিলেন।

"সেই জ্ঞানময়, প্রেমময়, আনন্দময় পরমেশ্বরের প্রসন্ন বদন দর্শন করিয়া উৎসাহ সহকারে অদ্য আমরা এই উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছি। এখন এখানে তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান দেখিয়া, তাঁহার প্রসন্নতা অন্তরে অতি গাঢ় রূপে অনুভব করিতেছি। তিনি আমাদের জ্ঞানময় মঙ্গলময় পিতা। আমাদের আত্মাকে যদি পবিত্র করিতে পারি, তাহা হইতে পাপ মলিনতা দূর করিতে পারি, তবে তাহার মধ্যে আমাদের আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিয়া অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারিব। যে ব্যক্তি আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে জানিল না, যে আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে হিরণ্ময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিল না, সে এই ধরাপৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিষয়ামোদে জীবন যাপন করিয়া বৃথাই দিনাতিপাত করিল। সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্ত, বিকসিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য, হিমাদ্রির উন্নত শৃঙ্গ এবং অতলস্পর্শ অপার সাগর দর্শন করিয়া ঈশ্বরের মহা জ্ঞানের, মহাশক্তির নিদর্শন পাই বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানের আধার শক্তির আধারকে আত্মার আধার ও অন্তরের অন্তর বলিয়া বুঝিতে না পারি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই জ্ঞান-সূর্য্যকে আত্মার মধ্যে প্রকাশিত না দেখি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বহির্জ্জগতস্থ কোন জ্ঞানেরই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশ পাইতেছে, এই বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর। তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। সেই জ্ঞানস্বরূপ এককালে সকলকে জানিতেছেন। আপনার আত্মাকে জানিলে পরমাত্মাকে জানা যায় এবং পরমাত্মাকে জানিলে আর সকলই জানা যায়। সেই জ্ঞান সকলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে আলোক দিতেছেন, সেই জ্ঞান সূর্য্যের জ্যোতি, সেই জ্ঞান আমাদের চক্ষুর কিরণ, সেই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ের শান্তি। সেই জ্ঞান হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সেই জ্ঞান-সূর্য্য সকল অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন, আমা-

দের হৃদয়ের মোহ বিনাশ করিতেছেন, তাঁহারই জ্ঞানালোক পাইয়া আমরা সেই জ্ঞান-স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। এমন স্থান নাই। যেখানে তাঁহার জ্ঞান প্রকাশিত নাই। নিবিড় বনে তাঁহার জ্ঞান, সমুদ্র-তরঙ্গে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার জ্ঞান এখানে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মাতে। তিনি এখনি আমাদিগের সকলকে প্রীতি-দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন, তিনি এখনি আমাদের মনের সকল ভাব অবগত হইতেছেন; মাতার ন্যায়, পিতার ন্যায়, নিজের প্রীতি দিয়া আমাদিগকে অভিসিক্ত করিতেছেন। অতএব সেই জ্ঞান-প্রেম-স্বরূপকে প্রীতি দ্বারা পূজা করিতে অভ্যাস কর।

ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য কি মধুময় বাক্যেই বলিয়াছেন যে, "প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং। যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে, ভাতি তত্ত্বং বিমলং।" প্রেম-সূর্য্য যদি আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত অভ্যুদিত হয়, তবে আমাদের সকল কামনা সিদ্ধ হয়। আমরা সকল ফল লাভ করি। আমাদের কামনার পর্য্যবসান কি? ঈশ্বরকে লাভ করা। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ করি, আমরা সমুদয় কামনার বিষয় লাভ করি, তাঁহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না। তাঁহারই মুখ দর্শনে, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে, আমাদের আনন্দের উপর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই পরমপুরুষ শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ প্রেমময়, আনন্দময় আমাদের সমুদয় কামনার পর্য্যাপ্তি। আমরা এখানে সকল সুখের মধ্যে, সকল ভোগের মধ্যে সকল সুখভোগের প্রদাতা যে তিনি তাঁহাকেই চাই, যাঁহাকে পাইলে সকল কামনার পর্য্যাপ্তি হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন, তিনি আমাদের অন্তরে। "প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে" যখন আমরা গর্ভের মধ্যে ছিলাম, প্রজাপতি সেই গর্ভের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রজাপতি সেই গর্ভের মধ্যেই আমাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিধান করিলেন, ভাবী কালের প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় সকল তাহাতে যোজনা করিলেন। তিনি যেমন গর্ভের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে শরীর দিয়াছেন, সেই গর্ভের মধ্যেই মনের সূত্রপাত করিয়াছেন, যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যখন প্রেম-সূর্য্য আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তখন হৃদয়-থাল-ভার ভক্তিপুষ্পহার দিয়া তাঁহার পূজা করি। উপাসনার স্বর্গীয় ফল সেই ঈশ্বরের মহান্ ভাব সকল আসিয়া যখন হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব সকলকে তিরোহিত করিয়া দেয়, তখন "কোমোহঃ কঃ শোকঃ" কি মোহ, কি শোক।

প্রেম ও মঙ্গলের কেমন সংযোগ, যেখানে প্রেম সেই খানেই মঙ্গল, সেই খানেই আনন্দ। সাধু হৃদয়েই ঈশ্বরের এই প্রসাদ অবতীর্ণ হয়। যিনি প্রিয়তম পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাতে মনঃসমাধানের এবং তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম যোগের বিমল আনন্দ আস্বাদন করিয়া তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়া আপনার চরিত্রকে মহৎও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে জীবনের নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়া অহরহ তাঁহার পুণ্যপথে বিচরণ করিয়াছেন তাঁহারই সেই সাধু হৃদয়ে আনন্দময়ের অধিষ্ঠান। সেই ব্রহ্মপরায়ণ একনিষ্ঠ ধীর

ব্যক্তিই ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, সজনে নির্জনে সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ। তিনি এইরূপ ধীরের আত্মাতে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, প্রেমরূপে প্রকাশ পাইতেছেন এবং আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার দর্শনেই আনন্দ, তাঁহার উপাসনাতেই উৎসব। সকলে তাঁহার পথেই গমন করুক, ধর্ম্মেতে উন্নত হউক, শান্তিলাভ করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার যাহা কিছু সকলই আমাদের জন্য দিয়াছেন; তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন। আবার সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরেরই উপদেশ দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তিনি পরিমিত সাকার দেবতা নহেন, তিনি অমৃত অনন্ত পুরুষ। এই ১১ মাঘের মহিমা এই জন্যই এত উজ্জ্বল যে, এই দিনেই আমরা সকল প্রকার প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই জন্যই এই দিন অনন্ত কালের জন্য স্মরণীয় হইয়াছে। অতএব অদ্যকার উৎসব প্রাঙ্গণে সমাসীন হে সাধুসজ্জনগণ, আমি আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, আসুন আমরা হৃদয়কে পবিত্র করিয়া প্রেম ভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই ও জীবনকে সার্থক করি।"

পরে সঙ্গীত হইল।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল তেওরা।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে।
অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল শান্তিমগ্ন চরাচর
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে।

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

দিনের বিচার কর!
দিন শেষে তব সমুখে দাঁড়ানু ওহে জীবনেশ্বর!
দিনের কর্ম্ম লইয়া স্মরণে সন্ধ্যাবেলায় সঁপিনু চরণে,
কিছু ঢাকা নাই তোমার নয়নে এখন বিচার কর॥
মিথ্যা আচারে যদি থাকি মজি আমার বিচার কর!
মিথ্যা দেবতা যদি থাকি ভজি আমার বিচার কর!
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম্ম বিমুখ,
পর নিন্দায় পেয়ে থাকি সুখ, আমার বিচার কর॥
অশুভ কামনা করি যদি কার আমার বিচার কর।
রোষে যদি কারো করি অবিচার আমার বিচার কর।
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমারে কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তারে
আপনি বিনাশ করি আপনারে আমার বিচার কর॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
করেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরিবন সরস শোভন
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে
জনমে মরণে শোকে আনন্দে
তুমিই ধন্য ধন্য হে!

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপে উদ্বোধন করিলেন।

"নিখিল জগতের যিনি জনক জননী, যিনি আত্মার প্রাণ, নিত্য নবোৎসবের মঙ্গলবার্ত্তা যাঁহার অসীম রাজ্য হইতে অহর্নিশি উত্থিত হইতেছে, দেবগন্ধর্ব্বের স্তুতি গীতি যাঁহার কীর্ত্তিগাথা ধ্বনিত করিতেছে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠে ক্ষুদ্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস লইয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে সমাগত। অযুত অগণ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল যাঁহাকে নিত্য নিয়মে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কোথা সেই ভূমা পরমেশ্বর! বাক্য তাঁহাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়, মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া অবসন্ন হয়। অনন্ত বিশ্ব যাঁহার সন্ধান না পাইয়া আকুল, তিনি দূরাৎ সুদূরে থাকিয়াও, অন্তিকে অন্তরে গুহায়াং আমাদের আত্মার গভীরতম প্রদেশে বিরাজমান। তিনি দৃষ্টির বিষয় নহেন, ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। জ্ঞানে তাঁহাকে উপলব্ধি কর, প্রেমে তাঁহার সমীপস্থ হও। তাঁহার উদার ক্রোড় আজ প্রসারিত। যে পুণ্যদিন অপেক্ষা করিয়া আরণ্যক ঋষিদিগের সাধন-লব্ধা ব্রহ্মবিদ্যা এদেশে আবার অবতীর্ণ হইয়াছিল এই সেই অমৃত বেলা। শান্ত-প্রাণে তাঁহার মধুর আহ্বান শ্রবণ কর। সেই বরাভয়দাতা আজ তোমার সম্মুখে। হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহাকে আজ উপহার দাও, সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণ বন্দনা কর। প্রতিদিন প্রাতে সায়াহ্নে সপ্তাহে মাসান্তে তাঁহার আরাধনা করিয়া আসিয়াছ, অদ্য এই মহামহোৎসবের দিন প্রীতিভক্তির পূর্ণাহুতি তাঁহাতে নিবেদন কর; আত্মার সদ্গতি, পরিবারের কল্যাণ, স্বদেশ ও স্বজাতির ধ্রুব মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার বোধনে প্রবৃত্ত হও। আমাদের অন্তস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা বাক্যে তাঁহার সিংহাসন টলিয়া উঠুক, তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।"

পরে সঙ্গীত হইল।

রাগিণী কেদারা—তাল ধামার।

হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।
শত মঙ্গল শিখা করে ভবন আলো,
উঠে নির্ম্মল ফুল গন্ধ।

রাগিণী ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

আজি এ ভারত লজ্জিত হে!
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে॥
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বিপরে,
ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে।

রুদ্র তোমার নিদারুণ বজ্রে
কর তারে সহসা তর্জ্জিত হে।
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পলকে সজ্জিত হে॥

"অনন্তর উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

ত্রিভুবন নাথ! তোমার এ বঙ্গভূমি, তোমার এ ভারতবর্ষ ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন। ঘোর অজ্ঞানমোহে আবৃত। জ্বলে না তোমার প্রেমের আলো আর কোথাও জ্বলে না। লোকে তোমাকে হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। তুমি অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময়, তোমার আবির্ভাব যখন মনুষ্যের হৃদয়ে নাই, তখন সে হৃদয় মৃত্যু-জ্বালা ও বিষাদ-আঁধারে পূর্ণ হইবে না ত আর কি হইবে? সেই পবিত্র ব্যাখ্যানের কথাতেই বলি, তোমার সিংহাসন যে হৃদয়ে নাই, যে পরিবারে নাই, যে দেশে নাই, সেই শূন্য হৃদয়, শূন্য পরিবার, শূন্য দেশ কেবল ঘন বিষাদের আলয়। সে শ্মশান-ভূমির অনুরূপ। বঙ্গের যে এত দুর্গতি—ভারতের যে এত যন্ত্রণা, সে কেবল তোমার পূজার অভাবে। হায়! এই সকল বঙ্গবাসী—এই সকল ভারতবাসী তোমায় দেখে না, তোমায় চাহে না। তোমার অমৃতবাণী শ্রবণ করে না। তুমি যে অমৃত-সাগর তোমাতে আর কেহ অবগাহন করে না। জ্বলে তাই শরীর জ্বলে, আত্মা জ্বলে। লোকে আর তোমার উপাসনা করে না। ব্রহ্মনাম—মধুর ব্রহ্মনাম মুখে আনে না। কেবল কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পরনিন্দা পরচর্চ্চা ও অসার কথা-প্রসঙ্গে এমন অমূল্য জীবন ক্ষয় করে। যেখানে হৃদয় সমর্পণ করিয়া শতবার আঘাত পাইয়াছে, সেই স্থানেই ব্যাকুল হইয়া হৃদয় রক্ষা করে। ফলও তেমনি হয়। যে অসার প্রেমে নিমগ্ন হইয়া মেদিনীকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে, আবার তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত। কি মোহ! কি ভ্রান্তি! হে পরমেশ্বর! তুমি তাহাদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দাও। দয়াময়! লোকে আর তোমার দয়াময় রূপ ধ্যান করে না। তোমাকে আদর্শ করে না। সেই জন্যই তাহাদের হৃদয় পাষাণ-সমান হইয়াছে। হে করুণাময়! তুমি তাহাদের হৃদয়কে পুষ্পবৎ কোমল কর। "স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ"। হে দেব! তুমি আমাদের মধ্যে স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি অজস্র রূপে বর্ষণ কর। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে দেখা দাও। তোমার যে সেই অপ্রতিম পবিত্রতা, তাহা আমাদের আত্মায় সিঞ্চন কর। তুমি বঙ্গভূমি ভারতভূমিকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা কর। তুমি তোমার ভারত সন্তানদিগকে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দাও। এক ব্রহ্মোপাসনার অভাবেই যত যন্ত্রণা। আমরা আজি এই পবিত্র দিনে, তোমার নিকটে তোমাকেই চাহিতেছি। আমরা যেন প্রতিদিন তোমার পূজা করিতে পারি। নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র, আমাদের জ্ঞান-চক্ষু যেন তোমাকেই দেখিতে পায়। রসনা যেন তোমাকেই কীর্ত্তন করিতে পারে। দিবসের সেই প্রথম মুহূর্ত্তেই যেন আমরা তোমাতেই ডুবিতে পারি। তাহা হইলে সংসার-আতপের কি সাধ্য, যে আমাদিগকে সন্তাপ দিতে—দগ্ধ করিতে ক্ষমবান হয়। হে জ্ঞানদাতা গুরো!

প্রতি প্রাতঃকালে আমরা যেন তোমার নিকট কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করি। প্রতিদিন কি করিতে হইবে, তুমি তাহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিও। করুণাময়ি! তুমি আমাদের মাতা—পরম মাতা। মায়ের কথা যে অবহেলা করে, তার দুর্গতির সীমা কোথায়! তোমার কথা যেন আমরা ভক্তিসহকারে পালন করি। তোমার উপদেশ অনুসারে দিবাভাগে কার্য্য করিয়া, আবার যেন সন্ধ্যাকালে, তোমার চরণের নিকটে আসিয়া, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে পাই। যেন বলিতে পারি, মা তোমার আদেশমত কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি যেন প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও। সেই আশীর্ব্বাদই আমাদের সর্ব্বস্ব। সেই আশীর্ব্বাদেই হৃদয় শান্তি-রসে পূর্ণ হইবে। সেই শান্তি বক্ষে করিয়া আমরা যেন সুনিদ্রায় মগ্ন হই। দুঃস্বপ্নেও যেন সে নিদ্রা—সে শান্তি ভঙ্গ না হয়। তুমি নাথ! শয়নে স্বপ্নে—জীবন মরণে হৃদয়ে জাগ্রত থাক। আমরা তোমারই। আমাদের জীবন যেন তোমাকে দেখিতে দেখিতেই অবসান হয়, তোমার আনন্দেই কাটিয়া যায়! জীবনান্তে যেন তোমার অমৃতময় আনন্দময় ক্রোড়ে স্থান পাই। এই আমাদের কামনা, এই আমাদের প্রার্থনা।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

"আমরা যখন সম্মুখে প্রত্যক্ষ করি যে, একটা বৃক্ষ নবীন পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত, তখন পুষ্প-পল্লব কোথায় প্রত্যক্ষ করি? শাখাগ্রে। যখন আমরা সেই বৃক্ষে জল-সিঞ্চন করি তখন কোথায় জল-সিঞ্চন করি? মূলে। অদ্যকার এই উৎসবের শোভা আমরা কোথায় দেখিতেছি? চতুর্দ্দিকে। তাহার সম্বর্দ্ধনের জন্য কোথায় যত্ন সমর্পণ করিতেছি? অন্তরে—আত্মার মূল যেখানে পরম সত্য পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই মূলে। মূল হইতেই রসাকর্ষণ করিয়া আমাদের এই উৎসব প্রাণ পাইতেছে এবং বৎসর বৎসর নব নব পুষ্প-পল্লবে শোভমান হইতেছে। এ উৎসবের মধ্যে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি—আনন্দ—জ্ঞান—কর্ম্মোদ্যম—সমস্তই মূলে পূর্ণ-মাত্রায় ভরা রহিয়াছে, আর, সেখান হইতে নিত্য নিত্য নব নব বেশে উদ্ভাসিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—আনন্দরূপমমৃতং—শান্তং শিবমদ্বৈতং—সেই চিরন্তন মূল। যাঁহারা মূল ধনের আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহারা দিন দিন ধন ধান্য ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঋণের উপরে নির্ভর করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহারা অল্প কালের মধ্যেই ঋণে ঋণে আপাদ মস্তক পরিপ্লাবিত হ'ন; কিছু দিন তাঁহাদের ধুম ধামে কাটিয়া যায়; তাহার পরে এক দিন রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র তাঁহারা অন্নাভাবে এবং বস্ত্রাভাবে কটিতে কৌপীন বস্ত্র বন্ধন করিয়া এবং হস্তে ভিক্ষার ঝুলি লম্বমান করিয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ ভাবে তাঁহাদের পূর্ব্বতন কালের রথচক্র-চিহ্নিত রাজপথে বহির্গত হ'ন। আমরা আমাদের আত্মার অন্তরাত্মাকে ছাড়িয়া—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া—মূলধনের আশ্রয় ছাড়িয়া, পৃথিবীর নিকট হইতে পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য্য ধার করিয়া বিষয়মদে যতই উন্মত্ত এবং স্ফীত হই না কেন—এক দিন রাত্রি প্রভাত হইলেই পৃথিবীর ঋণ পৃথিবীকে শুধশুদ্ধ পরিশোধ করিয়া নিঃসম্বল হইয়া অজ্ঞাত অপরিচিত পথে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সোজা পথ থাকিতে কেন আমরা এরূপ বিপরীত পথ অবলম্বন করিব? আপনার ঘরে অক্ষয় মূল ধনের পুঁজি থাকিতে কেন আমরা দ্বারে দ্বারে ঋণ করিয়া বেড়াইব? আমাদের দেশের যত কিছু দুরবস্থা আমরা চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি সমস্তেরই গোড়ার কথা এই যে, বৃক্ষের মূলে জল-সিঞ্চন না হওয়াতে বৃক্ষের শাখা পত্র ফল ফুল সমস্তই দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছে—যৌবন-পুষ্প মুকুলিত হইয়াই ঝরিয়া যাইতেছে—জীবন-ফল অপক্ক-দশাতেই বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। গোড়ায় যেখানে প্রেমের আকর পরমাত্মার প্রতি আন্তরিক প্রীতি নাই—সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে আন্তরিক সদ্ভাব আমরা কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পারি? গোড়ায় যেখানে সর্ব্বমূলাধার মঙ্গলালয় বিশ্ব-বিধাতার, প্রতি আন্তরিক নির্ভর নাই—সেখানে কিরূপে আমরা সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ প্রত্যাশা করিতে পারি? সর্ব্বজগতের চিরন্তন পিতা মাতা গুরু এবং সুহৃৎ আমাদের এই দীন হীন পরাধীন দেশের মঙ্গলের জন্য সুনির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন, কিন্তু আমাদের দেশ সেই চিরন্তন পিতা মাতা গুরু এবং সুহৃদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছে—যেন তাঁহার সে দান কিছুই নহে—যেন তিনি থাকিয়াও নাই; এদেশের মঙ্গল কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমাদের দেশের সেই সকল পূর্ব্বতন ঋষি যাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—যাঁহাদের ধ্যান ছিল তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ—যাঁহাদের প্রণতি ছিল

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—

যাঁহাদের প্রার্থনা ছিল

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবির্ম্ম এধি—

স্বদেশের সেই সকল হৃদয়-স্থানীয় এবং মস্তক-স্থানীয় পুরাতন ঋষিদিগের প্রতি যদি আমাদের দেশের এক বিন্দুও শ্রদ্ধা থাকিত তবে সে দেখিতে পাইত যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে যে-সকল ছাঁকা ছাঁকা বচন সংগ্রহীত হইয়াছে তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের মূলধন, এবং সেই সকল বচনের প্রতিপাদ্য সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদের অবিনশ্বর আত্মার অক্ষয় মূলধন; দেখিতে পাইয়া আমাদের এই দিক্‌ভ্রান্ত দেশ ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করাইতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিত না। কিন্তু হায় পুণ্য ভারতভূমির সেই সকল পুরাতন ঋষিরা এখন আর আমাদের দেশের কেহই নহেন—এখন যাঁহারা আমাদের পর তাঁহারাই আমাদের আপনার, আর, যাঁহারা আমাদের আপনার তাঁহারাই আমাদের পর।

এখনো আমাদের দেশ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে সমস্ত বিপদের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে—যদি তাহার চক্ষু থাকে, কর্ণ থাকে, এবং হৃদয় থাকে। আমাদের দেশের চক্ষের সম্মুখে তাহার অবোধ সন্তানেরা পরমাত্মাকে ছাড়িয়া বিষয়-বিষের জ্বালায় এক দণ্ড শান্তি-উপভোগের অবসর পাইতেছে না, অথচ আমাদের দেশ ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোকের প্রতি চক্ষু ফিরাইতেছে না। আমাদের দেশের কর্ণ-কুহরে বিবাদ-কলহের উন্মত্ত কোলাহল চারিদিক্ হইতে কেবল অমঙ্গল এবং অশান্তির সমাচার আনয়ন করিতেছে

অথচ আমাদের দেশ ব্রাহ্মধর্ম্মের সুমঙ্গল সমাচারের প্রতি এক মুহূর্ত্তও কর্ণ প্রদান করিতেছে না। অসৎপন্থী সন্তানদিগের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে আমাদের দেশের হৃদয়ের মর্ম্ম নিষ্পেষিত হইতেছে অথচ আমাদের দেশের হৃদয়ে এরূপ চেতনা একবারও জাগিয়া উঠিতেছে না যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার হৃদয়ের সিংহাসনে অধিকার প্রাপ্ত হইলে কখনই তাহার এরূপ দুর্গতি হইতে পারিত না। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকের প্রতি কবে আমাদের দেশের চক্ষু ফুটিবে! ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃতময় আহ্বান-ধ্বনির প্রতি কবে আমাদের দেশের কর্ণ অবরোধ-মুক্ত হইবে! ব্রাহ্মধর্ম্মের অকৃত্রিম সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্যের প্রতি কবে আমাদের দেশের হৃদয় সচেতন হইবে! আমাদের দেশ এই সহজ সত্যটাও বুঝিতেছে না যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি আমাদের শত্রু হইতেন তবে তিনি বলিতেন কাষ্ঠ পাষাণের উপাসনা করিয়া কাষ্ঠ পাষাণ হইয়া যাও; ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়াই তিনি বলিতেছেন যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং আনন্দরূপং অমৃতং শান্তং শিব-মদ্বৈতং ব্রহ্মেরই উপাসনা কর। আর কাহারও উপাসনা করিও না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি আমাদের গৃহের শত্রু হইতেন তবে তিনি বলিতেন পিতা মাতা এবং গুরুদিগকে মান্য করিবার কোনো আবশ্যকতা নাই; ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের গৃহের পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়াই তিনি বলিতেছেন যে, "মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব" "মাতাকে দেবতুল্য পিতাকে দেবতুল্য জানিবে এবং আচার্য্যকে দেবতুল্য জানিবে।" ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি আমাদের দেশের শত্রু হইতেন তবে তিনি বলিতেন যে, আমাদের দেশের আদিম ঋষিদিগের কণ্ঠনিঃসৃত আত্মার অন্তর্নিগূঢ় গভীর তত্ত্বজ্ঞানের কথা সকল মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অধুনাতন কালের আপাতসুলভ উপর-উপর-ভাসা বিষয়-বুদ্ধির কথা সকলকে তাহার স্থলাভিষিক্ত কর; ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশের আন্তরিক বন্ধু বলিয়াই তিনি এত এত শাস্ত্র থাকিতে পরম পরিশুদ্ধ আদিম ঋষিবাক্য সকলের সমিৎ কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া তাহার উদ্দীপ্ত জ্ঞানানল হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত ভারতভূমির বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্নপন্থী সন্তানগণের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের জননী জন্ম-ভূমির হস্ত হইতে এই অমূল্য দান গ্রহণ কর; ইহাকে যত্নের সহিত গৃহে গৃহে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ কর; ইহাতে যতই জ্ঞান প্রেম এবং সদনুষ্ঠানের ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে, ততই ইহা তোমাদের উপরে কামধেনুর ন্যায় কল্যাণ বর্ষণ করিবে।

হে পরমাত্মন্! হে অগতির গতি—অনাথনাথ! তুমিই বিপদ্ সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী! এবং মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার! আজিকের এই শুভ সাম্বৎসরিক মহোৎসবে আনন্দরূপমমৃতং অভয় মূর্ত্তি অবলোকনে আশ্বাসিত হইয়া আমরা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি।

পিতা নোঽসি তুমি আমাদের পিতা। পিতা নো বোধি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেও। নমস্তেঽস্তু তোমাকে নমস্কার। মা মা হিংসীঃ আমাদিগকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না—আমাদিগকে বিনাশ করিও না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব হে দেব হে পিতা পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব যাহা ভদ্র যাহা কল্যাণ তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ

তুমি সুখ কর কল্যাণকর—সুখ কল্যাণের আকর—কল্যাণ কল্যাণতর তোমাকে নমস্কার।

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল।

তোমারি সেবক করহে আজি হতে আমারে।
চিত্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ
তোমার কর্ম্মে রাখ বিশ্ব-দুয়ারে!
কর ছিন্ন মোহপাশ সকল লুব্ধ আশা
লোকভয় দূর করি দাও দাও!
রত রাখ কল্যাণে নীরবে নিরভিমানে
মগ্ন কর আনন্দ রসধারে।

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল কাওয়ালি।

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে
ভ্রমিছ দীন প্রাণে!
সতত হায় ভাবনা শত শত,
নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে!
জান না রে অধো ঊর্দ্ধে বহির্ অন্তরে
যেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয় আশ্রয়!
তোল আনত শির, ত্যজ রে ভয় ভার,
সতত সরল চিতে চাহ তাঁরি প্রেম মুখপানে।

রাগিণী পিলু—তাল মধ্যমান।

দিন যায়রে দিন যায় বিষাদে
স্বার্থ কোলাহলে ছলনায় বিফলা বাসনায়।
এসেছ ক্ষণতরে ক্ষণপরে যাইবে চলে,
জনম কাটে বৃথা
বাদ বিবাদে কুমন্ত্রণায়।

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

প্রভু খেলেছি অনেক খেলা
এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি।
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তিবারি চাহি,
আজি সর্ব্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য নিত্য চাহি।

কীর্ত্তন।

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে
ছিলাম নিদ্রামগন!
সংসার মোরে মহামোহঘোরে
ছিল সদা ঘিরে সঘন॥
(ঘিরে ছিল ঘিরে ছিল হে আমায়) (মোহ ঘোরে) (মহামোহে)
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা
ভাসাবে নয়নজলে
কে জানিত হবে আমার এমন
শুভদিন শুভ লগন॥
(জানিনে জানিনে হে আমি স্বপনে) (আমার এমন ভাগ্য হবে আমি জানিনে জানিনে হে)
জানিনা কখন্ করুণা-অরুণ
উঠিল উদয়াচলে
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল
আমার হৃদয়গগন॥
(আমার হৃদয় গগন পূরিল) (তোমার চরণ কিরণে) (তোমার করুণা অরুণে)
তোমার অমৃতসাগর হইতে
বন্যা আসিল কবে,
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল
কখন্ হইল ভগন॥
(যত বাঁধ ছিল যেখানে ভেঙ্গে গেল ভেসে গেল হে)
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ,
পরাণে দিয়েছ আশা,

আমার জীবনতরণী হইবে
তোমার চরণে লগন ॥
(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে আমার জীবনতরণী)
(অভয় চরণে গিয়ে লাগিবে)

রাগিণী আড়ানা—তাল চৌতাল।

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ততপন তারা।
সুখ দুঃখ তব বাণী জনম মরণ বাণী তোমার
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্তি ধারা।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ঝাঁপতাল।

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছায়ে?
হে বিপুল সংসার সুখে দুঃখে আঁধার
কতকাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায়?
আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায়।

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল একতালা।

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এস আপন হৃদয়ে!
হৃদয় মাঝে হৃদয় নাথ
আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত্ত
হের তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম,
হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম
নিভৃত অমৃত আলয়ে।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে।
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হতে শান্তি ক্রোড়ে
আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে।

রাগিণী কালাংড়া—তাল ঠুংরী।

ইচ্ছা হবে যবে লইয়ো পারে।
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি বসে ভবসিন্ধু কিনারে।
যত দিন রাখ তোমা মুখ চাহি,
ফুল্ল মনে রব এ সংসারে।
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ
আমার দিবস রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র সূর্য্য কিরণে তোমার করুণ নয়ন পাত।
সুখ সম্পদে করিহে পান তব প্রসাদ বারি,
দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত।
জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা
মরণ অন্তে হৌক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত।
লহ লহ মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ!

কীর্ত্তন।

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ॥

(দয়া করে)
(দুখ দিলে আমার দয়া করে)

হৃদয় যাহার শত খানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে॥
(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হতে কুড়ায়ে এনে)
(ধূলা হতে তারে কুড়ায়ে এনে)
সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে॥
(বুঝায়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে)
(তুমি কে হও আমার বুঝায়ে দিলে)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে!
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে॥
(আমি না জানিতে) (কোথা দিয়ে আমায় এনেছ
আমি না জানিতে)

পরে রাত্রিকালের সভা ভঙ্গ হইল।

মহর্ষি সন্দর্শন।

ত্রয়োদশ মাঘের সুশীতল প্রভাতে প্রথমে এক জন দুই জন করিয়া পরে দলে দলে ধর্ম্মতৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মগণ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন।

উপরে সুবিস্তীর্ণ রক্তবর্ণোজ্জ্বল চন্দ্রাতপ, নিম্নে শুভ্র বস্ত্রমণ্ডিত শুদ্ধ আসনে সমস্ত অঙ্গনভূমি পরিব্যাপ্ত, দক্ষিণের বারেণ্ডায় সারি সারি কাষ্ঠাসন সুসজ্জিত, দ্বারদেশে মহর্ষিদেবের পৌত্র দৌহিত্রাদি এবং কর্ম্মচারিবর্গ অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান; ক্রমশঃ প্রায় ৫০০ পুরুষ প্রাঙ্গণভূমি পূর্ণ করিয়া বসিলেন; ব্রাহ্মিকারা দক্ষিণের বারেণ্ডায় যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

তখন কাব্যগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বীণাবিনিন্দিত মোহনকণ্ঠে তাঁহারই রচিত 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি। তোমারি নামে ফুটিল হৃদয় শতদল দল রাজি' এই নবসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

তৎপরে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধুর গম্ভীর স্বরে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সভামণ্ডল ধ্বনিত করিয়া সভ্যগণকে উদ্বোধিত করিলেন; আবার সেই সঙ্গীতের লহরীলীলা তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। পরে শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহোদয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে নিকটস্থ কয়েক জন উপাসনা মন্ত্রে যোগদান করিয়া ছিলেন। উপাসনার পরে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সরলভাবে ভক্তিভরে সকলের হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন; প্রার্থনার পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু তাঁহার নবরচিত সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

'আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।' আদি-সমাজের কয়েক জন গায়ক এই কীর্ত্তনে যোগ দান করিলেন এবং সঙ্গে মৃদঙ্গকরতাল বাজিতে লাগিল; শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হারমোনিয়ম্ বাজাইয়া সঙ্গীত এবং কীর্ত্তনের মাধুর্য্যকে মধুরতর করিয়াছিলেন।

উপাসনাসমাপ্তির পরেই মহিলাগণ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দর্শনার্থে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তৃতীয়তলে গমন করিলেন। চরণপ্রণতা

মহিলাদিগের বিনয়বিনম্র ভক্তি পরিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রতি নিম্নলিখিতরূপ কল্যাণকামনাময় শুভাশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন—

'ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করুন, তিনি তোমাদের গৃহের শ্রীবর্দ্ধন করুন। তিনি যেমন তোমাদের পিতা, তেমনি তিনি তোমাদের সকলের মাতা। সন্তানের মাতার প্রতি যে স্নেহ তাহা আর তোমাদিগকে কি বুঝাইব, তোমরা যেমন তাহা বুঝ, এরূপ আর কেহ বুঝিতে পারে না। তিনি মাতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিতেছেন, বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে কখন বিস্মৃত হইবে না। তিনি তোমাদের সকল কল্যাণ বিধান করিবেন।'

তাঁহারা সেই আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া দ্বিতীয় তলে প্রত্যাগত হইতে না হইতেই মহর্ষিদর্শনোৎসুক পুরুষগণকে তৃতীয়তলে যাইবার জন্য আহ্বান করা হইল। যখন সমস্ত ভক্তগণ এককালে তৃতীয় তলের প্রতি ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হইলেন, তখন তৃতীয়তলের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান হইয়া মহর্ষি দেবের দৌহিত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়মধুর বচনে বলিলেন, 'আপনারা দয়া করিয়া যথাক্রমে তৃতীয়তলে গেলেই কোন প্রকার গোলযোগ হইবে না।'

বর্ত্তমানে মহর্ষিদেবের বহিরিন্দ্রিয় সকল স্বভাবতই ক্ষীণ; কিন্তু যখন প্রায় ৬০০ শত দর্শনার্থীর কেহ চরণতলে কেহ যুক্ত করে কেহ আসনে কেহ ভূমিতে—গৃহ পূর্ণ করিয়া—অনেকে চতুর্দ্দিকের দ্বারপথে এবং অনেকে সম্মুখবর্ত্তী চত্তরে তৃতীয়তলকে ব্যাপ্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া পরিপূর্ণ উৎকণ্ঠায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইলেন; তখন সেই ব্রহ্মানন্দসুধাসাগরনিমগ্ন দিব্যজ্যোতিঃ বরণীয় মহাপুরুষের বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা যেন অন্তর্নিহিত বিশ্বপ্রেমের তাড়নায় নবোন্মেষিত তরুণোৎসাহে সুদূরে অপসারিত হইয়া গেল। তখন সেই ব্যাকুলজনতাপূর্ণ নিঃস্তব্ধতা ভেদ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে—তাঁহার দিব্যকণ্ঠে যে অতীত যুগের আর্ষধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ শান্তিসুখময় উপদেশ ও আশীর্ব্বচন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা একত্রে সংক্ষেপে এই—

'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। অনিরাকরণমস্ত অনিরাকরণং মেঽস্ত।

ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমাদিগকর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন।

গোমুখী হইতে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু জল যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত আকারে গঙ্গানদীতে পরিণত হইয়া অগণ্য নগর জনপদকে প্লাবিত করিয়া সাগরসঙ্গমে চলিয়াছে; তেমনি সুদূর অতীতের ১১শ মাঘে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তিত সত্য ধর্ম্ম আজি সংবর্দ্ধিত আয়তনে অগণ্য যাত্রীর ভরা লইয়া প্রেমসাগরের দিকে ধাবিত হইতেছে। যে পবিত্র গৃহে মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথমে এই সনাতন ধর্ম্মালোচনা প্রবর্ত্তিত করেন, মঙ্গলময়ের কৃপায় আজি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানের পরেও সেই মন্দিরেই তাঁহার উপাসনা-কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, ইহা কি আমাদের পক্ষে সামান্য আহ্লাদের বিষয়?

প্রাচীনকালে আচার্য্যেরা যজ্ঞের অবসানে শান্তিবচনের সহিত সকলের মস্তকে বিন্দু বিন্দু জল সেচন করিতেন; তেমনি অদ্য সেই বিপুলায়তন ব্রহ্মযজ্ঞের অবসানে আমি তোমাদের সকলের হৃদয়ে প্রেমাস্রু সেচন করিয়া শান্তিবচন পাঠ করিতেছি। তোমাদের শান্তি হউক, স্বস্তি হউক, তাঁহার প্রতি তোমাদের একান্ত নির্ভর স্থাপিত হউক!

তিনি তোমাদের সমস্ত অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন; তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া তোমাদের বাক্য চরিতার্থ হউক; তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া তোমাদের প্রাণ প্রেমরসে অভিষিক্ত হউক; মঙ্গলালয়ের অপার মহিমা দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মহিমাপ্রকাশক শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমাদের চক্ষু পরিতৃপ্ত হউক্; তাঁহার দিব্যস্তব—পবিত্র নাম শ্রবণ করিয়া তোমাদের কর্ণ সার্থক হউক। তিনি তোমাদের বল এবং ইন্দ্রিয় সকলকে তাঁহার কর্ম্মে—তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিযুক্ত রাখিয়া আপ্যায়িত করুন!

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথোবলমিন্দ্রিয়াণিচ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্।

তোমরা তাঁহাকে জান, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হও! যিনি তাঁহাকে জানেন—ব্রহ্মের আনন্দ উপভোগ করেন, তিনি সংসারে ভয়হীন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া তিনি আর কাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি—

যাহা অনিন্দনীয় কর্ম্ম—শুভকর্ম্ম তোমরা তাহারই অনুষ্ঠান করিবে, নিন্দিত অশুভ কর্ম্ম কখনও করিবে না; কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।

ওঁ এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।'

যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অক্লান্তযত্নে অবিশ্রান্ত কর্ম্মে—ভারতের সনাতন সত্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভোগৈশ্বর্য্যের প্রলোভনময় শত জঞ্জাল ব্রহ্মপ্রেমাগ্নিতে আহুতি দান পূর্ব্বক জীবনব্যাপী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া আজি ঋষিধর্ম্মের মহা মহিমাময় আলোক স্তম্ভরূপে দীপ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহার চিরসঞ্চিত অক্ষয়প্রেমসুধাপূর্ণ হৃদয়মন্দির হইতে যখন সমাগতগণের প্রেমামৃতপিপাসু সমাহিত হৃদয়ে উচ্ছ্বসিতবেগে প্রেমপীযূষধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; তখনকার সেই চিরস্মরণীয় মহনীয় ভাবমাধুর্য্যে রসপ্রবাহে হৃদয়কে যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে অভিভূত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল; তাহা কল্পনা করা একান্ত অসম্ভব না হইলেও বর্ণনা করিতে শব্দশক্তি নিতান্তই অসমর্থ!

একজন ইহুদী ব্রাহ্ম মহর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া একটি সুমধুর হিন্দী সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন,

সে সঙ্গীতটি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল।

তৎপরে একে একে সকলে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের চরণধারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের বিনীতপ্রার্থনায় বায়ু চলাচলের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া দ্বিতীয়তলে গেলেন। সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন ছিল।

অন্তঃপুর মহলে মহিলাগণ এবং বহির্দ্দেশে পুরুষগণ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আনন্দোৎসবের পূর্ণতা বিধান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতি।

১৭ই মাঘ, ১৮২১শক। শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

আয়ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৬৭। ৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩৬॥ ৩
সমষ্টি	...	৯০৩৸৶০
ব্যয়	...	৩০২।০
স্থিত	...	৬০১।৶০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১০১॥৶০
	৬০১।৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৯৭৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
এককালীন দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২
	১৯৭৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দলাল দাস, কলিকাতা	৩৲
পুস্তকালয় ...	৩৸/৬
যন্ত্রালয় ...	১৬২ ৴৯
গচ্ছিত ...	।/৬
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৲
সমষ্টি	৩৬৭। ৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	১২২।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৪৵৯
পুস্তকালয় ...	১।৶০
যন্ত্রালয় ...	১১৪ ৶৩
সমষ্টি	৩০২।০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

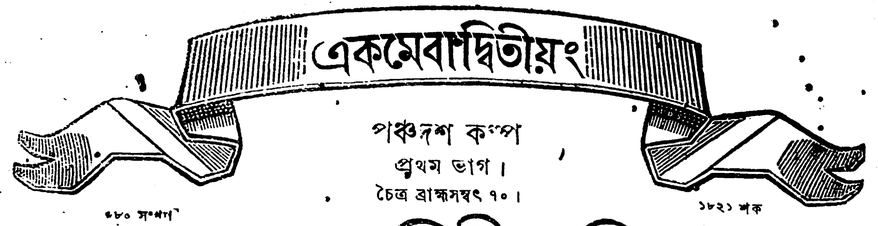

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পারিবারিক উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, এবং যে যে কর্ম্ম করেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। ইহা হইতে দুইটি সার কথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথম কথা এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহা যাহা করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দুইরূপ বিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে—(১) পরা বিদ্যা এবং (২) অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা কি? "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" যদ্দ্বারা নিত্য সত্য পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা কি? না যে বিদ্যা দ্বারা বহির্জগতের মধ্যস্থিত নানা প্রকার দ্রব্য-গুণ, কার্য্য-কারণ এবং কল-কৌশলাদি সম্বন্ধের পরিচয় লাভ করা যায়; যেমন, রসায়নে নানা প্রকার দ্রব্য-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; জ্যোতিষ শাস্ত্রে নানা প্রকার কার্য্য কারণের পরিচয় পাওয়া যায়; শারীর-বিজ্ঞানে নানা প্রকার কল-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা দোঁহার আলোচ্য বিষয়ও দুইরূপ, অধিকার-ক্ষেত্রও দুইরূপ। পরা বিদ্যার আলোচ্য বিষয় তত্ত্বজ্ঞান এবং অধিকার-ক্ষেত্র অন্তর্জগৎ। অপরা বিদ্যার আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান এবং অধিকার-ক্ষেত্র বহির্জগৎ। বিজ্ঞান যদি আপন অধিকারস্থিত দ্রব্যগুণ কার্য্যকারণাদি বিষয়ক সিদ্ধান্ত অন্তর্জগতে প্রয়োগ করিতে যায়—তবে সেরূপ কার্য্য তাহার পক্ষে নিতান্তই অনধিকারচর্চ্চা। বিজ্ঞানের বাহির-মুখা সত্য বহির্জগতেই খাটে। আমরা মনে করি যে, বিজ্ঞানের সত্যই প্রকৃত সত্য; অর্থাৎ জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত-সকলই প্রকৃত সত্য; আর, তত্ত্বজ্ঞানের সত্য একটা আবছায়া-রকমের অনির্দ্দেশ্য ব্যাপার। কিন্তু একটু ভাবিয়া

দেখিলেই আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব যে, ঠিক্ তাহার বিপরীত। বুঝিতে পারিব যে, বিজ্ঞানের যত কিছু সত্য সমস্তই ছায়া-সত্য,—তত্ত্বজ্ঞানের সত্যই জ্যোতির্ম্ময় সত্য। তত্ত্বজ্ঞানের সত্য আপনি জ্যোতির্ম্ময় এবং অন্যকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে; বিজ্ঞানের ছায়া সত্যকেও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। ছায়া-সত্য কাহাকে বলে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান কালের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জানা কথা। সে সিদ্ধান্ত এই যে, বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জড়-পিণ্ড আপন আপন কলেবর-পুষ্টির সমপরিমাণে এবং দূরত্বের বর্গ-ফলের বিপরীত পরিমাণে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞানের একটি মহাসত্য। মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তটি প্রকৃত সত্য যত হো'ক্ বা না হো'ক তাহার সাহায্যে সূর্য্য চন্দ্রগ্রহাদির গতি নিরূপণ করা যায় তো—তাহাই বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট; তা বই, মাধ্যাকর্ষণ যে বস্তুটা কি—সূর্য্য পৃথিবীকে কোনো প্রকার সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করে কিম্বা বিনা রজ্জুতে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করে—সূর্য্যের আকর্ষণ যে বস্তুটা কি—বিজ্ঞান তাহা জানেও না, জানিতে পারেও না, জানিতে চায়ও না; এমন কি, তাহা জানিতে চেষ্টা করাও বিজ্ঞানের পক্ষে এক প্রকার অনধিকারচর্চা। সূর্য্যের আকর্ষণ যে, বস্তুটা কি, তাহা জানিতে হইলে সূর্য্যের ভিতরে ডুব দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করা চাই; কিন্তু সে নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তঃপুরে বিজ্ঞানের প্রবেশের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। সে নিভৃত অন্তঃপুরে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি তো চলেই না, তা ছাড়া, বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণেরও দৃষ্টি চলে না, অণুবীক্ষণেরও দৃষ্টি চলে না। কাজেই, মাধ্যাকর্ষণ যে বস্তুটা কি—বিজ্ঞান তাহার বাষ্পও জানে না এবং কস্মিনকালেও যে জানিতে পারিবে তাহার অণুমাত্রও সম্ভাবনা নাই; কেবল, নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকলের গতিবিধি নিরূপণের পক্ষে ঐ সিদ্ধান্তটি বড্ড কাজে লাগে বলিয়া বিজ্ঞানের নিকটে উহা অতীব মূল্যবান সামগ্রী। তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু ওরূপ কাজ-চালানে রকমে আপাত সুলভ কৃত্রিম সত্য চায় না। তত্ত্বজ্ঞান পার্থিব কার্য্যের সুবিধার জন্য সত্য চায় না; তত্ত্বজ্ঞান সত্যের জন্য সত্য চায়; প্রকৃত তত্ত্ব চায়; আর, প্রকৃত তত্ত্ব চায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞান।

শুষ্ক বৈজ্ঞানিকদিগের অন্তঃকরণের একটি নিগূঢ় কথা এই যে প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া হইবে কি? বিজ্ঞানের ছায়া-সত্যে যখন পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতেছে, তখন প্রকৃত তত্ত্বের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান দুই কারণে মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। প্রথম কারণ এই যে, বিজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তিতায় মনুষ্য বহির্জ্জগৎ হইতে সুখ সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহার দৌলতে যতই আপনার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করুক না কেন—তাহা এক প্রকার ঋণ করিয়া বড়মানুষি করা। পৃথিবীর প্রসাদভোজী ব্যক্তিকে এক না এক সময়ে শুধশুদ্ধ ঋণ পরিশোধ করিতেই হয়—পৃথিবীর বস্তু পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিতেই হয়; তখন সে বুঝিতে পারে যে, ঋণ করিয়া ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ দারিদ্র্য অপেক্ষাও অধম দারিদ্র্য। তত্ত্বজ্ঞান তাই পৃথিবীর নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া পার্থিব সুখ-সম্পদকে অযথা প্রশ্রয় দ্যায় না। তত্ত্বজ্ঞান প্রবৃত্তির পথে অভীষ্ট ফলের প্রত্যাশা রাখে না। তত্ত্বজ্ঞান নিবৃত্তির পথেই নিত্য সুখের অক্ষয় খনি অন্বেষণ করে। নিত্য সুখের সেই যে অক্ষয় খনি, তাহা বিজ্ঞানের ছায়া-সত্য নহে—তাহা প্রকৃত সত্য। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান ছায়া-সত্যের প্রতি বীতরাগ এবং প্রকৃত তত্ত্বের ভিখারী।

প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, "আমরা পরিপূর্ণ সত্য হইতে আসিয়াছি, পরিপূর্ণ সত্যের আশ্রয়ে বাস করিতেছি, এবং পরিপূর্ণ সত্য হইতে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি এবং প্রাপ্ত হইতেছি" এই যে একটি কথা—এ কথাটি আমাদের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে; তাই পরিপূর্ণ সত্য-স্বরূপের প্রতি আত্মার এত টান। পৃথিবী সূর্য্য হইতে আসিয়াছে ও সূর্য্য হইতে জ্যোতি এবং প্রাণ পাইতেছে—এই কথাটি পৃথিবীর বক্ষে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া পৃথিবী যেমন সূর্য্যের আকর্ষণে বাঁধা; তেমনি পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপের আকর্ষণে আমাদের আত্মা নিরন্তর বাঁধা রহিয়াছে। কাজেই, মনুষ্যের প্রজ্ঞা উদ্দীপিত হইলেই মনুষ্য পরিপূর্ণ সত্যের আকর্ষণ অন্তরে অনুভব না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেনা। এই জন্য, তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত তত্ত্ব চায়—পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ চায়; তা বই, বিজ্ঞানের ছায়াসত্যে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞান দেখে যে, বিজ্ঞান যে পথ অবলম্বন করিয়া কাজ-চালানে রকমের ছায়া-সত্য উপার্জ্জন করে—সে পথে মাধ্যাকর্ষণই সর্ব্বোচ্চ মহাসত্য; তা বই, সে পথে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও প্রকৃত সত্যের—পরিপূর্ণ সত্য-স্বরূপের—দর্শন পাওয়া যাইতে পারে না! তত্ত্বজ্ঞান দেখে যে, সমস্ত জগতের ভিতরের সত্যে—প্রকৃত সত্যে—পরিপূর্ণ সত্যে—প্রবেশ করিতে হইলে তাহার কেবল একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার; কি? না সাধকের আত্মা।

বাহিরের কোনো বস্তুরই অভ্যন্তর-প্রদেশে আমাদের সাক্ষাৎ অনুভব চলে না; সে সকল প্রদেশে আমরা অনুভবের অভাব অনুমান দ্বারা পূরণ করিয়া লই। আমার, আপনার আত্মা আমি যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করি, তোমার আত্মা আমি সেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করি না—তোমার আত্মা আমি অনুমান করি! আরেকটি বিষয়ও আমি আমার অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করি; সেটি হ'চ্চে আমার আত্মপ্রভাবের বাধা-বিঘ্ন—যেমন শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ, এক কথায়—জড়তা; এবং ভ্রমপ্রমাদ মোহ, এক কথায়—মূঢ়তা। আর সেই আত্মপ্রভাবের বাধা বিঘ্ন—জড়তা এবং মূঢ়তা—যাহা আমি আপনার অন্তঃকরণে অনুভব করি, তাহা বহির্জ্জগতে যথোপযুক্ত পাত্রের অভ্যন্তরে যথোপযুক্ত পরিমাণে অনুমান করি। জড়-পদার্থ সকলের অভ্যন্তরে জড়তার ভাব অনুমান করি—মূঢ় জন্তুদিগের অভ্যন্তরে মূঢ়তার ভাব অনুমান করি! তবেই হইতেছে যে, একদিকে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার আত্মাকে অনুভব করি এবং সেই অনুভবের উপরে ভর করিয়া অন্যের আত্মাকে অনুমান করি; আর এক দিকে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার অন্তঃকরণে আত্মপ্রভাবের বাধা-বিঘ্ন অনুভব করি, আর, সেই অনু-

ভবের উপরে ভর করিয়া মূঢ় জন্তুদিগের অভ্যন্তরে মূঢ়তা "এবং জড়বস্তু-সকলের অভ্যন্তরে জড়তা অনুমান করি। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, আলোকের সঙ্গে যেমন ছায়া লাগিয়া থাকে, তেমনি অনুভবের সঙ্গে অনুমান লাগিয়া থাকে। সাক্ষাৎ অনুভবই জ্ঞানের আলোক—অনুমান সেই আলোকের ছায়া। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় কি কেবল ঐ দুইটি যাহা উপরে বলিলাম—(১) আপনার আত্মা এবং (২) আপনার আত্মপ্রভাবের বাধা বিঘ্ন, এই দুইটি, না আরো কিছু আছে? সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় আরেকটি আছে—তাহাতে আর ভুল নাই। দুইটি বিষয় নহে কিন্তু তিনটি বিষয় আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার আপনার অন্তরে এক সঙ্গে অনুভব করি; (১) আপনার আত্মা, (২) আপনার আত্মপ্রভাবের বাধাবিঘ্ন—জড়তা এবং মূঢ়তা; (৩) সেই সকল বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত অপূর্ণ আত্মার অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপের অধিষ্ঠান।

আমাদের মনে সহসা এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আমরা প্রথমতঃ আপনার আত্মা এবং দ্বিতীয়তঃ আপনার আত্মপ্রভাবের বাধাবিঘ্নরূপী জড়তা ও মূঢ়তা এই দুইটি বিষয় অন্তঃকরণে এক সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি—এটা নিঃসংশয়। অধিকন্তু আমরা পরিপূর্ণ সত্য স্বরূপের অধিষ্ঠান আপন আপন অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ অনুভব করি এই যাহা তুমি বলিতেছ তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ যে কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমরা আপনার আপনার বাধাক্রান্ত অপূর্ণ আত্মাকে কি স্বপ্নের ন্যায় একটা কৃত্রিম অনুভবের বিষয় মনে করি, অথবা বাস্তবিক সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি? অবশ্য বাস্তবিক সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। তাহা যে করি তাহার কারণ কি? কোথা হইতে আমাদের এই অনুভবগম্য অপূর্ণ আত্মাতে বাস্তবিক সত্তার ভাব আসিতেছে? কোথা হইতেই বা আমাদের অনুমানগম্য বহির্জগতের মূল প্রদেশে বাস্তবিক সত্তার সম্ভাবনা আসিতেছে? ইহার উত্তর এই যে, সৎস্বরূপ হইতেই সত্তা আসিতেছে। সৎস্বরূপ কি? না নিত্য সত্য নির্বিকার পরিপূর্ণ সত্য স্বরূপ।

"সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্"

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ অধ তির্য্যক্ (কিনা ত্যাড়চা দিক্) সর্ব্বত্রই আলোক প্রদান করিতেছে—গগন-মণ্ডলেও আলোক প্রদান তেছে, পৃথিবী-মণ্ডলেও আলোক প্রদান করিতেছে—এবং সেই সঙ্গে আপনি প্রকাশ পাইতেছে; পরিপূর্ণ সত্য স্বরূপ তেমনি আমাদের আত্মাতেও সত্তা প্রদান করিতেছেন, বহির্জগতেও সত্তা প্রদান করিতেছেন, সর্ব্বত্রই সত্তা প্রদান করিতেছেন, আর, সেই সঙ্গে আমাদের অনুভবগম্য আপনার আপনার আত্মার বাস্তবিক সত্তার মধ্য দিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে বাস্তবিক সত্তা সত্তাই হয় না—কেবল একটা কথার কথা হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। ইংলণ্ড তোমার বা আমার জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ না পাইলেও, তাহা ইংলণ্ড-বাসীদিগের জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছে, তাই আমরা বলি যে, ইংলণ্ডের বাস্তবিক সত্তা আছে।" পৃথিবীর উত্তর মেরু কোনো মনুষ্যের জ্ঞানে

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ না পাইলেও তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছে, তাই আমরা বলি যে, উত্তর মেরুর বাস্তবিক সত্তা আছে। অতএব এটা স্থির যে, পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপের জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পাওয়াই বাস্তবিক সত্তার সর্ব্বস্ব ধন। যেখানে যত বাস্তবিক সত্তা আছে সমস্তই পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশিত রহিয়াছে সুতরাং সমস্ত বাস্তবিক সত্তাই পরমাত্মার জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত। আমাদের নিজের নিজের বাস্তবিক সত্তা পরমাত্মার জ্ঞান-জ্যোতিতে তো আলোকিত রহিয়াইছে, তা ছাড়া, তাহা আমাদের নিজের নিজের অনুভবের খদ্যোত-জ্যোতিতে নিজের নিজের নিকটে আলোকিত রহিয়াছে। আমাদের আত্মার এবং সর্ব্বজগতের পৃথক্ পৃথক্ বাস্তবিক সত্তা যাহা পরমাত্মার জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত তাহা আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রে সত্তাগুণ বা সত্ত্বগুণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই বলে যে, পরমাত্মার জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত বাস্তবিক সত্তা বা সত্ত্বগুণ সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে আছে; প্রভেদ কেবল এই যে, জড় বস্তুর অভ্যন্তরে তাহা তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি দ্বারা অর্থাৎ জড়তা দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে কি না চাপা পড়িয়া রহিয়াছে; পশু পক্ষীর অভ্যন্তরে তাহা রজোগুণ-প্রধান প্রকৃতি দ্বারা অর্থাৎ প্রবৃত্তিপ্রধান মূঢ়তা-দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে। কেবল, মনুষ্য-মণ্ডলীর অন্তঃকরণে তাহা এক দিকে তমোগুণ-প্রধান জড়তা এবং আর এক দিকে রজোগুণ-প্রধান মূঢ় প্রবৃত্তি—দুই দিকের দুই বাধা যথাপরিমাণে অপসারিত করিয়া স্ব স্ব অনুভবের আলোকে সমুত্থান করিয়াছে। আমাদের আপনার আপনার অপূর্ণ আত্মার সেই যে বাস্তবিক সত্তা বা সত্ত্বগুণ যাহা রজস্তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যাহা মূঢ়তা এবং জড়তা দ্বারা ঘেরা-ঘোরা, তাহা একদিকে যেমন পরমাত্মার মহাজ্ঞানে সর্ব্বজগতের সমষ্টি-সত্তার সহিত একযোগে প্রকাশিত, আর এক দিকে তেমনি আমাদের আপনার আপনার সাক্ষাৎ অনুভবে আপনার আপনার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাসিত। এই জন্য আপনার আপনার বাস্তবিক সত্তা অনুভব করিবার সময় আমরা দুইটি বিষয় এক সঙ্গে অনুভব করি;—

প্রথম, আমাদের আপনার আপনার আত্মার বাস্তবিক সত্তা যে অংশে আমাদের আপনার আপনার অনুভবের জ্যোতিতে প্রতিভাসিত।

দ্বিতীয়, সেই একই বাস্তবিক সত্তা যে অংশে সর্ব্বজগতের সমষ্টি-সত্তার সহিত যোগযুক্ত এবং পরিপূর্ণ সত্য স্বরূপের জ্ঞানালোকে প্রকাশিত।

এই দুইটি বিষয় আমরা ছায়াতপের ন্যায় এপিট ওপিট ভাবে এক সঙ্গে আত্মাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করি। তবেই হইতেছে যে, এক দিকে আমাদের আপনার আপনার আত্মার বাস্তবিক সত্তা এবং আরেক দিকে সেই বাস্তবিক সত্তার মূলাধার পরিপূর্ণ সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানের প্রভাব, দুইই আমরা আপন আপন আত্মাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এক সঙ্গে অনুভব করি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মার জ্ঞানজ্যোতির কিরণ-স্বরূপ জীবাত্মার বাস্তবিক সত্তা বা সত্ত্বগুণ—জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী সেতুস্বরূপ। কেন না, সেই যে বাস্তবিক সত্তা বা সত্ত্বগুণ যাহা পশুপক্ষীর অভ্যন্তরে

মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, জড় বস্তুর অভ্যন্তরে জড়তায় আচ্ছন্ন এবং মনুষ্যের অভ্যন্তরে সদ্‌ভাবের আলোকে সুপরিস্ফুট, তাহার অবশ্য একটা গোড়া আছে—প্রবর্ত্তক আছে; তাহার প্রবর্ত্তক কে? বেদে বলে—মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ" পরমাত্মা মহান্ প্রভু এবং মহান্ পুরুষ—তিনিই সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তার প্রবর্ত্তক। অতএব এটা স্থির যে, কি তোমার, কি আমার, কি মূঢ় জন্তুর, কি জড় পদার্থের—সকল বস্তুরই বাস্তবিক সত্তা পরিপূর্ণ সত্য-স্বরূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরস্থিত হিরণ্ময় কোষে অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় বাস্তবিক সত্তাতে বা নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপের প্রভাবান্বিত অধিষ্ঠান সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করি; আর সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানের পত্তন-ভূমির উপরেই আমি আমার আপনার আত্মার ন্যায় তোমারও আত্মাকে এবং প্রত্যেক বস্তুকে পরিপূর্ণ সত্যের প্রভাবে সত্তাবান্ মনে করি। তাই বলিতেছি যে, তিনটি বিষয় আমরা সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করি—

প্রথম, আপনার অপূর্ণ আত্মা।

দ্বিতীয়, আপনার আত্মপ্রভাবের বাধা-বিঘ্ন—জড়তা এবং মূঢ়তা।

তৃতীয়, আপনার অপূর্ণ আত্মার অভ্যন্তরস্থিত সর্ব্বজগতের অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ, পরমাত্মা, যিনি আপনার হইতেও আপনার। এ তো সোজা কথা পড়িয়া আছে যে পরিপূর্ণ সত্য স্বরূপই তোমাতে, আমাতে এবং আর আর সকল বস্তুতে বাস্তবিক সত্তা প্রদান করিবার কর্ত্তা; তা বই, তাহার কর্ত্তা তুমিও নহ, আমিও নহি, এবং আর কোনো বস্তুও নহে।

এই তিনটি বিষয় যাহা পরে পরে বলিলাম, তাহা ছাড়া আর সমস্ত বিষয়ই আমরা অনুমান দ্বারা জানিতেছি;—আপনা ভিন্ন আর আর মনুষ্যের অভ্যন্তরে দীপ্যমান আত্মা জাগিতেছে তাহাও আমরা অনুমান দ্বারা জানিতেছি; আর, পশুপক্ষীর অভ্যন্তরে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব বা মূঢ়তা, এবং জড়বস্তুর অভ্যন্তরে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বা জড়তা, যাহা মনুষ্যেতর সৃষ্টিরাজ্যে সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তি দাবিয়া রাখিয়া তাহাকে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে দিতেছে না, তাহাও আমরা অনুমান দ্বারা জানিতেছি। এটা কিন্তু যেন মনে থাকে যে, সেরূপ অনুমান অমূলক অনুমান নহে; যেহেতু, আপনার অপূর্ণ আত্মার অভ্যন্তরে বাস্তবিক সত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞান যাহা আমরা পাইতেছি—সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানই ঐ সমস্ত অনুমানের মূলে নিয়ত বল যোগাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ" "আত্মরূপ হিরণ্ময় কোষে জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র নির্ম্মল অখণ্ড ব্রহ্ম রহিয়াছেন; যাঁহারা আত্মাকে জানেন তাঁহারা তাঁহাকে জানেন।" এ কথা খুব সত্য; কেন? না যেহেতু পরিপূর্ণ সত্য-স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভের একমাত্র দ্বার আমাদের আপনার আপনার আত্মা। আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার দর্শন পাইলে সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়! শরীরের হিরণ্ময় কোষ যেমন আত্মা—সৌরজগতের হিরণ্ময় কোষ তেমনি সূর্য্য; আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার দর্শন পাইলে সূর্য্যের অভ্যন্তরেও পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়; কেননা

পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ পরমাত্মা অনাদ্যন্ত কাল এবং অসীম আকাশ ভরিয়া পরিপূর্ণ। তিনি আমাদের শরীরের মধ্যস্থিত আত্মারও অভ্যন্তরে রহিয়াছেন এবং সৌর জগতের মধ্যস্থিত সূর্য্যেরও অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। এইরূপ, আত্মার অভ্যন্তরে এবং সেই সঙ্গে সর্ব্ব জগতের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ সত্য স্বরূপ পরমাত্মার দর্শনলাভই তত্ত্বজ্ঞানের চরম ফল।

তত্ত্বজ্ঞানের সাধনের উপায়ও ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত হইয়াছে। তাহার সারমর্ম্ম হ'চ্চে—মনকে কোনো দিকে হেলিতে না দিয়া, নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় পরমাত্মাতে সন্নিবিষ্ট করা; তাহা হইলেই পরমাত্মাতে আত্মা তন্ময়ীভূত হইয়া তাঁহাতে নিঃসংশয়ে স্থিতি করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের শরীর চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত জগতের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছে; সেই শরীরের অভ্যন্তরে আত্মা অবস্থিতি করিতেছে; কাজেই আপনার আত্মা সাধকের নিকটে সমস্ত জগতের মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রস্থান। এই জন্য সাধকের আত্মা সর্ব্বজগতের অভ্যন্তরস্থিত পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভের ঠিক্ উপযুক্ত দ্বার। সাধন কি? না পুনঃ পুন ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণে প্রদীপ্ত সেই হিরণ্ময় দ্বারে মনোনিবেশ করিয়া পরমাত্মার ভর্গঃ কিনা জ্ঞানময় শক্তি ধ্যান করা। জ্ঞানবান্ মনুষ্যমাত্রই পরিপূর্ণ সত্য-স্বরূপের অস্তিত্ব জ্ঞানে উপলব্ধি করে—সাধক কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তাঁহার জাজ্বল্যমান প্রকাশ ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষবৎ হৃদয়ঙ্গম করেন। অন্য-মনস্ক ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া একটা হস্তী চলিয়া গেলেও সে যেমন তাহা দেখিতে পায় না, শুষ্ক বৈজ্ঞানিকেরা তেমনি পরিপূর্ণ সত্যের দ্বারে মনোনিবেশ করে না বলিয়া পরিপূর্ণ সত্যকে একটা আবছায়া রকমের কৃত্রিম ব্যাপার মনে করে, এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি ছায়া-সত্য সকলকে সত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করে। বিশিষ্টরূপ প্রীতিভক্তি এবং মনোযোগের গুণেই সাধকের ধ্যানে পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ আপন মহিমায় বিরাজমান হ'ন।

মনোযোগের চরম পরিপক্কতা হইয়াছে কিসে জানিব? না যখন দেখিব যে, পদ্মপুষ্প দেখিবা মাত্র যেমন তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মন আপনা আপনি তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আত্মাতে মনশ্চক্ষু প্রেরণ করিবা-মাত্র মন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপে তন্ময়ীভূত না হইয়া থাকিতে পারিতেছে না।

পরমাত্মাতে মনঃসমর্পণ করিয়া গায়ত্রী ধ্যান করিবার সময় আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা তাঁহার ভর্গঃ কিনা জ্ঞানময় মঙ্গল ইচ্ছার প্রভাব আত্মাতে অনুভব করি; এবং এটা সর্ব্বদা মনে রাখি যে, তাঁহারই ইচ্ছার প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তাহার পরে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে কোনো কার্য্য করি, তাহাতে যেন তাঁহারই সেই মঙ্গল ইচ্ছার প্রভাব অনুভব এবং সমর্থন করি। কার্য্য করিতেছি আমি—এটা ঠিক্, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটি অন্তরে অনুভব করা এবং বাহিরে সমর্থন করা কর্ত্তব্য যে, আমি তাঁহার প্রেরিত শুভ বুদ্ধির আলোকে মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিতেছি—তিনিই তাহার মূল প্রবর্ত্তক। ইহারই নাম পরব্রহ্মে কর্ম্ম-সমর্পণ। আমি শুদ্ধ কেবল আপনার বুদ্ধিতে এবং আপনার শক্তিতে কার্য্য করিতেছি র্য

এরূপ সংস্কার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইলে কর্ম্মকর্ত্তার শুভ সংকল্পের মধ্যে অলক্ষিত ভাবে স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পথ পায়; তাহার পরিবর্ত্তে—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া তাঁহারই কার্য্য করিতেছি, সুতরাং তাহার ফল ভাল ছাড়া মন্দ হইতে পারে না, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্ত্তব্য-সাধনের পথ হইতে স্বার্থপরতার জঞ্জাল অপসারিত হইয়া যায়; তাহা যখন হয়, তখন সাধক নিরুদ্বিগ্ন, সরল এবং সুখে দুঃখে অটল হইয়া যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে পরমাত্মার অজেয় মঙ্গল-প্রভাব উপলব্ধি করেন, এবং যখন দৈনিক কর্ত্তব্য-কার্য্যের সমাপনান্তে বিশ্রাম করেন, তখন আত্মপ্রসাদের বিমল সলিলে স্নান করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-যোগের গভীর আনন্দ-উপভোগ করেন, এবং তাহার গুণে নূতন বল উপার্জ্জন করেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কৃষ্ণাবতার।

১৪ শ প্রস্তাব।

সত্যভামার প্ররোচনায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পারিজাত বৃক্ষ নন্দনকানন হইতে অপহৃত হইলে শচী নিরতিশয় কুপিতা হইলেন এবং পারিজাত প্রত্যাহরণের জন্য ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দেবরাজ দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অগত্যা রণে প্রবৃত্ত হইলেন। গরুড় ও ঐরাবতে, কৃষ্ণ ও ইন্দ্রে তুমুল সমর আরম্ভ হইল। দেবরাজ ও জনার্দ্দনকে, বজ্র ও চক্রধারী দেখিয়া ত্রিলোক মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। বজ্র বিনষ্ট এবং ঐরাবতকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ইন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পলায়ন পরায়ণ হইলেন। তদ্দর্শনে সত্যভামা ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে আবশ্যক নাই; পারিজাত বৃক্ষ গ্রহণ কর, যে দেবতাগণের মনোব্যথা বিদূরিত হউক! আমি যখন তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, শচী তোমার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আমাকে বহুমান পূর্ব্বক দেখেন নাই, তাই তোমাকে অপদস্থ করিবার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। পারিজাত বৃক্ষে আমার অভিলাষ নাই, তুমি তাহা লইয়া যাও। ইন্দ্র উত্তরে কহিলেন—

যস্মিন্ জগৎ সকলমেতদনাদিমধ্যে
যস্মাৎ যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাৎ
তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ক্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্য।
সকলভুবনসূতে মূর্ত্তিরস্যানুসূক্ষ্মা
বিদিতসকলবেদৈ র্জ্ঞায়তে যস্য নান্যৈঃ
তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং স্বেচ্ছয়ৈনং
জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ।
৫ম অংশ। ৩০ অ, ৭৮ শ্লোক।

যাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার আদিও নাই মধ্যও নাই, যিনি সর্ব্বভূতময়, যিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা আমাকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহাতে আমার লজ্জা কি। যিনি সকল ভুবনের প্রসবিতা, যাঁহার অতি সূক্ষ্ম মূর্ত্তি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানিতে পারেন (অপর কেহ পারে না) সেই জন্মরহিত, অকৃত (স্বয়ম্ভু) শাশ্বত (সনাতন) ঈশ্বর, যিনি জগতের উপকারের জন্য আবির্ভূত, তাঁহাকে পরাজয় করিতে কে সমর্থ হয়।

কৃষ্ণ দেবরাজ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমি মনুষ্য হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করুন। আপনি পারিজাত গ্রহণ করুন এবং আমার প্রতি যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাও লউন, ইহা আপনারই অস্ত্র। ইন্দ্র কহিলেন তুমি মনুষ্য, এ কথা বলিয়া কেন আর আমাকে বিমোহিত কর।

যোহসি সোহসি জগত্রাণপ্রবৃত্তৌ নাথ সংস্থিতঃ।
জগতঃ শল্যনিষ্কর্ষং করোষ্যসুরসূদন।
৩১ অধ্যায়। ৬ শ্লোক।

তুমি যাহা আছ তাহাই থাক (বিচারে আবশ্যক নাই, আমি সমস্তই জানি), হে শত্রু-সূদন, তুমি জগতের শল্য উদ্ধারে এবং জগৎ পালনেই নিযুক্ত আছ; পারিজাত আমার আবশ্যক নাই, দ্বারকায় লইয়া যাও। তুমি যখন ভূলোক পরিত্যাগ করিবে, তখন উহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পারিজাত বৃক্ষ লইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে দ্বারকায় পৌঁছিয়া বৃক্ষটি গৃহোদ্যানে রোপণ করিলেন। বৃক্ষদর্শনে দ্বারকাবাসী জনগণের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত (অর্থাৎ তাঁহারা যে দেবতা) স্মৃতিপথে উদিত হইল। বৃক্ষের সৌরভে দ্বাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছিল। নরক-গৃহ হইতে যে ষোড়শ সহস্র কন্যা আনিয়াছিলেন মধুসূদন কৃষ্ণ বহুসংখ্যক শরীর ধারণ করিয়া পৃথক পৃথক গৃহে অবস্থান করত ধর্ম্মানুসারে ও যথাবিধানে তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। ফলতঃ প্রত্যেক কন্যা বুঝিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন। এইখানে বিষ্ণুপুরাণের ৩১ অধ্যায় শেষ হইয়া গেল।

বাহুল্যের মধ্যে ভাগবতে প্রদ্যুম্ন-উপাখ্যানের পরেই স্যমন্তক-হরণ আছে। দশম স্কন্ধের ৫৬।৫৭ অধ্যায় উহার বিস্তারিত বর্ণনায় পর্য্যবসিত। ভাগবৎকার বলিতে চাহেন শ্রীকৃষ্ণ ৫৮ অধ্যায়ে আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া সেখানে নবপরিণীতা কৃষ্ণাকে সন্দর্শন করেন। তদীয় পিতৃস্বসা কুন্তি কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রেমবিক্লবতায় রুদ্ধকণ্ঠ ও সজলনেত্র হয়েন। তথায় থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ এক দিন অর্জ্জুনের সহিত রথে আরোহণ করিয়া বিপদসঙ্কুল বিপিনে প্রবেশ করেন এবং মৃগয়াক্লেশে পিপাসার্ত্ত হইয়া যমুনাকূলে পৌঁছিয়া এক সুন্দরী কামিনীকে অদূরে দেখিতে পান। পুরিচয়ে বুঝিলেন ললনা-ললামভূতা অবিবাহিতা সেই কামিনী সূর্য্যের কন্যা, নাম কালিন্দী; বরেণ্য বরদ কৃষ্ণকে পতিলাভ করিবার জন্য দৃঢ়ব্রতা ও নদীতটবাসিনী। কৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে এই কামিনীর বিষয় অবগত ছিলেন, এক্ষণে অর্জ্জুন প্রমুখাৎ ঐ কন্যার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে নিজ রথে তুলিয়া লন এবং বর্ষান্তে দ্বারকায় পৌঁছিয়া পুণ্যনক্ষত্রযুক্ত লগ্নে কালিন্দীকে বিবাহ করেন। এতদ্ভিন্ন এই সর্গে সত্যা ও মিত্রবিন্দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য এ সকল সুদীর্ঘ কাহিনীর উল্লেখ অন্যত্র নাই। তবে পারিজাত হরণ বর্ণনা ভাগবতে বড় সংযত।

বিষ্ণুপুরাণকার শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার বলিয়া বারবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ বাস্তবিকই যে ইন্দ্রাদি অপেক্ষা বীর্য্যবান তাহাই দেখাইবার জন্য যেন পুরাণকার বলিতে চাহেন যে ইন্দ্র দৈত্য-নরক-

ভয়ে বিপন্ন হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ নরকের বিনাশ সাধন করিয়া ইন্দ্রমাতা দিতির কুণ্ডল উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন এবং পর অধ্যায়ে কৃষ্ণের হস্তে ইন্দ্রের পরাজয় বিঘোষিত করিয়া পারিজাতের স্বামিত্ব কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছে।

এখানে অনেকে বলিতে পারেন, পুরাণকার ত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর; উপনিষদোক্ত স্বরূপ লক্ষণেত শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডিত করিতেছেন, অথচ অগণ্য কামিনীর সহিত কেন তাঁহায় পরিণয় ঘটাইলেন, কেন বা কিঞ্চিদধিক আট কোটি বীর্য্যবান পুত্র পৌত্রে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিলেন কেনই বা যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইলেন, কেনই বা কৌশল কূটবুদ্ধি, শারীরিক বীর্য্য এবং অভিমান তাঁহার অঙ্গের ভূষণ করিয়া দিলেন, কেনই বা চেষ্টা আয়াসসাধ্য কার্য্যে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইলেন? এসমস্ত কি সত্যসত্যই ঈশ্বরত্বের পরিচায়ক, না ইহার অন্য কিছু তাৎপর্য্য আছে? অবশ্য এ সমস্ত তর্কের প্রকৃত উত্তর আছে বলিয়াও আমরা বিশ্বাস করি না। তবে স্থূলবুদ্ধি সাধারণ লোকের জন্য যে ভাবেই হউক ভগবৎপ্রসঙ্গের কতকটা উপযোগিতা আছে ইহা তর্কছলে স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করিবার পক্ষে মনুষ্যের আত্মার যে স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে, তাহার বৈক্লব্য যে উহার অবশ্যম্ভাবী ফল, তৎবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং এদেশে প্রকৃত পক্ষে যে তাহাই ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে বাণরাজা ত্রিলোচন মহাদেবের নিকটে আসিয়া কহিলেন আমার সহস্র বাহু আছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটি মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল না, এজন্য আমি সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতেছি, যাহাতে আমার এই বাহু সমূহের সার্থকতা হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহাদেব তাঁহাকে যুদ্ধের আশ্বাস দিয়া বিদায় দিলেন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ গোপনে বাণকন্যা উষার সহিত বিহার করিতেছে একথা রাজার শ্রুতিগোচর হইল। বাণ অনিরুদ্ধের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্তি দিবার মানসে তাঁহার অপরিমিত বীর্য্যে প্রথমে পরাজিত হইলেও নাগপাশ দ্বারা সেই যদুনন্দনকে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। নারদমুখে পৌত্রের বিপদের সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ গরুড়ারোহণে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাণরাজার রক্ষাজন্য মাহেশ্বর মহাজ্বর আসিয়া কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ জ্বরের তিনখানি পা ও তিনটি মস্তক। ঐ শৈবজ্বরস্পর্শে বলদেবের শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। ঐজ্বর যখন নিজ্জ্বর কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল তখন বৈষ্ণব জ্বর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণশরীর হইতে নিরাকৃত করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া শঙ্কর ও কার্ত্তিক আসিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ সেই মহাসমর দেখিয়া জগতের প্রলয়দশা অনুমান করিলেন। কৃষ্ণ জৃম্ভাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে শঙ্কর জৃম্ভার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তর্দ্দশনে কার্ত্তিকেয় পলায়নপরায়ণ হইলেন। এই সময়ে বলদেব লাঙ্গল প্রহারে দৈত্যসৈন্যকে বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ সুদর্শনপ্রভাবে বাণের মস্তকচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলে রুদ্র

কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি জগতের নাথ পুরুষোত্তম, অনাদি অনন্ত পরমানন্দময় পরমেশ্বর; এক্ষণে প্রসন্ন হও, আমি এই বাণকে অভয় প্রদান করিয়াছি; তুমি তাহার অন্যথা করিও না। কৃষ্ণ কহিলেন তুমি যখন এই অসুররাজকে বরদান করিয়াছ তখন সে জীবত থাকুক। আমি এই চক্র বিনিবর্ত্তিত করিলাম। এই বলিয়া কৃষ্ণ নাগপাশাবদ্ধ অনিরুদ্ধের নিকট গমন করিলেন, নাগগণ গরুড়ের নিশ্বাস-ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কৃষ্ণ নববধূ বাণকন্যা উষাকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক একে একে ইন্দ্র ও রুদ্র মথিত হইলেন। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ইন্দ্র ও রুদ্র দুষ্কৃতিগণের মধ্যে কি না জানি না, সে মীমাংসার ভার পাঠকবর্গের উপরে। তবে মোটামোটি বুঝাযায় কৃষ্ণ সামর্থ্যে রুদ্র অপেক্ষাও গরীয়ান্।

বিষ্ণুপুরাণের ৩৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বারাণসী দাহন। পৌণ্ড্রদেশস্থ বাসুদেব নামক জনৈক রাজা এই সময়ে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জনগণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিত। এই ব্যক্তি ভ্রান্তচিত্ত হইয়া সমুদয় বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। এই কাল্পনিক বাসুদেব কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইল তুমি মদীয় বাসুদেব-নাম শঙ্খ চক্রাদি দেবচিহ্ন ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রণাম কর; এরূপ করিলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে। জনার্দ্দন এতচ্ছ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন আমি অচিরে তাঁহার নিকট যাইয়া এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিব। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া পৌণ্ড্রদেশে গমন করিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া নিজ সৈন্য ও কাশিরাজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ দূর হইতে দেখিলেন তাহার হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, গলায় অপূর্ব্ব মালা, ধ্বজে গরুড়, বক্ষে কৃত্রিম শ্রীবৎস চিহ্ন পরিধানে পীত বসন শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ চক্র ত্যাগ করিয়া পৌণ্ড্রককে দ্বিধাকৃত করিয়া ফেলিলেন। কাশিরাজ বন্ধুবিনাশের প্রতিবিধানে কৃতসংকল্প হইয়া বাসুদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে তিনিও নিহত হইলেন। কাশিরাজতনয় শঙ্করের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। শঙ্কর কহিলেন বর প্রার্থনা কর, রাজকুমার বলিলেন মদীয় পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত কৃত্যা উৎপন্ন হউক। শঙ্কর তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন। এই মহাকৃত্যা পিঙ্গলবর্ণ, ইহার কেশকলাপ চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত শিখা দ্বারা অতিভীষণ। কৃত্যা উৎপন্ন হইবামাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিল। কৃষ্ণ অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি কৃত্যাকে সংহার করিবার জন্য চক্র ত্যাগ করিলেন। সেই চক্রপ্রভাবে কৃত্যা হতপ্রভাব হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চক্রও তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। কৃত্যা বারাণসী পুরী প্রবেশ করিল। বিষ্ণুচক্রও কাশিরাজসৈন্য ও কৃত্যার সহিত বারাণসীপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দ্বারকায় বিষ্ণুহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

—

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৬৩।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬০১॥৶০
সমষ্টি	...	১১৬৪৸৶৬
ব্যয়	..	৪০৫।৶৩
স্থিত	...	৭৫৯॥৶৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	২৫৯॥৶৩
	৭৫৯॥৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	৩৯৫।৶০
সাম্বৎসরিক দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০৸৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভবদেব নাথ		১৲
		১০১৲
মাসিক দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৯০৲
এককালীন দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
দঃ শ্রীমতী গিরিবালা দেবী প্রদত্ত প্রণামী		২৲
দঃ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার প্রদত্ত প্রণামী (এক মোহরের মূল্য)		২৫॥০
		২৭॥০
আনুষ্ঠানিক দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (এক মোহরের মূল্য)		২৫৸৶০
" " ভবদেব নাথ		১৲
		২৬৸৶০
শুভকর্ম্মের দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়		৫০৲
		৩৯৫।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		১১।৶৩
শ্রীযুক্ত বাবু গণেশপ্রসাদ লালা, রাজদ্বারভাঙ্গা		৩।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়ের মূল্য		৮৲
		১১।৶০
পুস্তকালয় ...		৫০৸৶৬
যন্ত্রালয় ...		১০১।০
গচ্ছিত ...		২।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৶০
সমষ্টি		৫৬৩।৶৬
ব্যয়।		
ব্রাহ্মসমাজ ...		২৬৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...		৬৫॥৶৬
পুস্তকালয় ...		১॥৶৯
যন্ত্রালয় ...		৭৩৶৯
গচ্ছিত ...		১৲
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ...		২৫৲
সমষ্টি		৪০৫।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।